শ্রীদেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে

যমুনোত্রী — গঙ্গোত্রী — গোমুখী — ভ্রমণালেখ্য

প্রথম পর্ব

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা ১২

AKI GANGAR GHATE GHATE, Part One
(From Bank to Bank of the same Ganga)
A Travelogue in Bengali

By Deba Prasad Das Gupta
Price : Rs. 8·00 (Rupees Eight)

Published by N. Mukherjee
Managing Director, A. Mukherjee & Co. (P.) Ltd.
2 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12
Third Edition : January,

প্রকাশক
এন. মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেকটার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

তৃতীয় সংস্করণ : মাঘ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট
শ্রীসুধীরকুমার মৈত্র

মুদ্রাকর
শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি
পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ (মুদ্রণ বিভাগ)
১৯, গুলু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা—৬

যাঁর কাছ থেকে শুধুই
পেয়েছি, দিইনি কিছুই—
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ
আইনজীবী আমার মামা
পরমজ্ঞানী ও মনীষী
শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত
প্রফুল্লরঞ্জন দাস (মিঃ
পি. আর. দাস)-কে, আমার
'একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে'
উৎসর্গ করে ধন্য হলাম।

ONE WORD MORE

What of Rafael's sonnets, Dante's picture?
This: no artist lives and loves, that longs not
Once, and only once, and for One only,
(Ah, the prize!) to find his love a language
Fit and fair and simple and sufficient—
Using nature that's an art, to others,
Not, this one time, art that's turned his nature.
Ay, of all the artists living, loving
None but would forego his proper dowry,—
Does he paint? he fain would write a poem—
Does he write? he fain would paint a picture,
Put to proof art alien to the artist's,
Once, and only once, and for One only,
So to be the man and leave the artist,
Gain the man's joy, miss the artist's sorrow.

ROBERT BROWNING

Phone : 56-3076
TALA PARK
CALCUTTA-2

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ দাশগুপ্তের 'একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে' পড়ে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করেই তাঁর রচনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে বসেছি।

বহু বৈচিত্র্যে বিচিত্র, বহু বিভিন্নতায় বিভিন্ন হয়েও ভারতবর্ষ এক ভারত-সংস্কৃতির মালায় গাঁথা। অধ্যাত্ম-স্বরূপে খুঁজলে তার সন্ধান মেলে, সন্ধানী জনেরা তা জানেন। কিন্তু বহির্লোকে যদি তার স্বরূপটি খুঁজি তা হলে দেখতে পাব মূলতঃ গঙ্গার ধারা যেন সেই আশ্চর্য স্বর্ণসূত্রটির কাজ করেছে। আর তার পিছনেই সেই গলিত স্বর্ণের আকর, ভারতের পিতৃরূপী হিমালয়। হিমালয় আর গঙ্গা এই দুইয়ে মিলে যেন ভারত-সংস্কৃতির মণিবেদী রচনা করেছে। এই দুইয়ের ঘাটে ঘাটে আর বাঁকে বাঁকে ভারতের চিরকালের আত্মা আসন পেতে বসে আছে ধ্যানমগ্ন হয়ে। তারই সন্ধানে স্মরণাতীত কাল হতে সাধু-সন্ন্যাসী থেকে গৃহী, সংসারী, ধনী, দরিদ্র সব মানুষই সেই সব জায়গায় ছুটে গিয়েছে কালে কালে, এক পরম তৃষ্ণাকে বুকে ধারণ করে। তীর্থ করতে গিয়ে কেউ ফিরে আসত, কেউ বা ফিরে আসত না। যে ফিরত না সে অনন্ত স্বর্গ লাভ করত; যে ফিরত সে সুফলের সঙ্গে পরম তৃষ্ণার শান্তি নিয়ে গৃহে ফিরত। সেই পরমাশ্চর্য অভিজ্ঞতার কাহিনী মুখে মুখে ছড়িয়ে দিত তৃষিতের কাছে। সেই কাহিনী শ্রুতির মাধ্যমে স্মৃতিতে বিরাজ করে চলত বংশানুক্রমিক ধারায়। যারা যেতে পারেনি তারা ঘরে বসে তৃষিতচিত্তে স্মরণ করেছে এই তীর্থস্থানগুলি। কামনা করেছে এ জন্মে হল না পরজন্মে যাওয়া ঘটবে।

আজ দিন বদ্‌লেছে, কাল পাল্‌টেছে। তীর্থযাত্রার পথ অনেক সুগম হয়েছে। আজ তীর্থযাত্রার কাহিনী শ্রুতি ও স্মৃতি ছেড়ে

ছাপার অক্ষরের মাধ্যমে সকলের কাছেই সহজলভ্য হয়েছে। কিন্তু মন মাঝে মাঝে সংশয়িত হয়। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে মনও কি বদলে যায়নি? সেই পরম তৃষ্ণার আহ্বান কি তেমনিই আছে? মধ্যে মধ্যে হিমালয় ভ্রমণের কথার মধ্যে সে মনকে কখনও পাই, কখনও পাই না। তাই সংশয়িত চিত্তেই শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদবাবুর 'একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে' পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু পড়তে আরম্ভ করে তৃপ্তির সঙ্গেই অনুভব করেছি আমার সংশয় এক্ষেত্রে অমূলক। তিনি যে মন নিয়েই হিমালয়ের পথে পথে ও গঙ্গার ঘাটে ঘাটে যাবার জন্য বেরিয়ে থাকুন, বাইরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এই যাত্রার সনাতন মনকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন—নিজেই তার জবাব আবিষ্কার করেছেন। বলেছেন—এসেছিলাম ট্যুরিস্ট হয়ে, কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে, ভেবেছিলাম ওয়াইড প্যানোরামিক ভিউ মনের মাঝখানে গেঁথে নেবো। কিন্তু এ কি হল আমার! কার অমোঘ নির্দেশে আমার পশ্চিম-ঘেঁষা মনের এ আকুল পথ হারানো? ছিলাম ট্যুরিস্ট, হলাম যাত্রিক। সব অহঙ্কার, সব জিজ্ঞাসা পথের ধুলোয় মিলিয়ে গেল—অজানা কোন্ সে আকাশের হাতছানিতে! ……ভারতবর্ষের তীর্থযাত্রীর সনাতন তৃষ্ণার পুনরাবর্তন এরও মধ্যে। দেখে আশ্বস্ত হয়েছি, তৃপ্তি পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে হিমালয় পথিক ও তীর্থযাত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীউমাপ্রসাদ বাবুকে নমস্কার জানাই।

আর একটি কথা।

লেখক গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, হিমালয়ের বাঁকে বাঁকে ফিরেছেন যে যাত্রায় সে যাত্রা তো সাধু-সন্ন্যাসীর যাত্রা নয়, গৃহীর যাত্রা। তাই পথের বাঁকে বাঁকে সাক্ষাৎ ঘটেছে তাঁরই মত গৃহী মানুষদের সঙ্গে যারা তাঁরই সমতল থেকে যাত্রা করেছে। যেমন বহু মানুষ তাঁর যাত্রা পথে ছড়ানো ছিল তেমনিই তারা ভীড় করে এসেছে তাঁর রচনার

মধ্যে। সামান্য রেখায় ও স্বল্প পরিসরের মধ্যে তারা আপন আপন বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্ব-স্বরূপে বিচিত্র ও বিশিষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সকলের মধ্যেই লেখক একই তৃষ্ণায় তৃষিত হৃদয়কে আবিষ্কার করেছেন। তা যেমন একদিকে সজ্ঞান প্রয়াস বর্জিত তেমনি অন্যদিকে তা লেখকের সানুকম্প উদারতারই সাক্ষ্য বহন করছে। শ্রদ্ধা ও মমতার সঙ্গে শিল্পীসুলভ ভাষায় সমস্ত রচনাটি বিবৃত। লেখার গুণে রচনাটি শুধু সুখপাঠ্যই নয়, তৃপ্তিদায়কও মনে হয়েছে। পড়ে পাঠক তৃপ্তি ও আনন্দ দুই একযোগে পাবেন বলে বিশ্বাস করি।

২-৭-৬২

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনে পাওনার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছি, আশার চেয়েও অধিক। প্রত্যেকটি মানুষের স্নেহে ভালবাসায় আর মমতায় আমার মন-গঙ্গার ঘাটে ঘাটে আজ জোয়ারের উচ্ছ্বাস। সেদিন কেবল হিমালয়ের পথে পথে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরেছি, প্রাণ ভরে কেবল দেখেছি আর সোজা মানুষের মনের কথা শুনেছি। সারা-দিনের চলার শেষে রাত্রির অন্ধকারে মোম জ্বালিয়ে রোজনামচার খাতায় আপন মনের হিসাব লিখেছি। কখনও কল্পনা করিনি আমার কথাও পাঠকের দরবারে একদিন হাজির হতে পারবে। এখন শুধু মনে হয় কেন সেদিন আরও বেশী করে চোখ মেলে দেখে এলাম না, আরও দরদ দিয়ে কেন শুনে এলাম না মানুষের সুখ দুঃখের পাঁচালী! কিন্তু, যেটুকু দেখেছি, যেটুকু শুনেছি তাও কী কখনও সম্ভব কালির আঁচড়ে ব্যক্ত করা! অসম্ভব—অবিশ্বাস্য সে প্রয়াস।

বাঙ্গলাদেশের দরদী অমর কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও হিমালয়ের দুর্গম পথের চিরপথিক পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অকৃপণ ভালবাসা আর উপদেশেই আমার 'গঙ্গা' আজ বহু বাধা অতিক্রম করে সাগরের দিকে চলেছে। আমি জানি এঁদের আশীর্বাদ কখনও ব্যর্থ হবার নয়।

'নন্দাঘুন্টি' অভিযানের অন্যতম নায়ক শ্রীধ্রুব মজুমদার ও উত্তরসূরীর সম্পাদক বন্ধু শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যের দরদ ও আন্তরিকতা ব্যতিরেকে কখন সম্ভব হত না আমার এই 'একই গঙ্গার' আত্মপ্রকাশ। এদের সঙ্গেই পরম সুহৃদ শ্রীধরিত্রীমোহন গাঙ্গুলীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীঅরুণ বোস, শ্রীমতী মায়া সেন, শ্রীরমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্তা বীণাদেবী সেন, শ্রীবেণু মজুমদার, শ্রীঅজিত মৈত্র ও শিল্পী শ্রীদুলাল গুঁই,—এদের সবার কাছেই আমি চিরঋণী। সবাইকে আমার অন্তরের শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। ইতি—মহালয়া, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ সন ইং। পাটনা।

॥ শান্তি-নিকেতন,
ফ্রেজার রোড, পাটনা: ১

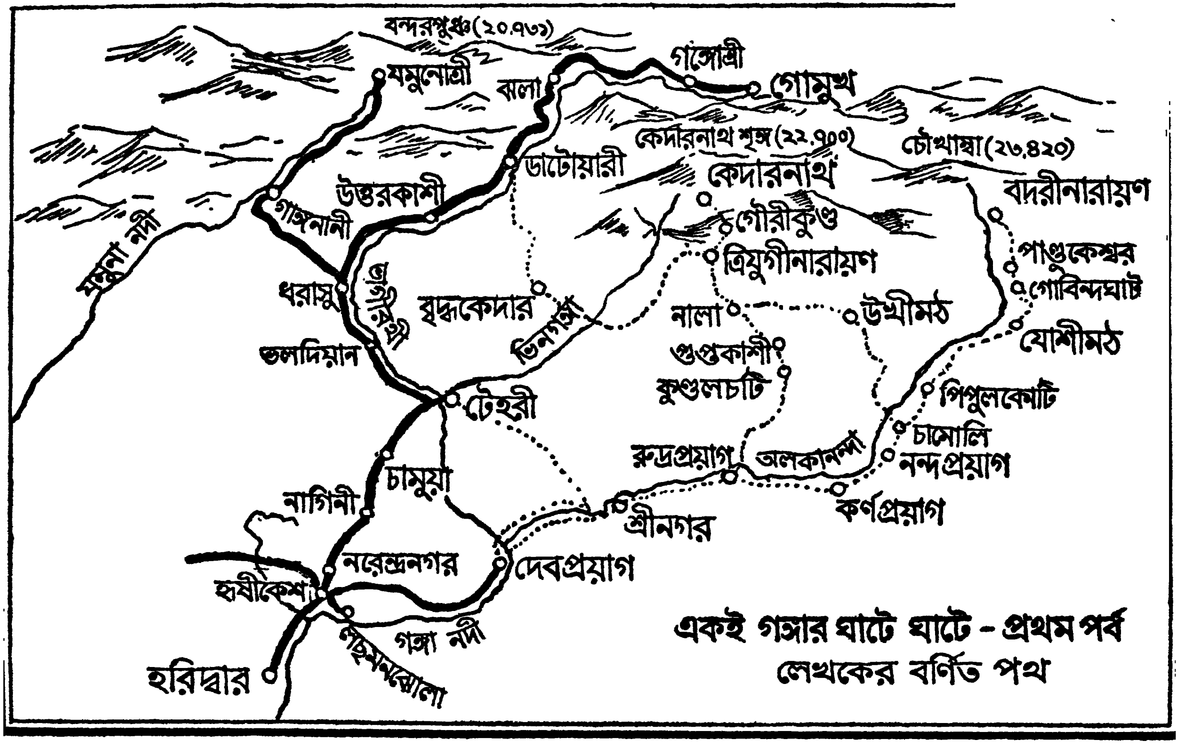
॥ লেখক ॥

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

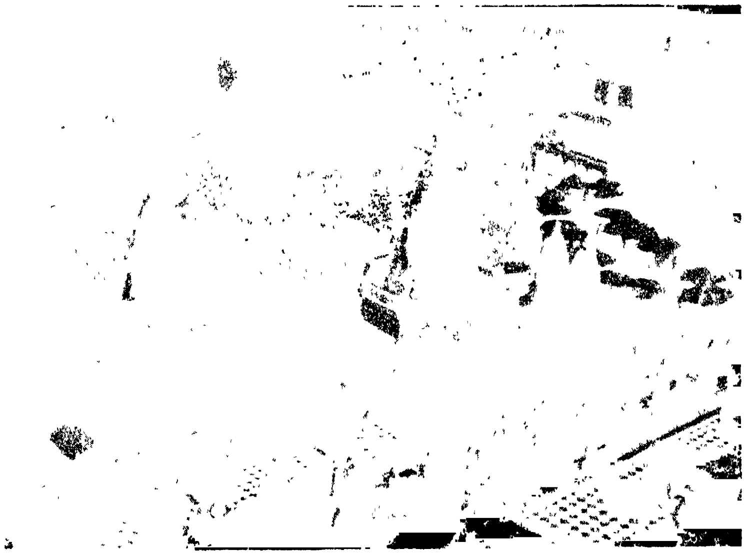
"একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে"-র প্রথম পর্বের এই নবতম সংস্করণে নতুন করে বলার মত আর কিছুই নেই, তবুও আবার নতুন করে মনে হয় তাদের কথা—যারা ছিল আমার নিত্য পথের সঙ্গী, নামহারা কত পথচারী—যাদের সঙ্গে আনন্দে আর ভাবনায় কেটেছে কত দীর্ঘদিন, কত বিনিদ্র রাত্রি। তাদের কেউ কেউ আজ বেঁচেও নেই, ঠিকানা তাদের হারিয়ে গেছে চিরদিনের মতন। তাদের সবাকার উদ্দেশ্যে জানাই আমার নমস্কার। শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই আমার সকল পাঠক পাঠিকাকে—যাঁদের আন্তরিক শুভকামনায় ও অভিনন্দনে আমি ধন্য হয়েছি। অধ্যাপক বন্ধু শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরম-যত্নসহকারে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবার নতুন করে সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁর কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। শুভাকাঙ্ক্ষী অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছেও আমার ঋণের অবধি নেই। তাঁদের সবাইকেই আমার অভিবাদন

॥ আঠারো নম্বর রাণামহল ॥
॥ বারাণসী-এক ॥

॥ লেখক ॥



একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে – প্রথম পর্ব
লেখকের বর্ণিত পথ



ব্রহ্মকুণ্ড, হরিদ্বার ফটো : দুলাল গুঁই।



অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গমে দেবপ্রয়াগ। ফটো : দুলাল গুঁই।



নির্জন পরিবেশে যমুনোত্রীর মন্দির। ফটো : উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

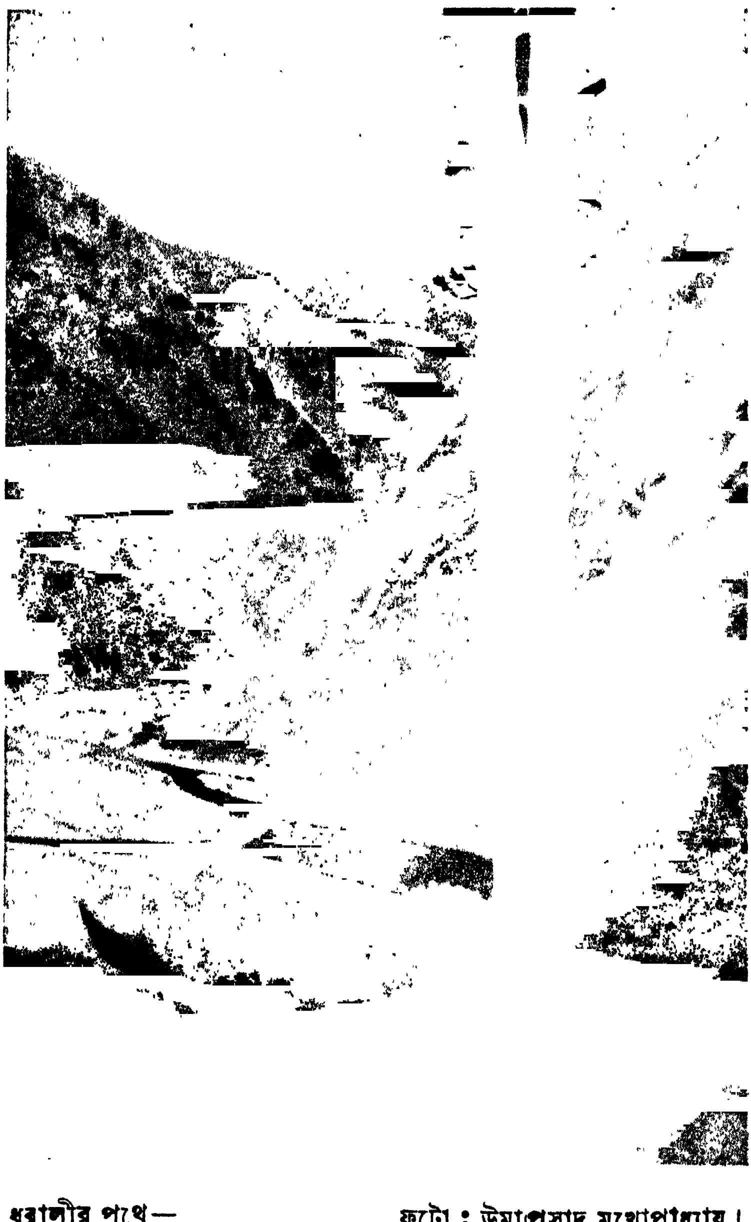
নির্জন পরিবেশে যমুনোত্রীর মন্দির

ফটো : উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়



সুকীর পথে

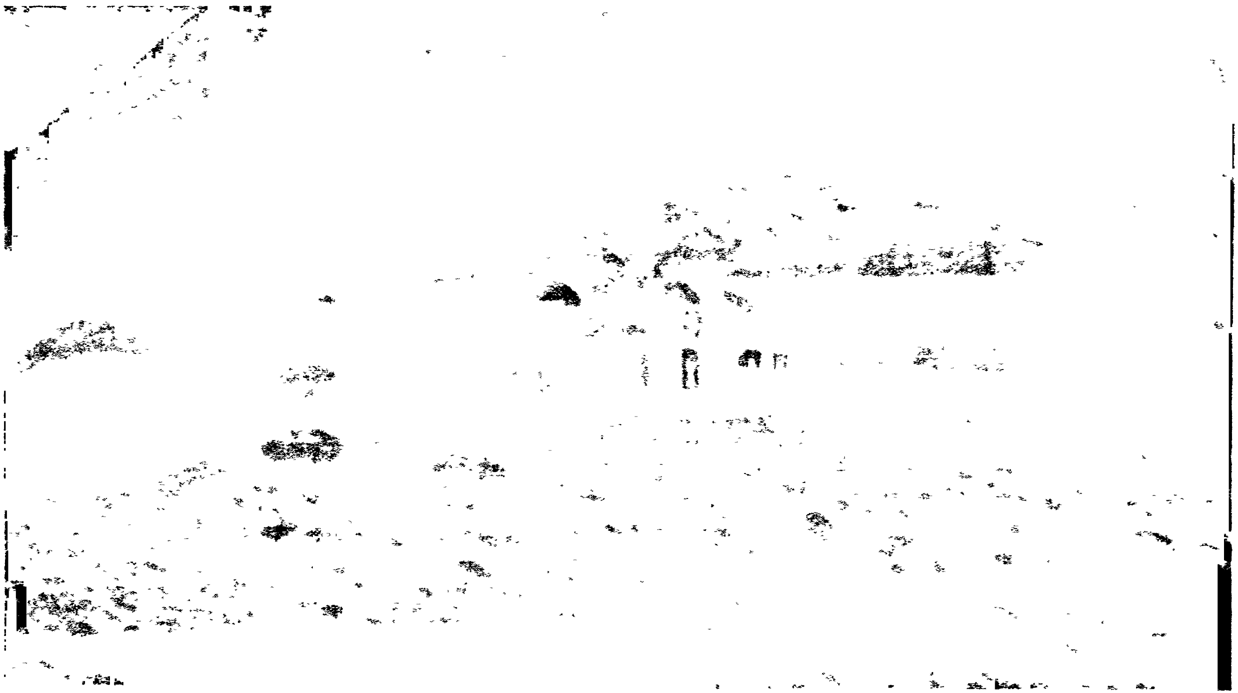
ফটো : উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়



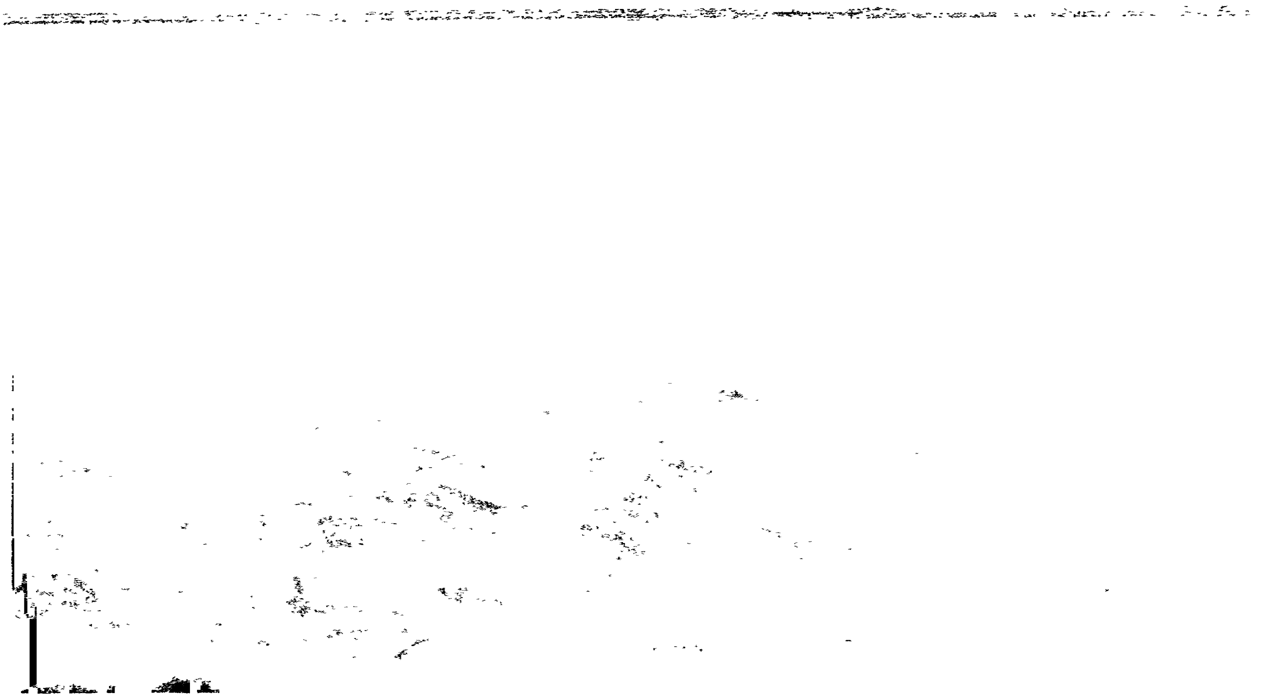
ধরালীর পথে—

"তোমার জটায় হারা
গঙ্গা আজ শান্তধারা।"

ফটো : উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।



ওপারে গঙ্গোত্রীর মন্দির। ফটো : উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।



"জাহ্নবী তাই মুক্ত ধারায়
উন্মাদিনী দিশা হারায়।"

ফটো : উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।





গোমুখের গুহামুখ

ফটো : উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

॥ ১ ॥

আকাশের গায়ে তখনও আলো আঁধারের লুকোচুরি চলেছে। নীল আকাশের গায়ে যেন বুটিদার তারার রোশনাই। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি নীল আকাশের পানে। ছুটে চলেছি উধাও পাখা মেলে, অসীমের মাঝখানে যেন চলেছে পাগলা-ঝোরা নিজেকে বিলিয়ে দিতে। ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়ার ছোঁয়ায় ঘুম আসছিল দুচোখ ভরে। কিন্তু এ আনন্দের গান, এ মুক্তির জোয়ার—আজ কি ঘুমানো চলে! ঘুমজড়ানো দুচোখ ভরেই দেখছিলাম এ আকাশ, এ পাহাড়, এ জলধারা। অমৃতের দ্বার যে ঐ সামনে। পাখীর কলকাকলিতে মুখরিত বনভূমি। ভোর হয়ে এল, আলোর ধারায় মুক্তি পেল অন্ধকার।

পাহাড় আর আবছা নেই, দূরেরও নেই, কাছে অতি কাছে দাঁড়িয়ে আছে কালজয়ী কালের সাক্ষী হরিদ্বার।

ভোর সাতটায় ট্রেণ এসে দাঁড়াল। চৈত্র মাস, তবুও বাইরে তখন বেশ ঠাণ্ডা। ভোরের শান্ত পরিবেশে আর মৌন আবহাওয়ায় হঠাৎ শুনি নানা জনের কলকোলাহল। পাণ্ডা আর কুলি, কুলি আর চা-ওয়ালায় লেগে গেছে বিষম প্রতিযোগিতা। টাঙাওয়ালা রিক্সাওয়ালাও ছাড়বে না। এ বলে এ দিক, হোটেলওয়ালা বলে—রয়েল হোটেল, গঙ্গা হোটেল। পাণ্ডা বলে—একদম গঙ্গাজিকি উপর বহুৎ আচ্ছা ধরমশালা। যাকগে। দেনাপাওনা মিটিয়ে বাইরে ত এলাম কোন মতে, কিন্তু এখন কোথায়!

মানুষ খোঁজে আশ্রয় আর মন খোঁজে মনের মত সঙ্গী। কে কোন্‌টা পায় জানিনা, কিন্তু আপন আশ্রয় ছেড়ে যে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে খোলা আকাশের নীচে তাকে কে

বলে দেবে মাথা গুঁজবার ঠিকানা? অথচ যে ঘর পেছনে ছেড়ে এসেছি সেই মায়া মমতা স্নেহ সে সকলের কথাও ত কণামাত্র ভুলতে পারিনি। তাই পথে নেমে এলে মনে পড়ে ঘরের কথা, ঘরে থাকতে পথের। কত বাধা, কত অনুরোধ, কত চোখের জলকেও ত উপেক্ষা করে এসেছি, কিন্তু রামপ্রসাদের চোখবাঁধা বলদ—বাইরে এসে দাঁড়ালেই কি আর চোখের ঠুলি খসে পড়বে! মুক্তি বুঝি বা চিরদিন এমনি করেই বন্ধনের মাঝে মাথা খুঁড়ে মরে। পথকে বেসেছি ভাল, পথের ধূলাকে করেছি পাথেয়, তাই বুঝি বা পথ আমাকে পথভুলিয়ে নিয়ে এসেছে এতদূরে।

তীর্থযাত্রার কি সুফল জানিনা, ভগবানকে উপলব্ধি করার শক্তি আমার নেই। কে আজ বলে দেবে সে পথের সন্ধান, সে আলোর উৎস কোথা থেকে আসে! কোন্‌খানে বেজে চলেছে সে আনন্দের গান, কোথায় সে আনন্দকুম্ভ!

পথের আনাচে কানাচে, অলিতে গলিতে চলেছে জীবনের শোভাযাত্রা। সে চলার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। চলা আর চলা। উদরে অন্ন নেই, নেই চলার শক্তি, কিন্তু শত ক্লেশ সত্ত্বেও মুখে আছে মিষ্টি হাসি। লালাজি আজও তোমাকে হেসে সম্ভাষণ জানাবে—জয় রামজিকি।

লালাজি কি ভুলে গেছে তার অতীত জীবনের বিক্ষুব্ধ দিন-গুলির কথা? ডেরা ইসমাইল খাঁ। তারও ছিল বিঘে তিনেক জমি, গোটা দুই গরু, জোড়া তিনেক বৈল। সব গেছে লালাজির, যায়নি শুধু তার অটল বিশ্বাস। আজও সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে সে এসে দাঁড়ায় গঙ্গার ঘাটের কিনারায়। অন্ধকার কালো আকাশের দিকে মুখ তুলে চায়, চোখে তার জল। অন্ধকার পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ভেসে চলে কালো মেঘের দল। মন্ত্র জানে না, তন্ত্র জানে না, জানে শুধু নিজেকে নিঃশেষে তাঁর

পায়ে বিলিয়ে দিতে। হাতজোড় করে বলে—মুন্নিকে আমার মিলিয়ে দাও।

গঙ্গার ধারে একদিন একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—রোজ অত রাত্রে তুমি অমন করে কাঁদো কেন? তার গোপন কথা জানাজানি হয়ে গেছে ভেবে লালাজি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল—কই আমি ত কক্ষনো যাইনা গঙ্গাজির ধারে। এতকাল হরদোয়ারে আছি একদিনও স্নান করতে যাইনি ব্রহ্মকুণ্ডে, কোন মন্দিরেও যাইনি কখন ফুল চড়াতে। ভগবান আমি মানিনা।

অনেক যুক্তি দিয়ে সে আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল, অবিশ্বাসী লালাজি শান্তির খোঁজে গঙ্গার পারে আসবে—সে আরও অবিশ্বাস্য ঘটনা। চোখের ভুল। কিন্তু আমি ত ভুল দেখিনি। আমি যে দেখেছি তাকে অশ্রুসজল চোখে মহাকালের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। তাই লালাজিকেও শেষ পর্যন্ত তার চোরা-কুঠরীর লৌহদরজা খুলে দিতে হয়েছিল—আপ ক্যায়সে দেখা বাবুজি। তব তো—আপ কো মনমেঁ ভি বহুৎ দুখ হ্যায়।

আমার সুখ দুঃখের রেওয়া কোনদিন মিলিয়ে দেখিনি। লালাজির অভিযোগে চুপ করেই ছিলাম। রাত্রি তখন অনেক। কল্ কল্ করে গঙ্গা চলেছেন সাগরের বুকে নিজের জ্বালা জুড়াতে। নীল আকাশের বুকে জ্বলছে হাজার হাজার তারার আকাশ-প্রদীপ। কালো পাহাড়ের কোলে জমেছে কালো মেঘ—বুঝি বা আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত।

লালাজি কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কাঁদুক, আরও ভাল করে কাঁদুক। মনে পড়ে তার পুরানো দিনের কথা। সন্ধ্যা নেমে আসে আপন গাঁয়ের কোল ঘেঁসে, পাহাড় কালো হয়ে আসছে ডেরা ইসমাইল খাঁর এক ছোট্ট গ্রামে। বাপ আর মেয়ে, মেয়ে আর বাপ। ছোট্ট তাদের সংসার, আরও ছোট্ট তাদের পরিবেশ। মা-মরা মুন্নিকে মায়ের স্নেহে আর বাপের কর্তব্য দিয়ে একটি

একটি দিন গুনে বড় করেছে লালাজি। মুন্নি এখন বড় হয়েছে। অপূর্ব দেহলাবণ্যের তট বেয়ে নেমে এসেছে যৌবনের জোয়ার। লালাজির সারাটা দিন কাটে মাঠে আর হাটে। মুন্নিই সংসারের কর্ত্রী। তন্দুরের রুটি, সব্জি আর দুধের গেলাশটা নিয়ে যখন দুপুর বেলা সে মাঠে আসে বাপের নাস্তা নিয়ে, লালাজি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, যেন খুঁজে পায় তার হারানো প্রিয়ার জলছবিটি। মানুষের এই একটু চাওয়া, একটু আশা; কিন্তু এইটুকুও অবৈধ—এইটুকুও অধিকার-বহির্ভূত।

তাদের গ্রামেও একদিন নেমে এল দুর্যোগের ঘনঘটা। চিরকালের চেনা মানুষ আজকে আবার ভিন্ন রূপে দেখা দিল। মানুষ মানুষকে খুন করে আপন পশুলালসার চরিতার্থতায় প্রবৃত্ত হল। ছোট্ট ছায়ায় ঘেরা গ্রামখানিতেও দাঙ্গা সুরু হল। নীরন্ধ্র অন্ধকার দুনিয়ায় দানবের শুধু এক হুঙ্কার—রক্তের বদলে চাই রক্ত। আজও লালাজি ভোলেনি সে দিনগুলির কথা। যারা জাত আর ধর্মের ছোঁয়াছুঁয়ি মানেনি কখন, নিজের রুটির ভাগ বসিয়েছে আধাআধি আলি খাঁর সঙ্গে, আলি খাঁ তার কলকের সুখটানে ভাগ দিয়েছে চৌধুরীজিকে। তারা ছিল পড়োশী, তারা ছিল এক আকাশের নীচে এক পৃথিবীর এক মাটির সন্তান। আজ তারাই ভুলে গেছে তাদের প্রাণের কথা। তারা লেখাপড়া জানে না—সে সুযোগ নিয়েছে কতগুলি মোল্লা মৌলভি আর টিকিধারী পণ্ডিত। আজ তাই সুরু হয়েছে চৌধুরী আর আলিতে রক্ত নিয়ে হোলিখেলা আর সুখের নীড় জ্বালিয়ে হোলিকা দহন। দেশ ভাগ হতে চলেছে। নিজের সন্তান গেল, স্ত্রীর আব্রু গেল, জননীর ইজ্জৎ গেল, সুখের বাসাটুকুও জ্বলে গেল, জমি গেল, জায়দাৎ গেল। গেল, সব গেল। শুধু পেল হিন্দু আর মুসলমান আলাদা আলাদা ঘর বাঁধার সীমানা। দেশ ছেড়ে চলেছে নতুন যাযাবরের দল, বাপদাদার সাতপুরুষের বসতবাটীর মায়া

কাটিয়ে চিরদিনের মত চলেছে ইহুদিদল নতুন করে ঘর বাঁধবে বলে।

ঠিক এমনি দিনে লালাজি গিয়েছিল পাশের গাঁয়ে আপন জমিজমার বন্দোবস্ত করতে। মাত্র দুদিন সময় লেগেছিল। ঘরেতে ছিল মুন্নি একা, দেখাশোনার ভার ছিল পড়োশী সুলতান খাঁর উপর। কিন্তু সুলতান খাঁ আপন বুকের রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়েও পারেনি মুন্নির ইজ্জৎ বাঁচাতে। দস্যুর দল একনিমিষে তচনচ করে দিয়েছে লালাজির সুখের সংসার। লালাজি ফিরে এসে দেখেছে পোড়ামাটির দেওয়াল আর সুলতান খাঁর বুকের খানিকটা কালোরক্তের দাগ। দস্যুর দল মুন্নিকে নিয়ে গেছে।

তারপর বহুদিন পার হয়ে গেছে। মুন্নিকে আর কোনদিন খুঁজে পায়নি লালাজি। কিন্তু আজও শেষ হয়নি তার মূঢ় তপস্যা। খুঁজে চলেছে আজও পথে পথে তার হারানো মুন্নিকে। গভীর রাত্রির অন্ধকারে গঙ্গার কলোচ্ছ্বাসের সুরে সুর মিলিয়ে লালাজির মত পাথরে গড়া মানুষও কাঁদে—মুন্নি, মুন্নি! বুকের বোঝা হাল্কা করে আবার ভোরের আলো জাগার আগেই ফিরে এসে বসে নিজের ছোট্ট দোকানটায়। উনান জ্বালিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে খদ্দেরের আশায় পথ চেয়ে বসে থাকে। এক্ষুনি দেরাদুন এক্সপ্রেস সাতটা ছত্রিশে হরিদ্বারে এসে পৌঁছুবে।

তারপর থেকে কতদিন লালাজিকে দেখেছি, কত গল্প করেছি, তার দোকানে কত চা খেয়েছি, কিন্তু কোনদিন ভুলেও লালাজি তার মুন্নির কথা আমাকে বলেনি। শুধু যাবার দিন আবার লালাজি আমার ছোট্ট ঘরখানায় এসেছিল, হাতে ছিল কাগজে মোড়া সেরখানেক প্যাঁড়া। তার ভালবাসার তোফা প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। নাগরিক সভ্যতায় দুটো টাকা দিতে চেয়েছিলাম। জবাবে শুধু সে আমার হাতদুটো চেপে ধরেছিল।

কানের কাছে মুখ এনে আরও একটি কথা সে বলেছিল।

মুন্নির কথা। মুন্নি মরেনি, আজো সে বেঁচে আছে। তাদের গাঁয়ের সালামৎ নাকি নিজে দেখেছে মুন্নিকে লাহোরের এক কুখ্যাত মণ্ডিতে। মুন্নি আজ পতিতা, দেহোপজীবিনী, বার-বিলাসিনী। যার কাছ থেকে এত আঘাত পেল সেই বিধাতার কাছেই কেঁদে চলেছে জিলা ডেরা ইসমাইল খাঁর পাথুরে মানুষটা। বিশ্বাস বুঝি একেই বলে, একেই বুঝি বলে আত্মসমর্পণ।

মানুষ তাই আজো হেসে চলেছে শীতে বর্ষায়, দুঃখে আনন্দে, জয়ে পরাজয়ে। সব অভিশাপ মাথা পেতে নিতে হবে আশীর্বাদ জেনে। সে চলা কোনকালে কোনদিন শেষ হবে না। শেষ হবে না তার পথ-পরিক্রমা। বিচিত্র অভিযান চলেছে সংসারের পথে পথে। আমার ভাল লাগে মানুষের মেলা, ভাল লাগে মানুষের এ শোভাযাত্রা।

॥ ২ ॥

আজ মহাপুণ্যদিন। বৈশাখীর স্নান ব্রহ্মকুণ্ডে। হাজার হাজার মানুষ এসেছে দূর-দূরান্ত থেকে, হরিদ্বারের পথঘাট আজ জনাকীর্ণ। পথে পথে মানুষের মেলা। মহামিলনের তীর্থ আজ হরিদ্বার। চৌধুরীজি, শেঠজি, সাধু সন্ন্যাসী, যোগী বৈরাগী, অন্ধ খঞ্জ, ধনী দরিদ্র, সবাই আজ মিলিত হয়েছে এ মিলনের মেলায়। পথ চলি আর অবাক হয়ে দেখি বিচিত্র মানুষের অভিযান। দেখি কত রঙ্। রঙে রঙে যেন ছেয়ে গেছে নদীর কিনারা। মুখরিত নানা রবে, নানা কথায়, নানা আলাপনে।

নদীর ওপারেও রঙের আগুন লেগেছে বনে বনে। পলাশের ডালপালাগুলি আজ লালে লাল। চৈত্রদিনের ঝরাপাতার খেলা শেষ হয়েছে, নতুনের ডাক পড়েছে পাতায় পাতায়, শাল পিয়ালের বনে, সবুজ ঘাসের বুকে, ঐ রুক্ষ পাহাড়ের বুকেও। দেখা যায় দূরে পাহাড়ের চূড়ায় চণ্ডীদেবীর মন্দির, অঞ্জনাদেবীর মন্দিরের শিখর-চূড়াটি, আর দেখা যায় পশ্চিম পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় মনসাদেবীর মন্দির। আরতির মঙ্গল ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে দূরে আর তার প্রতিধ্বনি জাগে পাহাড়ে পাহাড়ে, মূর্ছিত হয় আকাশে বাতাসে অন্তরীক্ষে।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভারতাত্মা হিমালয়। কখন রৌদ্রকরোজ্জ্বলে ঝলসিত কখন বা ঘনকুয়াসার অন্তরালে অন্তর্হিত। যাত্রীদল অবাক হয়ে চোখ তুলে চায় হিমালয়ের দিকে আর গঙ্গার কলরোলে অনির্দেশ্য কল্পনার ভেলা ভাসিয়ে দেয় আপন মনের মাধুরী মিশায়ে।

লোকে লোকারণ্য তটভূমি। বৃদ্ধ পণ্ডিত মিশিরজি আপন মনে বীণা বাজিয়ে রামগান গেয়ে চলেছেন। সে গান সে সুর আজও আমার মনের বীণায় বেজে ওঠে—

রাম নাম মণি-দীপ ধরুঁ, জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহের হুঁ, জোঁ চাহসি উজিয়ার॥

কী অপূর্ব সে গান, সে কণ্ঠস্বর, সে সজল চোখের কাতর বিনতি। বৃদ্ধ মিশিরজি আজ পথশ্রমে ক্লান্ত, ওপারে যাবার দিন গুনছেন রামগান গেয়ে গেয়ে। সাদা চুলের গোছা আর শ্মশ্রুরাশি বাতাসে উড়ছে, হাতে বীণা, চোখে জল আর কপালে বলির রেখা। দুপাশে বসে দুটি তরুণ কিশোর। সুন্দর মুখশ্রী আর তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল তাদের দেহলাবণ্য। এরাই বৃদ্ধের উত্তরপুরুষ। মিশিরজি রামগান করেন, কিশোর দুটি দোহার ধরে। বৃদ্ধ বলেন রাম, তারা বলে রাম, রাম। মিশিরজি গেয়ে চলেছেন আপন মনে—

সকল সুমঙ্গল দায়ক রঘুনায়ক গুণগান
সাদর সুনহিঁ তে তরহিঁ ভব সিন্ধু বিনা জলযান।

সহরের মানুষ—ঠিক বুঝতে পারি না তাঁর গানের অন্তর্নিহিত সহজ মানে। কোথায় যেন এক বিরাট ব্যবধান। বুঝতে পারি কিন্তু বোঝাতে পারি না। মিশিরজি মাঝে মাঝে রামগান থামিয়ে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন তুলসীদাসের ভজনের দ্যোতনা, কবীরজির দোঁহার সহজ ব্যাখ্যা। কি পৃথিবীতে আমরা বাস করছি, শুধু মিথ্যা আর ছলনা, কুহক আর বঞ্চনা ভুলিয়ে রেখেছে সংসারটাকে। আজ শুধু মিথ্যারই জয়জয়কার।

সচ্চা কহে ত মারে লট্ঠি—ঝুটা জগত ভুলায়ি।
গলী গলী গোরস ফিরে, মদিরা বৈঠে বিকায়ি॥

—সত্যি বলবে ত প্রতিদানে মিলবে শুধু লাঠির আঘাত, মিথ্যাই জগৎকে ভুলিয়ে রেখেছে। আজ দুনিয়ার সব কিছুই উল্টে গেছে —সত্য মিথ্যার সব প্রভেদ ঘুচে গেছে। নইলে,

চলতি কো গাড়ী কহে, বনা দুধ কা খোয়া,
রঙি কো নারাঙি কহে—শুন শুন কবীরা রোয়া।

শুদ্ধ হিন্দীতে গাড়ী মানে ত স্থবির, কিন্তু আমরা গাড়ী বলছি কাকে, না যা চলছে, যেমন রেলগাড়া, মোটরগাড়ী। দুধের সারবস্তুকে পেয়ে বলছি খোয়া। পাচ্ছ আসল বস্তু আর বলছো খোয়া—মানে, হারিয়ে গেছে। বারে অবাক পৃথিবী! নারাঙির মত অপূর্ব রঙ্গিন ফলের নাম রেখেছ রঙ নেই। কবীর তাই এ সব মিথ্যা ভাষণ শুনে শুনে কাঁদছেন।

অবাক হয়ে শুনছিলাম মিশিরজির জীবনদর্শন। কখন যে সময় থেমে গেছে বুঝতে পারিনি। আবার বীণার ঝংকার তুলে গান ধরেছেন—

মোতিন কী কণ্ঠমাল, তারাগণ উরবিশাল।
শ্রবণকুণ্ডল ঝলমলত রতি পতি ছবি ছায়॥
সখা সহিত সরযূতীর বিহরত রঘুবংশ বীর।
তুলসীদাস হরষ নিরখি চরণ রজ পায়॥

আকাশে জেগেছে দ্বিতীয়ার ক্ষীণ বাঁকা চাঁদ, বাতাসে জেগেছে মৃদু হিল্লোল, রামগানে মধুর বাতাস। গঙ্গার স্রোতে ভেসে চলেছে শত শত ফুলের ভেলা আর তাতে জ্বলছে ছোট প্রদীপশিখা। হাওয়ায় কাঁপছে সে শিখা আর জলতরঙ্গে দুলছে ফুলের ভেলা। গঙ্গাকে ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে আর প্রদীপ জ্বালিয়ে মনের পূজা দিয়েছেন শত শত ভক্তজনে। আমারও মনে হল কত শত ব্যথা, কত আপনজনের কথা। যাঁরা একদিন কাছে ছিলেন আজ তাঁরা কোথায়—কতদূরে! সবাই একে একে চলে গেলেন অজানার ডাকে। আকাশের পানে মুখ তুলে নির্বাক চেয়ে থাকি—বুকের জ্বালা জুড়াতে আজ সব ছেড়ে যে তোমাদের কাছে এসেছি। প্রণাম করে ছোট্ট কর্পূর শিখাটি জ্বালিয়ে ফুলের ভেলা ভাসিয়ে দিলাম

অজানার উজানে। ভেসে চলেছে দুলে দুলে, দূর থেকে দূরে, আরো দূরে, তারপর মিলিয়ে গেল দৃষ্টির অন্তরালে।

আসন ছেড়ে উঠে এলাম ভীড়ের মাঝে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার আবিষ্কার করতে হল যে, কখন যেন নিজের পরিত্যক্ত পুরানো খোলসে ফিরে এসেছি। অমন যে আত্মবিস্মৃতি, অমন যে আত্মবিস্তার, গঙ্গার যে অমন সম্মোহন—মুহূর্ত মধ্যে কোন কিছুরই আর কণামাত্র অবশিষ্ট রইল না। পরিচিত জনতার মধ্যে আমি তখন আবার অপরিচিত একজন মাত্র। সন্দেহসঙ্কুল দৃষ্টিতে, সংশয়ক্লিষ্ট মনে আবার সবকিছু দেখছি, শুনছি, বিচার করছি এবং বিনাদ্বিধায় মতামত গ্রহণ করছি। মুহূর্তকাল আগেকার ঐ ভাববিহ্বলতা আর বর্তমান মুহূর্তের এই সংশয়প্রবণতা এ দুয়ের মধ্যে যে কিছুমাত্র যোগ নেই সে কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বাহুল্য। আমি তা জানি। কিন্তু এই দ্বিবিধ আচরণের একটাতেও যে কণামাত্র কপটতা নেই এবং প্রত্যেকটি যে সম্পূর্ণরূপে ভনিতামুক্ত—সে কথা অস্বীকার করব কেমন করে। দুটোই পরস্পর-বিরোধী এবং মুহূর্তকালের ব্যবধানে দুটোই সত্য।

আচরণের এই অযৌক্তিকতা কি ব্যক্তিগত কোন দুরারোগ্য ব্যাধির লক্ষণ, না এ আমাদেরই যুগের অমার্জনীয় অভিশাপ সে কথা হলফ্ করে বলতে পারবো না। তবে ব্যাকরণের বিচারে সত্তা শব্দটি একবচন হলেও আজকের অভিজ্ঞতায় সে বহুবচন। বাইবেলের সঙ্গেই ব্রাড্‌লে এবং নাগরিক জীবনের একঘেয়েমির মধ্যেই মুক্তির চিন্তা আজ আর বিসদৃশ মনে হয় না। গঙ্গার স্রোতধারা থেকে গঙ্গাঘাটের এ জনস্রোত আদর্শের দিক থেকে শত যোজন দূরে, কিন্তু আজকের এই বিকৃত সত্তা এই মুহূর্তে একটিতে অবগাহন করে পরমুহূর্তে আবার অপরটিতে স্বচ্ছন্দে নিজেকে হারিয়ে দিতে পারে। অন্তত আমি তা পেরেছি এবং আমি তা অস্বীকার করবো না।

গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে বিরাট জলসা সুরু হয়েছে একটু দূরে। এখানেই ভীড়টা যেন সবচেয়ে বেশী। অনাথ আশ্রমের কয়েকজন পাণ্ডা হিন্দী কথাচিত্রের সুরে আর কাওয়ালি ঢং-এ সুরু করেছেন হারমোনিয়াম সহযোগে সতী অনসূয়ার অমর গাথা। তবলায় তাল দিয়ে চলেছেন তবলচি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম শ্রোতাদের। নানা রঙের শাড়ি, নানা কথার ফুলঝুরি আর ছন্দে ছন্দে বেজে চলেছে কাঁচের চুড়ির টুংটাং রিনিরিনি। নাইলন দোপাট্টায় অঙ্গ ঢেকে আর রেশমী শালোয়ারে সভ্যতা বাঁচিয়ে নানা আলাপনে ঘরের কথা বলে চলেছেন পাঞ্জাবী কিশোরী তন্বী কিংবা বসার জায়গা নিয়ে কলহ সুরু করেছেন স্থূলা কোন সিন্ধী গৃহিণী।

আধুনিক যুগের সভ্যতার প্রতীক, নারীসজ্জায় নাইলন আর পনিটেল, লালঠোঁট আর মুক্ত পেটের মেদপিণ্ড। সহরে দেখছি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এই আধুনিকাদের মিছিল। অনাবশ্যক চুলের গোছাকে সংকুচিত করেছেন অসংকোচে, তাম্বুলপানে বিরত থেকে দাঁতের সৌন্দর্য অম্লান রেখে ঠোঁট রাঙ্গানোর কৌশল তাঁরা জানেন। ঘোমটা গেছে বহুকাল, আচ্ছাদনটুকু ছিল কিন্তু; এবার বুঝি তাও গেল! জামার পরিধি কমতে কমতে কোথায় এসে ঠেকেছে! নাইলনের বহুল সমাদর দেখে মনে হয় আদিম যুগের আদর্শই আবার লেটেস্ট বলে পুনঃপ্রচলিত হবে। সহরের পরিবেশ ছেড়ে হরিদ্বারে এসেও যদি দেখতে হয় এ সাজ-সজ্জা—তবে বাঞ্ছিত কামনা লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে বালুতে মুখ লুকায়।

গানের পালা শেষ হতে না হতেই ভীড় সাফ। ব্যাপার কি! না, এবার দানের পালা। দানপাত্র হাতে এগিয়ে আসে, তাই মুহূর্তে সব ফাঁকা। আমরাও তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম সামনে। সেখানেও লোকের ভীড়।

সুভাষ ঘাট। অবাক হয়ে চেয়েছিলাম শ্বেতমর্মর মূর্তিটির

পানে। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপনি চোখ নেমে আসে। বাংলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে হরিদ্বারে গঙ্গার পারে তোমার শ্বেতমর্মর প্রতিমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে শুধু একটি কথাই বার বার মনে হয়েছে—চিরকাল তোমাকে পূজা করবে এ দেশের মানুষ, তোমার আসন পাতা সবার মনে, নাইবা রইল তোমার ব্রোঞ্জের মূর্তি পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে কিংবা কার্জন পার্কে।

হঠাৎ যেন সুর কেটে গেল চাটমণ্ডির সোরগোলে। গোলগাপ্পা আর চাটের দোকান বসেছে অগণন। কত দোকান আর কত যে খদ্দের তার হিসাব রাখা দায়। বিরাট বিরাট লোহার চাটুতে ভাজা হচ্ছে আলুচাট, পাকোড়া, আলু কাবলি। গোলগাপ্পা সাজান থরে থরে। উত্তরভারতের বিশেষ প্রিয় সান্ধ্যভোজের আসর এই চাটমণ্ডি। দোকানীর হাঁকে, কুলফি মালাই ও হজমিওয়ালার কাতর বিনতিতে চাটমণ্ডি সরগরম। অবাক হয়ে চেয়ে থাকি ক্রেতাদের মুখের দিকে। কী সহজে আর কী অবলীলাক্রমে, কী ক্ষিপ্র গতিতে আর কী অপূর্ব ভঙ্গীতে খেয়ে চলেছেন তাঁরা।

বাংলাদেশের পেটরোগা ছেলে শুধু চেয়েই থাকি। সাহস করে হজমি আর হাকিমের উপর ভরসা রেখে ওসব অমৃতধন ছুঁতে আর পারিনি। শুধু দেখেই গেলাম।

॥ ৩ ॥

দেখে গেলাম কত মানুষ, জানলাম কত মানুষের কত চোখের জলে সিঞ্চিত কত করুণ কাহিনী। হরিদ্বারের পথেই দেখেছিলাম রিক্সাওয়ালা তিলককে। সুন্দর, ফুটফুটে গায়ের রঙ, কোঁকড়া কালো চুল, আয়ত দুটি চোখ আর কালো কালো ভোমরার ডানার মত নবীন গোঁফের রেখা। আর সবসময় মুখে লেগেই আছে সহজ সরল হাসি। সত্যি মাঝে মাঝে রাগ হত—কী বোকার মত না হাসতে পারে তিলকটা। জামা ছেঁড়া, পাজামা ফেটে গেছে—তিলক হাসছে। আজ খাওয়া জোটেনি—তিলক হাসছে। পথে এক বুড়িকে ধাক্কা দিয়ে একরাত হাজতবাস করে এল—তবুও হাসছে বুদ্ধু তিলক। বোকা, মহাবোকা রিক্সাওয়ালাটা।

উত্তরভারতের নাম-না-জানা অখ্যাত এক গাঁয়ের ছেলে তিলক। তার ভালবাসার প্রতিদানে কি দিয়েছিলাম জানিনা, আমার দেওয়া ভাড়া হিসাবে গোটা পাঁচেক টাকায় কি কখন শোধ হবে তার ভালবাসার ঋণ!

—বাবুজি আপ তো বাঙ্গালী হ্যাঁয় না? মছলি বগের রোটি খানা বহুৎহি মুসকিল হ্যায় আপকে লিয়ে।

—মুসকিল হলেও বা উপায় কি! হরিদ্বারে এ সব নিষিদ্ধ ভক্ষণ চিন্তা করাও যে মহাপাপ।

—আরে বাবু ছোড়িয়ে এ মুসকিল কি বাত। কনখলমেঁ সবকুছ মিলতা ভি হ্যায়। কভি কভি পাণ্ডালোগভি খা লেতা।

—আরে চুপ, চুপ, কে কোথা দিয়ে শুনে ফেলবে। আমি ত ভয়ে মরি। তিলক বেপরোয়া। বলেই চলেছে সে তার আপন কথা আপন সহজ ভাষায়, সরল ভঙ্গীতে।

সব সওয়ারী ছেড়ে দিয়ে সেই ভোর থেকে ধর্মশালার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে তিলক। ভয়—পাছে বাঙ্গালীবাবু দুসরা কোন রিক্সায় চেপে বসেন। কত বলেছি, কতবার তিলককে বুঝিয়েছি, মেলার এ ভীড়ের দিনে সওয়ারী ছেড়ে আমার জন্য কেন মিছিমিছি বসে থাকিস। তিলক হাসে। আমার কথা ওর কানে গেছে কিনা তা বুঝতে পারিনি, বুঝেছে কিনা তাও জানিনা। আমি আমার কথা বলে গেছি, তিলক তিলকের মত হেসে গেছে।

—কোথায় থাকিস? তোর বাপমাই বা কোথায় থাকেন? জবাবে শুধু করুণ হাসি হেসেছিল।

—হামারা কোই নেহি সংসারমেঁ। না বাপ না মা। ম্যায় এক ইয়াতিম। ব্যস্ ইয়ে মেরি ছোটি সি কহানী।

অনাথ তিলকের ছোটি সি কহানী যেদিন সে আমাকে বলেছিল সেদিন সে কিন্তু আর বোকার মত হাসেনি। শুধু কেঁদেছিল। বলেছিল সংসারে সে বাপের নাম পর্যন্ত কোনদিন শোনেনি। সংসারে মা তাকে শুধু দিয়েছেন অপমান আর জারজ পরিচয়ের নির্লজ্জ ইতিহাস। যাক, সে কথা আজ নয়—পরে শোনাবো।

কনখল। গঙ্গার ওপারে আর একটি ছোট্ট কর্মমুখর নোংরা সহর। পথে যেতে যেতে দেখলাম কত আশ্রম, আখড়া, কত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, কত মন্দির, কত ধর্মশালা। দেখলাম রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট কর্মপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রভৃতি। কত অনাথ আতুর অন্ধ খঞ্জ রোগী স্থান পেয়েছেন নারায়ণের আসনে এঁদের দাতব্য চিকিৎসালয়ে। নিজের চোখে দেখে এলাম স্বামীজিদের সেবা, পরহিতে নিজেকে বিলিয়ে দেবার অপূর্ব দীক্ষা।

তারপর এলাম দক্ষরাজার মন্দিরে। প্রাচীন মন্দির—পাশ দিয়ে ছুটে চলেছেন শীর্ণতোয়া নীলধারা। নুড়ি পাথরের মেলা নদীর বক্ষে।

মন ছুটে চলে পুরাণের পাতায় পাতায়। বিরাট যজ্ঞের

আয়োজন করেছেন নিখিল পৃথিবীর অধীশ্বর দক্ষপ্রজাপতি। পৃথিবীকে শাসন করতে দেবতারা পাঠিয়েছিলেন মর্ত্যে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষরাজাকে। কনখল তাঁর রাজধানী। বিরাট যজ্ঞশালায় ত্রিভুবনের সকলেই উপস্থিত—দেব দানব, যক্ষ রক্ষ, গন্ধর্ব কিন্নর। দক্ষরাজা স্বয়ং যজ্ঞকর্তা, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ যজ্ঞের পুরোহিত, অমরবৃন্দ সেই যজ্ঞের সদস্য। বিরাট সে যজ্ঞশালায় শুধু নিমন্ত্রণ পাননি কন্যা সতী ও জামাতা ভোলা মহেশ্বর। বিনা নিমন্ত্রণেই পিতৃগৃহে এসেছেন শংকরপ্রিয়া। কত আশা, কত আনন্দ মনে। কিন্তু সকল আনন্দের শিখাই নিভে গেল এক নিমেষে। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে যজ্ঞশালায় দেহত্যাগ করলেন সতী। সমস্ত বিশ্বে নেমে এল মহাপ্রলয়, মহাঝঞ্ঝা। বেজে উঠলো প্রলয়েশের ডম্বরু। প্রলয় নৃত্যের তালে তালে খুলে গেল তাঁর জটার বাঁধন। আকাশে বাতাসে দেখা দিল ধ্বংসের সংকেত—স্বরু হল মহাপ্রলয়, বেজে উঠলো মৃত্যুর দুন্দুভি। সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে প্রলয়নৃত্য স্বরু করলেন দেবাদিদেব মহেশ্বর এই এখানে—এই কনখলে, দক্ষপতির যজ্ঞশালায়।···মনটা যে কোথায় চলে যায় ঐ চণ্ডীপাহাড় ছাড়িয়ে দূরে অনেক দূরে।

স্নান সেরে চুপ করে বসে ছিলাম পৈঠায়। তারপর বজরংবলীর মন্দির, দক্ষেশ্বর শিবের মন্দির দর্শন করে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে ভীড় মানুষের, রিক্সার, টাঙার, ভিখারীর। আমার পাণ্ডা তিলক হাসিমুখে তার রিক্সাটাকে ঠেলেঠুলে একেবারে আমার সামনে এসে হাজির।

জবাবের প্রত্যাশা কোনদিন করেনি তিলক, একাই সারাপথ বকতে বকতে চলেছে। দেখিয়ে—ইয়ে বহুৎ বড়া এক আখড়া হ্যায়। সালমেঁ একদিন বহুৎ বড়া এক দংগল ভি হোতা হ্যায়। কিতনে বড়ে বড়ে পাহেলোয়ান আতে হ্যাঁয়।

কত যে বলেছে আর কত যে দেখিয়েছে—বাগানবাড়া, আশ্রম,

আখড়া, অনাথালয়, আর ধরমশালা তার হিসাব রাখিনি। কিন্তু আজকে তিলক কাছে নেই, কোনদিন হয়ত আর তিলককে দেখবো না, তাই বুঝি আজ বারে বারে মনে হয় কেন সেদিন বেশী করে শুনে রাখলাম না তিলকের বানানো রাজা উজিরের গল্প-কাহিনী। হঠাৎ তিলকের একটি কঠিন প্রশ্নে হাসি এল, ভাবনাও হোল খানিকটা। প্রশ্নটি হল সহরের নামকরণ নিয়ে। সহরের নাম হরিদ্বার না হরদোয়ার।

কঠিন প্রশ্ন সন্দেহ নেই। মনে হল এমনিধারা প্রশ্ন করে নরেনদার কাছে একদিন ধমক খেয়েছিলাম। —দেখ বাপু তোমরা সাহেবসুবো মানুষ ঠাকুর দেবতা ত মান না, কিন্তু একটা কথা, ঠাকুরদেবতার কোন ব্যাপারে নাক গলাতে যেওনা কক্ষনো।

—ঠাকুরদেবতা কোথায় দেখলেন নরেনদা ?

—কোথায় দেখলাম! এ সমস্ত উত্তরাখণ্ডই হল হর আর হরির লীলাভূমি। দেখছো না স্বয়ং ভারত সরকারের রেলদপ্তর পর্যন্ত হাত দেয়নি যাতে, তুমি নাক গলাতে চাও সেখানে। হরিদ্বার রেলস্টেশনে দেখবে হিন্দিতে লেখা হরিদ্বার আর ইংরেজিতে লেখা হরদোয়ার। দুজনকেই খুসী রেখেছেন আমাদের সরকার। নইলে, দেখছো না বেনারস বারানসী হল, ভিজাগাপট্টম বিশাখাপত্তন হল, কিন্তু হরিদ্বার হরদোয়ার হলনা কিংবা হরদোয়ার হরিদ্বার।

সত্যি অকাট্য যুক্তি আমার নরেনদার। নরেনদার আরেকটা উপদেশ কোনদিন ভুলবো না—যেখানেই কনট্রোভারসি সেখানেই ছেঁটে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

নরেনদার মুখে অনেক শুনেছি পুরাণের গল্প, অতীতের কত কাহিনী। খোলা ছাতের উপর শুয়ে শুয়ে শুনতাম নরেনদার সব গল্প। কত রাত হয়ে যেত। কখনও বা ঘুমিয়ে পড়তাম ঠাণ্ডা হিমেল বাতাসে। হঠাৎ যখন বুঝতে পারতেন যে শ্রোতা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, তখন বেদম ক্ষেপে উঠতেন নরেনদা। বলতেন—

এসব ভগবানের গল্প শুনতে ভাল লাগবে কেন! অনাচারে আর ব্যভিচারে দেশটা গেল।

সত্যি বুঝতাম না আমার এ অনিচ্ছাকৃত ঘুমের মাঝখানে কোথায় খুঁজে পেলেন নরেনদা অনাচার আর ব্যভিচার। তবে নরেনদার রাগ কমাবার ওষুধ আমার জানা ছিল। প্রয়োগে ফল অনিবার্য।

—আজ কদিন যাবৎ শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না, কী যে করি। দেখছেন না কী ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ছি দিন দিন। ঘুমিয়ে পড়ি অথচ টের পাই না।

—তাই বল্। আমি আগেই টের পেয়েছি। মুখে না বললে বুঝবো কী করে! আমি ত আর ধন্বন্তরী নই।

হঠাৎ সব আগুন একেবারে জল। রাগ ত কমলো কিন্তু ঝামেলা সুরু হল।

নরেনদা কালক্ষেপ না করেই তাঁর বাপদাদার আমলের হোমিওপ্যাথির কাঠের বাক্সটা খুলে বসলেন মাথার কাছে। সুরু হল প্রশ্নের পর প্রশ্ন আর মেটিরিয়া মেডিকার পাতা ওল্টানো। নাক্স-ভোমিকা............নাক্সভোমিকা, পলসেটিলা............পলসেটিলা, বেলেডোনা ব্যাস্! পেয়েছি।

আমার শরীরের কথা শুনলেই সুরু হত তাঁর গরম দুধ খাওয়াবার পালা আর ভাতের থালায় নিত্য দুবেলা দুচামচ সরবাটা ঘি দেবেনই আমাকে। প্রাণের অধিক প্রিয় হরলিক্সের বোতলে রাখা সরবাটা ঘিটুকু যে কী যত্ন করে রাখতেন! নিজে খেতেন না পাছে ফুরিয়ে যায়, কিন্তু কোনদিন কৃপণ হতে দেখিনি তাঁকে আমায় দেবার বেলায়।

কৃপণ বলে দুর্নাম ছিল নরেনদার। সপ্তাহে দাড়ি কামাবেন একবার। কারণ, ব্লেডের দাম বেড়েছে। নিজে দুধ খাবেন না। কারণ, আজকাল হরিদ্বারের সব গোয়ালাগুলোই সেরে এক ছটাক

জল মেশায়। কিছু প্রতিবাদ জানাতে গেলেই নরেনদা বলতেন, —তোর কি! সংসার কাকে বলে তা ত আর জানলি না কখনো! কেবল হেসে আর নাকে তেল দিয়ে বয়সটা বাড়িয়ে গেলি। বেশ আছিস। না যোগী, না বৈরাগী, না সংসারী, না সন্ন্যাসী।

সত্যি বেশ আছি। নরেনদা আজ কোথায় আছেন জানিনা। কিন্তু আমার এ পথ-চলার কাহিনী আর মানুষ-চেনার ইতিহাস যদি একবার তিনি জানতেন তবে নিশ্চয় নরেনদা আমাকে আশীর্বাদ করতেন, জড়িয়ে ধরে আদর করে বলতেন, তুই একটা আস্ত ইয়ে, সংসারের কিচ্ছু বুঝিস না।

এ বিরাট সংসারে কত মানুষের ভালবাসা পেয়েছি, কত মানুষের চোখের জলের বেদনাভরা কাহিনী আমি জেনেছি। জেনেছি অনেক, দেখেছি আরও বেশী, কিন্তু বুঝিনি কিছুই।

॥ ৪ ॥

হরিদ্বারের দিনগুলি মুখর হয়েছিল নরেনদার স্নেহে আর শাসনে। হরিদ্বারের গল্প সব নরেনদার কাছেই শোনা। পুরাকালে নাকি এ খণ্ডের নাম ছিল অনেক—ব্রহ্মপুরী, মায়াপুরী, হরিদ্বার, হরদোয়ার, গঙ্গাদ্বার, কপিলক্ষেত্র, নীলপর্বত, আরও কত কি। স্কন্ধপুরাণ, পদ্মপুরাণ, শিবপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থমালায় এ পবিত্র ক্ষেত্রের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। এ পবিত্র ক্ষেত্র গঙ্গার পবিত্র জলসিঞ্চনে মহাপবিত্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবগণের পবিত্র চরণপদ্ম স্পর্শে ধন্য এ পরমভূমি—সমস্ত হিন্দুর মনের মণিকোঠায় অনন্ত কালের অনির্বাণ আকাশ-প্রদীপ।

পুরাকালে রাজা শ্বেতু গভীর তপস্যায় সন্তুষ্ট করেছিলেন ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মার আশীর্বাদে বর পেয়েছিলেন রাজা শ্বেতু এ ভূমিখণ্ডের অধিকার। এ ভূমিখণ্ডের নামকরণ হল ব্রহ্মপুরী। আজ যেখানে পবিত্র ব্রহ্মকুণ্ড সেখানেই ছিল রাজা শ্বেতুর আবাসভূমি। তারপর এলেন ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রজাপতি, বিষ্ণুর উপাসক। গভীর তপস্যায় লাভ করেছিলেন উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর চরণযুগলস্পর্শ। সে কাহিনীর সাক্ষী হরি-কি-পয়ের, মানে হরির চরণযুগল। গঙ্গার পবিত্র জলধারা অহর্নিশি ধুইয়ে দেয় সে চরণ-চিহ্ন। দক্ষরাজ পেলেন আশার্বাদ স্বরূপ এ পবিত্র ক্ষেত্রের রাজ্যাধিকার। পরে রাজ্যবিস্তার করলেন কনখল পর্যন্ত। কিন্তু শেষরক্ষা হলনা। নিজের কন্যা ও জামাতা বাবাজীর সঙ্গে যে কাণ্ডটা অযথা করে বসলেন রাগের মাথায়, তার ফলও পেলেন হাতে হাতে। নিজের মুণ্ড ও দণ্ড দুই গেল জামাতার চেলাচামুণ্ডার হাতে। শিবঠাকুরের রাগ আর প্রশমন হয়না, বিষ্ণুচক্রে বাহান্ন খণ্ডে খণ্ডিত হল সতীর মৃতদেহ। সমস্ত দেব দানব, যক্ষ কিন্নর,

কুবের গন্ধর্ব স্বীকার করলেন দেবাদিদেব মহেশ্বরকে দক্ষেশ্বর বলে। স্বীকৃত হলেন আর্যমণ্ডলে প্রধান দেবতা বলে, আর পেলেন এ ভূমিখণ্ডের অখণ্ড অধিকার। সেই থেকেই নাম হরদোয়ার, এবং দেবী মহামায়ার নামে উৎসর্গিত হল নদীর অপরপারের ভূমিখণ্ড মায়াপুরী।

আসল কথা, এ অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভূষিতা ভুবন-মনোমোহিনী গঙ্গার পবিত্র জলধারায় বিধৌতা এ নগরীর প্রতি নজর ছিল তিন জনেরই—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের। কিন্তু আমার বিশ্বাস পুত্র দক্ষের কার্যকলাপে বিরূপ হয়েই মানে মানে সরে পড়েছিলেন বৃদ্ধ প্রজাপতি ব্রহ্মাদেব। আর তখন থেকেই চললো হর আর হরির আধাআধি বখরা। আজও বিষ্ণুভক্ত বলেন হরিদ্বার আর শৈবরা বলছেন হরদোয়ার। আর ভারত সরকার একই সঙ্গে দুই দেবতার মনস্তুষ্টি করেছেন হিন্দিতে হরিদ্বার আর ইংরেজিতে হরদ্বার লিখে। একেই বলে সেকুলার স্টেট্।

আর ঐ যে মনসাদেবীর পর্বত, ওখানে শক্তিমাতার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন শুম্ভ নিশুম্ভ। আজও চোখে পড়বে মনসাদেবী চণ্ডীমাতার প্রাচীন মন্দির। কতশত কাহিনী, কতশত না-বলা পুরাণের ইতিহাস লেখা আছে কঠিন পাথরের বুকে।

এ পবিত্র ভূমির আকর্ষণে যুগে যুগে কত সাধু, কত সন্ন্যাসী, কত ঋষি, কত যোগী এসেছেন অসীমকে জানবেন বলে, তাইনা আজও হরিদ্বারের প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র। প্রতিটি পথের ধূলা বলে দেবে মানুষ-চেনার গোপন কথাটি—হোক না কেন যতই নোংরা হরিদ্বারের অলি আর গলিগুলি। এ পুণ্যক্ষেত্র তাঁদের তপস্যা ধ্যানধারণায় মহাপবিত্র, অপূর্ব স্বর্গীয় সঙ্গীতের করুণারসে উদ্বেলিত, আনন্দ-রসধারায় সিক্ত।

এ মহাপবিত্র ক্ষেত্রে দ্বাপরযুগে এসেছিলেন ভরত। আজও হৃষীকেশে ভরতজির মন্দির সে পুণ্যগাথার সাক্ষী দেবে। এখানে

এসেছিলেন সব জ্বালা সব দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মাতা কুন্তী, কৌরব-জননী গান্ধারী ও মহাত্মা বিদুর। এ পথ দিয়েই স্বর্গারোহণে গিয়েছিলেন পাণ্ডবগণ। সে ইতিহাস আজও লেখা আছে পবিত্র পথের প্রতিটি ধূলিকণায়। ভীমগোড়ায় নাকি ভীম-বলীয়ান্ নিজের গদাটিকে রেখে গিয়েছিলেন স্বর্গারোহণের পথে। আজও তীর্থযাত্রীদল ভীমগোড়ার পুণ্যকুণ্ডে স্নান করে পুণ্যসঞ্চয় করেন আর মহাভারতের অমৃতসমান কথা শ্রবণ করেন পবিত্র মনে।

॥ ৫ ॥

সেদিনটার কথা আজও মনে পড়ে। আকাশে ছিল সেদিন কালো মেঘের ঘনঘটা, টিপ টিপ করে মাঝে মাঝে দুই এক পশলা বৃষ্টিও পড়ছে, বেশ কন্‌কনে শীত। দমকা হাওয়ায় শীতটা যেন বেশ জমে বসেছে। অন্ধকার আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে আর সঙ্গে মেঘের ঘন গর্জন। পথ ঘাট নির্জন, রিকসা টাঙার চলাচল নেই। একা পথ চলছিলাম। দূর থেকে ভেসে আসে শুধু গঙ্গার কলনাদ।

আমার বড় ভাল লাগে এই একা পথ চলা, এই মানুষের ভীড়ের মাঝখান থেকে মাঝে মাঝে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসা। মনসা পাহাড়ের চড়াই পথ দিয়ে চলেছি একা একা। পথ বেশ পিছল। সহর ওপাশে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্যমান। দেখা যায় কেবল অরণ্যরাজি। ভয়ও লাগছে ভালও লাগছে। মাঝে মাঝে শীতের হাওয়া কাঁপন লাগায় ভীরু মনে আর ভেজা শরীরে। বেশ অন্ধকার, বৃষ্টিও পড়ছে। বাধ্য হয়েই একটা বড় গাছের নীচে আশ্রয় নিতে হল। হঠাৎ কে যেন পাশ থেকে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন—অন্ধকার দুর্যোগের দিনে এপথে কেন এসেছো ?

চেয়ে দেখি অপূর্ব সুন্দরী এক প্রৌঢ়া সন্ন্যাসিনী ভৈরবী। দুধ আলতায় ছোপানো গায়ের উজ্জ্বল বর্ণ, কালো ধনুর ছিলার মত ভ্রু-যুগল, মিষ্টি ঘুম-জড়ানো কালো হরিণের মত টানা টানা আয়ত দুটি কালো চোখ, পাতলা গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট।

এত রূপ একজনাতে কখনো দেখিনি। কপালে লাল সিঁদুরের টকটকে সোনার টিপ যেন অস্তরাগে কুমকুম রঙে রঙিন সূর্য দিবাবসানে চলেছেন অস্তাচলে। পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে কালো চুলের গুচ্ছ! বৃষ্টিজলের অঝর বিন্দু ঝরে পড়ছে

চুল বেয়ে বেয়ে। কুন্তলগুচ্ছ এলোমেলো ছড়িয়ে আছে কাঁধে পিঠে কপালে—যেন বৈশাখীর কালোমেঘ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কটিবন্ধে মাটির কঙ্কন আর লৌহবলয়। হাতে ত্রিশূল ও কমণ্ডলু।

—কি দেখছো! সামনেই আমার কুঠিয়া—আসবে? আজকের বৃষ্টি খুব শিগি্গির থামবে বলে ত মনে হয়না।

জবাব দেবার সুযোগ না দিয়েই পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন।

খানিকটা পথ বেঁকে গিয়ে কিছুটা চড়াই পার হয়েই সামনে পেলাম সন্ন্যাসিনীর কুঠিয়া। অন্ধকার গুহা। আমাকে বাইরে রেখে তিনি ভেতরে চলে গেলেন, কাঠের গুঁড়িতে নতুন করে অগ্নিসংযোগ করে আমাকে ডাকলেন—এসো। ভয় কি!

ভয়! কথাটা শুনে একটু চমকে উঠলাম। চমকে উঠবার কারণ ছিল। যে সমাজের প্রতিটি পদক্ষেপ আমার পরিচিত, যে পরিবেশে সবকিছু জরীপ করা, সে সমাজ, সে পরিবেশ আমি স্বেচ্ছায় পিছনে ছেড়ে এসেছি। কী ছেড়ে এসেছি তা আমি জানি, কিন্তু কিসের প্রত্যাশায় সে সম্পর্কে আজও স্পষ্ট কোন ধারণা আমার নেই। পরিচিত পরিবেশে আমার জীবন-তৃষ্ণা কোনদিন তৃপ্ত হয়নি, সেই তৃষ্ণা নিবারণের যদি সত্যিই কোন উপকরণ থেকে থাকে তাহলে তা আজও আমার জানার বাইরে। সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক, ক্ষমতা যতই নগণ্য হোক, অজ্ঞাতকে জানবার একটা অনির্দেশ্য তাড়না আমার বর্তমান যাত্রার দ্বিতীয় কারণ। হাত বাড়ালেই যে এই সত্য অধিগত হবে না তা আমি জানি। কত অরণ্য, কত পাহাড়, কত নদী, কত চড়াই ভাঙতে হবে—সমস্ত পথটাই যে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমাকে চলতে হবে কঠিন পথ বেয়ে, প্রচণ্ড বর্ষণ, অসহ্য শীত, হিম ঝঞ্ঝা আর কঠিন বরফের স্তূপ ভেঙ্গে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের পথে—সেখানে পদে পদে মৃত্যুর বিভীষিকা। ভীতু হলে সমগ্র

প্রচেষ্টাটুকুই হবে ভীতিসঙ্কুল। সব জেনেও তবু ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু সন্ন্যাসিনীর কথা শুনে মুহূর্ত মধ্যে ভয় কেটে গেল।

ডাক শুনে গুহার ভেতর প্রবেশ করে দেখলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। তেলের প্রদীপ জ্বলছে। বাঘছাল পাতা, কয়েকখানা লাল শাড়ী দড়িতে ঝুলছে। কোণায় একটা কাঠের তোরঙ্গ, একটা জলের পাত্র। আর ধুনি জ্বলছে—তাই বুঝি এত ধোঁয়া। ছোট, অতি ছোট, পরিবেশে নিখুঁত সংসারী হাতের ছোঁয়ায় সাজানো সন্ন্যাসিনীর সংসার। এক পাশে সাজানো ঠাকুরের আসন, দু' একখানা কালীঘাটের পট, সামনে থালায় সাজানো টাটকা ফুল।

আমাকে আসন পেতে দিয়ে বললেন—আগে গরম গরম চা খেয়ে নাও, শীত এক্ষুনি চলে যাবে।

কোণায় ছোট্ট একটা উনান, রান্নার সাজ সরঞ্জাম—থালা, ঘটি, বাটি, হাতা, খুন্তি।

কতদিন হয়ে গেছে কিন্তু আজও মুখে যেন লেগে আছে সে অপূর্ব স্বাদ। অবাক হয়ে দেখছিলাম। বাইরে তখনও চলেছে বৃষ্টি। তোলা উনানের গনগনে আগুনের আভায় লালে লাল হয়েছে সন্ন্যাসিনীর মুখ। পেতলের কড়াইয়ে তরকারী চাপিয়েছেন। কাঁচামুগ ডাল রাঁধা হয়ে গেছে। আর বাকি শুধু আতপচালের ভাতটা। চমৎকার বাসমতী চালের গন্ধে আকুল হয়েছে গুহার পরিবেশ।

মনে পড়ে আমার পিসিমার কথা। তিনিও এমনি করে রাঁধতে বসতেন নানাবিধ উপকরণ সাজিয়ে। কাঠের বারকোশে সাজানো মশলাবাটা, খানিকটা নারকেল কুচি, গোল গোল করে ভাজার আলু কেটে রেখেছেন একপাশে, কিছু ছানা চাক চাক করে কাটা। পাথরের বাটিতে ডাল ভেজানো···। নিখুঁত হাতের স্পর্শ প্রতিটি উপকরণের অঙ্গে অঙ্গে।

মনে পড়ে ছুটির দিনগুলির কথা। কাশী যাবো পিসিমার কাছে—এমন আনন্দ কোথাও ছিল না সারা দুনিয়ায়। পিসিমা রাঁধতেন আর আমি চুপ করে বসে থাকতাম কাছে। যত কথাই বলতেন তার সারাংশটুকু ছিল আমার শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া সম্বন্ধে। কত যত্ন করেই না খাওয়াতেন পিসিমা! তখন কত বিরক্ত হতাম, পারছি না খেতে তবুও দুধটুকু এক চুমুকে খেতেই হবে, বাসি পুলিপিঠেটুকু আর বাসি করা চলবে না। আসল কথা পিসিমার আনন্দ খাইয়ে—কখনও ভাবতেন না আমার সাধ্য অসাধ্যের কথা। আজ পিসিমা নেই, সে শাসন নেই, নেই সে স্নেহে জড়ানো উপদেশ কিংবা দিবারাত্রি চোখে চোখে বন্দী হয়ে থাকার বিড়ম্বনা।

—কি ভাবছো?

—কই, না ত। আপনার ভয় করে না একলা এখানে থাকতে?

—করতো, এখন করে না। আজ বিশ বছর হল হরিদ্বারে এসেছি। যখন প্রথম এলাম তখন এসব অঞ্চল সম্পূর্ণ অরণ্যে ঢাকা ছিল। না ছিল লোকজন, না ছিল হাটবাজার, না ছিল টাঙা রিক্সার চেঁচামেচি—কিচ্ছু ছিল না। হরিদ্বার তখন তপোবন ছিল—আজকের মত বাজার ছিল না। ভীমগোড়ার ওদিকটায় কিছু লোকজন, অল্প কিছু দোকান পসার ছিল। এদিকে কেউ আসত না, আমাকেই যেতে হত মাঝে মাঝে চাল ডাল কিনতে কিংবা ভিক্ষার যোগাড় করতে। সে আজ কতকালের কথা। বর্ষার রাত্রে সাপে আর মানুষে একত্রে রাত্রিবাস করেছি, কিন্তু ভয় পাইনি। ভয় ছিল মানুষকে। বলতে বলতে কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েন, আবার পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বললেন—আমার কথা থাক্। আজ তোমার কথা শোনা যাক।

—আমাকে বাঙ্গালী বলে বুঝলেন কি করে?

—শুধু কী বাঙ্গালীই বুঝেছি—তুমি যে কাঠবাঙ্গাল তা কী বুঝিনি!

—আপনিও বাঙ্গাল—তাই না!

—আমার কথা বলতে নেই, মানা আছে।

কিন্তু একদিন এই সন্ন্যাসিনীর মত কঠিনা নারীও কেঁদে আমাকে বলেছিলেন—বলতে দে, বলতে দে আমাকে আমার বুকে জমিয়ে রাখা পঁচিশ বছরের সব কথা।

সত্যি ভালবেসেছিলাম সন্ন্যাসিনীকে। হরিদ্বারের এ অপরিচিতা ভৈরবী আমার বড় আপনার হয়ে গেলেন একদিনেই। যখনই সময় পেতাম ছুটে আসতাম ভৈরবীদির নির্জন কুঠিয়াতে। প্রথম দিনটির কথা আজও মনে আছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে—কিচ্ছু ভুলিনি। অন্ধকার আকাশ, বাইরে তখনও চলেছে বারিধারার নিরলস বরিষণ। সারাদিন পর সন্ধ্যার অন্ধকারে ধর্মশালায় ফিরে এলাম। কথা দিয়ে এলাম—আসবো, রোজ আসবো। যদ্দিন হরিদ্বারে আছি রোজ আসবো।

ধর্মশালায় ফিরে দেখি মহাহুলুস্থূল বেধে গেছে সেখানে। দোকান বন্ধ করে লালাজি বেরিয়েছেন আমাকে খুঁজতে, মোটা মানুষ শাস্ত্রীজি লণ্ঠন হাতে গেছেন নীলধারার অন্ধকারে আমাকে খুঁজতে, নরেনদা গেছেন অন্ধকার সহরের অলিগলিতে আমাকে খুঁজতে, তিলক তার রিক্সা নিয়ে সারা সহর টহল দিচ্ছে আমাকে খুঁজতে। আমার চিন্তায় সবাই অস্থির—ভাবতেও ভাল লাগছে। একটা বেকার বাউণ্ডুলে ভবঘুরের জন্য এতগুলো মানুষের এত ভাবনা, এত দরদ, এত ছোটাছুটি। কুলি রঘুটা—আমাকে দেখে তার সে কী কান্না! —বাবুজি, আপ কাঁহা থে সারাদিন। ধর্মশালার চৌদ্দ নম্বর কামরার বৃদ্ধ হরনাথবাবু, তেইশ নম্বরের কালিকিঙ্কর হাজরা, ছাব্বিশ নম্বরের হাবুলের মা, বুড়ি মোক্ষদা, বাঙ্গালদি, এমনকি দজ্জাল দাক্ষায়ণী ঠাকরুণ পর্যন্ত এসেছেন আমাকে দেখতে। এমনকি বৃদ্ধ কিষণ গুলাটি, পাণ্ডা ভোলানাথজী, কালীঘাটের সেই হাঁপানীবুড়ো মুখুজ্যে মশাই পর্যন্ত নীচ-তলা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে তিনতলায় এসেছেন আমাকে দেখতে।

নানা জনের নানা কথা, নানা অভিমত, নানা আলোচনার কোন

কথাই আমার কানে যায়নি সেদিন, শুধু আমার দুচোখ বেয়ে নেমে আসছিল আনন্দের বন্যা। এত আনন্দ, এত ভালবাসা, এত স্নেহ কোথায় রাখবো চেপে! আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সবাইকে ছেড়ে এলাম—ভেবেছিলাম বন্ধনমুক্ত হলাম। কিন্তু তখন কে জানতো যে মানুষের ঘর পাতা প্রতিটি মানুষেরই মনের দোরে। পথের মাঝেই আসন পাতা পথভোলা পথিকের—সেখানে আছে স্নেহ, মায়া, বন্ধন, ভালবাসা। ছাড়বো বললেই কি ছাড়া যায়! তাই বুঝি মানুষ চিরকাল মুক্তির আশায় মানুষের দরবারেই মাথা খুঁড়ে মরে।

॥ ৬ ॥

এসব কথাই আর একদিন শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে পশ্চিম দিগন্তে। দিনের আলো নিভে আসে, ছায়া নামে পশ্চিম আকাশে। দূরের পাহাড় আবছা হয়ে এল, পাখীরা চলেছে আপন আপন কুলায়ে। ঘরছাড়া মনও পাখা মেলে ছুটে চলে গৃহের পানে। পথে পথে বেজে চলেছে উদাসী যাযাবর সাপুড়ের তুবড়ীবাঁশীতে পাহাড়িয়া ধুন। নদী আপন বেগে চলেছে সাগরের কিনারায় নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দিতে। দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসে মন্দিরের সন্ধ্যারতির মঙ্গল ঘণ্টাধ্বনি। গঙ্গার পারে আরতি করছিলেন শাস্ত্রীজি, তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের শিব-স্তোত্র-গান। প্রাণে জাগে মৃদু ছন্দ, আনন্দের সুর-ঝংকার—

গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুং, তনুনিন্দিত-রাজিত-কোটিবিধুম্।
বিধি-বিষ্ণুশিরস্থিত-পাদযুগম, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

খোলা ছাতের উপর চাদর পেতে শুয়ে ছিলাম, দেখছিলাম নীল আকাশের কোলে একটা দুটা করে তারার দল প্রদীপ জ্বালায়। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। কে যেন আমার পায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখ মেলে চেয়ে দেখি মূর্তিমান তিলক বসে আছে পায়ের কাছে চাদর মুড়ি দিয়ে।

—কি রে হতভাগা, এত রাত্তিরে!

—বাবুজি আজ খানা পাকাবে না?

—আমি খানা বানাবো কি না বানাবো—তোর কি!

—বারে! উনান জ্বালিয়ে দিয়েছি, লালাজির দোকান থেকে চাল ডাল এনে রেখেছি। ওঠ বাবুজি।

তিলক হাসছে। বোকাটার হাসি দেখলে পিত্ত জ্বলে উঠত।
—হতচ্ছাড়া পাজি বাঁদর কোথাকার।

জবাব দিল—বহুৎ ঠিক হ্যায়।

সংসার ছেড়ে এসেও মানুষের নতুন করে সংসার পাতার কী লোভ—তাই ভাবি। ধর্মশালার ছোট্ট কামরাখানাতেই আবার সাজিয়ে বসেছি সংসার। এক আনা রোজ হিসাবে ভাড়া করেছি লালাজর দোকান থেকে উনান, দু আনা দিয়ে ভাড়া করেছি হাণ্ডি, হাতা, কড়াই। নিজেই রান্না করি, নিজেই তারিফ করি নিজের রান্নার। কবে যে এমন রাঁধতে শিখলাম নিজেই জানিনা। তবে হ্যাঁ, আমার রান্না খেয়ে তারিফ করত বটে তিলক, রঘু আর জমাদার মহেন্দর সিং।

যখন শান্ত হত সহরের গোলমাল, দোকানের বিকিকিনি, থেমে যেত ফেরীওয়ালার চীৎকার, চলাচল যেত কমে—আমি রোজ এসে বসতাম হরি-কি-পয়ের-এর ঘাটের কিনারায়।

পশ্চিম পারে কত দেবদেবীর মন্দির। কি সুন্দর শ্বেতপাথরে গড়া সোপানশ্রেণী নেমে এসেছে ব্রহ্মকুণ্ডের জলে। এপাশে ধনপতি বিড়লার অর্থে প্রস্তুত ঘণ্টাঘর, মালব্যজীর শ্বেতমর্মর ধ্যানী মূর্তি। সুন্দর পাথরে গড়া পুল সংযোগ স্থাপনা করেছে ব্রহ্মকুণ্ডের এপার আর ওপারে। চুপ করে বসে থাকতাম নদীর জলে পা ডুবিয়ে। একটু আগেই গঙ্গাজীর আরতি শেষ হয়েছে, থেমে গেছে শঙ্খ-ঘণ্টার সুমধুর মঙ্গল ধ্বনি। গঙ্গাজীর আরতি—সে যে কী সুন্দর ভাবগম্ভীর, বর্ণনা দিয়ে অন্যকে বোঝান অসম্ভব। অপূর্ব মন্ত্রগানে মুখরিত আকাশ বাতাস, শত শত ঘিয়ের দীপে সজ্জিত বিরাট বিরাট প্রদীপ হাতে পুরোহিত আরতি করেন সুরধুনী গঙ্গার। বেজে চলে অবিরাম শঙ্খ, ঘণ্টা, দামামা। হাজার হাজার

লক্ষ লক্ষ প্রদীপশিখার ছায়া দোলে গঙ্গার বুকে ব্রহ্মকুণ্ডের শীতল মধুর পবিত্র জলে।

ব্রহ্মকুণ্ড। এখানেই প্রজাপতি ব্রহ্মা গঙ্গার বুকে তাঁর কমণ্ডলু থেকে ঢেলে দিয়েছিলেন পবিত্র অমৃতধারা। সাগর মন্থনে উত্থিত অমৃত—অসুরের কবল থেকে ছিনিয়ে আনা সেই পবিত্র অমৃতধারা।

তাই আজও যোগস্নানে লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসে দূর-দূরান্ত থেকে পবিত্র ব্রহ্মকুণ্ডের অমৃতধারায় অবগাহন করে মনের ও দেহের যত দুঃখ, যত জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে। এখানেই পিতামহ ব্রহ্মাদেব আহ্বান করেছিলেন স্বর্গ-দুহিতাকে। আশীর্বাদ করেছিলেন—তোমার পবিত্র পরশে ধন্য হক গাঙ্গেয়ভূমি। সোনার ফসল ফলুক ভারতভূমিতে।

এখানেই রাজা ভর্তৃহরি কঠিন তপস্যা করেছিলেন। তাঁরই পুণ্যস্মৃতির পবিত্র উদ্দেশ্যে সহোদর মহারাজা বিক্রমাদিত্য হরি-কি-পয়ের-এর শিলাময় সোপানরাজি প্রস্তুত করেছিলেন। কত স্মৃতি-জড়ানো হরিদ্বারের আকাশ বাতাস পথ ঘাট দেবালয়। কিন্তু তারাও রেহাই পায়নি মানুষের হিংসোন্মত্ত লোলুপ লালসা থেকে। যুগে যুগে হরিদ্বার বারে বারে আক্রান্ত হয়েছে বিদেশী শত্রুর হাতে, লাঞ্ছিত হয়েছে বিগ্রহ, প্রাণ দিয়েছে অকাতরে আর্ত ভক্তের দল, মানুষের রক্তে লাল হয়েছে গঙ্গার পবিত্র জলধারা। সোনার ফসল আর হিন্দুর আবাস জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে বারবার বিদেশী দস্যুদল। ভক্ত তবু হার মানেনি—আবার স্থাপনা করেছে বিগ্রহ, প্রস্তুত করেছে দেবালয়। দেবতার পূজা বন্ধ হতে পারে না। সে ধ্বংসের চিহ্ন আজও চোখে পড়ে পাঞ্জাবকেশরী-নির্মিত কাংড়া মন্দিরের নবগ্রহ মূর্তিগুলির পানে চেয়ে দেখলে। ভৈরোঁ আখড়ার ভৈরবমূর্তিটি আজও সাক্ষী দেবে সে জঘন্য ইতিহাসের। আজও চোখে পড়বে ঠিক ব্রহ্মকুণ্ডের মাঝখানে নির্মিত সম্পূর্ণ

মুসলিম ঢংএ প্রস্তুত মানসিং কি ছেত্রী। মহারাজ মানসিং-এর মরদেহের ভস্মাবশেষ ব্রহ্মকুণ্ডের জলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে মুঘল সম্রাট মহামতি আকবর বাদশাহ রচনা করেছিলেন মানসিং কি ছেত্রী।

রাত হয়ে যেত, খেয়াল থাকত না, আপনমনে মশগুল হয়ে বসে থাকতাম। মনে হত কী ভাগ্যবান আমি, বসে আছি কত ঋষি, কত যোগী, কত দেবতার তপস্যায় ধন্য এ পবিত্রভূমি হরিদ্বারের গঙ্গার উপকূলে। কাছেই কুশাবর্ত ঘাট। এ ঘাটের বুকেও চিহ্নিত আছে পুরাণের কত কথা ও কাহিনী। মহামুনি দত্তাত্রেয় হাজার হাজার বছর ধরে কঠিন তপস্যা করেছেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে। এমনি সময় গঙ্গা এলেন স্বর্গ থেকে বিষ্ণুর আদেশে। গঙ্গার দুর্বার স্রোতধারা নেমে এল হরিদ্বারের সমতলভূমিতে, আবর্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেল যোগীরাজ দত্তাত্রেয়র রক্ষিত কুশপত্রগুচ্ছ। ধ্যান ভেঙ্গে গেল। মুনি অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন গঙ্গাকে। দেবতাগণ ছুটে এলেন দত্তাত্রেয়র কাছে। অনেক অনুরোধ, অনেক অনুনয়ের পর মুনির ক্রোধ প্রশমিত হল। দেবতারা কথা দিলেন—চিরকাল তাঁরা মুনিরাজের আশ্রমে বিরাজ করবেন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে। আবর্তে কুশ ভেসে গিয়েছিল, তাই এ ঘাটের নাম কুশাবর্ত।

॥ ৭ ॥

পথ চলি আর দেখি। দেখলাম কত মন্দির, কত মানুষ, কত আশ্রম, কত আখড়া। আজও মন ছুটে চলে শিবালিক পর্বতের পাদদেশে, দেবতার প্রিয় মনোরম হরিদ্বারের গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। কী আনন্দ ছিল এর পরিবেশে জানি না, কী মোহ ছিল এর বাতাসে তখনও ত এত বুঝিনি, কী বশীকরণ মন্ত্র লেখা ছিল নদীর জলধারায় —তখন ত খেয়াল করিনি। আজ মন কাঁদে, ইচ্ছা করে ছুটে যাই তোমার নিবিড় আলিঙ্গনে। কোন কাজ নেই, কোন চিন্তা নেই, কোন ভয় নেই, কোন ভাবনা নেই—সারা মন প্রাণ জুড়ে কেবল বাজে সেই ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতির সঙ্গীত। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেত, বাইরে ছুটে যেতাম আকাশের নীচে। মন বলতো—তুমি আছ আকাশ জুড়ে, তুমি আছ নদীর কলগানে, আছ রাতের অন্ধকারে, ছায়াসুনিবিড় অরণ্যের মাঝখানে, নক্ষত্রের গানে গানে।

ভোর হয়ে আসে, রাত্রির অমানিশা কেটে যায় প্রভাত পাখীর বন্দনায়। আকাশে জাগে নবীন সূর্য, বাতাসে জাগে প্রভাতী হিল্লোল—জাগে আলোর জয়গান। নীচতলার পণ্ডিত সূর্য-শংকরজী তানপুরাটায় সুর ধরেছেন ভৈরবীতে—

জাগো। জাগো নন্দকিশোর—
হো গ্যয়া সবেরা।

নরেনদা এলেন এক কাপ ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা হাতে। —আচ্ছা ভেবেছিস কি! সবাইকে ছেড়ে এসে বাবু আমার লায়েক হয়েছেন। ভাবছিস আমরা কিছু বুঝি না।

এতগুলি একত্রিত অভিযোগে কি. বলবো আর কি বোঝাবো বুঝতে না পেরে হাসিই এল আমার।

যেই না হেসেছি, ব্যস্ নরেনদা রেগে ফায়ার।

—আজই হরিদ্বার ছেড়ে চলে যাবো। থাক সব আপদের দল। ভেবেছিলাম ধর্ম্ম করেই চলে যাবো, কিন্তু ভগবান জোটানও যত সব আপদগুলোকে আমারই কপালে। সারারাত না ঘুমিয়ে ছাদে বসে বাবু আমার কবিত্ব করেন। নিমোনিয়া হয়ে মর, তবেই বাঁচি।

নরেনদা বাঁচবেন কিনা জানিনা তবে নরেনদার রাগের কারণ অনুধাবন করে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। নরেনদা একসঙ্গে এতগুলি অভিযোগ করেই হাওয়া হলেন। আমি একা বসে আছি ছাদে। কতক্ষণ পার হয়েছে জানিনা, হঠাৎ দেখি রঘুটা কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে এক ঠোঙা গরম পুরি আর জিলিপি।

—বাবু নে ভেজ দিয়া।

হাসিই এল নরেনদার কাণ্ডটা আর রঘুটার বিদঘুটে পোজটা দেখে। হাসি দেখে যেন রঘুর ধড়ে প্রাণ এলো। লাল দাঁতগুলো বের করে একগাল হেসে বললো—তবিয়ৎ ত ঠিক হ্যায়, না!

হরিদ্বার ছেড়ে যাবার দিন যতই এগিয়ে আসছে, মনটা যেন ততই নরম হয়ে পড়ছে। সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারি না—এরা আমার কেউ না। পথের মাঝখানে পরিচয়, আবার পথেই মুছে যাবে তা।

জীবনের এই দীর্ঘ যাত্রাপথে কত জনের সঙ্গে ত পরিচয় হল, কত প্রেম, কত স্নেহ, কত ভালবাসা, কত অন্তরঙ্গতা, কিন্তু সে সবের কতটুকু স্মৃতি, কতটুকু বেদনা আজ অবশিষ্ট আছে। পথের বাঁকে কাউকে ছেড়ে আসতে মুহ্যমান হয়েছি, পরবর্ত্তী বাঁকেই নতুন পরিচয়ের ব্যস্ততায় সে বেদনা ধুয়ে মুছে গেছে। এক হাটের বোঝা অন্য হাটে শূন্য করে দেওয়া—এই ত জীবনের অঙ্ক। কিন্তু তবু কাল ভুলে যাব জেনেও আজকের প্রিয়জনকে ছাড়তে মন চায় না। ন্যায়-শাস্ত্রের সকল যুক্তি সত্ত্বেও নয়, অতীত অভিজ্ঞতার চোখ রাঙানিতেও

নয়। নির্জনতার অভিলাষে হিমালয়ে পালিয়ে আসি, কিন্তু এখানেও একটি মানুষ দেখলে তখনই তার সঙ্গ লাভের আশায় উন্মুখ হয়ে উঠি। আবার সেই অনিবার্য বিচ্ছেদ, আবার সেই বিদায় বেদনা, আবার সেই বিস্মৃতি। প্রথম অঙ্ক থেকে পঞ্চম অঙ্ক একই নাটকের পুনরভিনয়। আজকের এই নরেনদা, তিলক, লালাজি, ভৈরবী—রাত্রি প্রভাত হবার আগেই সব পুরানো আলোকচিত্রের মত অস্পষ্ট হয়ে যাবে। পরপ্রভাতে নিঃশেষে তলিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে। তারপর এই নরেনদা, এই তিলক, এই লালাজি, এই ভৈরবী নতুন নামে নতুন সাজে নতুন কোন স্থানে আবার আলাপ জমাবে। জানি, সব জানি, তবু হারাবার ভয়ে ভীত না হয়ে প্যারিনে। বিদায় মুহূর্ত যতই আসন্ন হতে থাকে মন ততই যেন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তখন আরও জোরে আঁকড়ে ধরি আজকের এই মধুর ক্ষণটুকু।

আমি চলে যাবো তাই তিলকও ভাল করে কথা বলে না, কাছে আসে না। নরেনদাও বলেন—তোর মায়া নেই, মমতা নেই, যেখানে খুসী চলে যা। আমাকে আর জ্বালাসনে।

মনের কথা বোঝাবার চেষ্টা করি সবাইকে। কিন্তু কেউ বোঝে না। সারাদিন কাটে চিন্তায় আর অনুচিন্তায়, সন্ধ্যা হলেই মনে হত ভৈরবীদির কথা। ছুটে যেতাম ভৈরবীদির কাছে—যেন কতকালের জানা। যেন যুগ যুগ ধরে সন্ন্যাসিনীকে আমি চিনি, ভালবাসি। রক্তের বন্ধন যেন অনন্তকালের।

—বুঝলি, সব রকম পথে, সব মানুষের সঙ্গে মিশবি, দেখবি কত আনন্দ তাতে। আর আনন্দ হিমালয়ে। একা একা ঘুরেছি গভীর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে, তুষারগিরিশৃঙ্গ পার হয়ে গেছি। হেঁটেছি, শুধু হেঁটেছি। পাথরের আঘাতে পা কেটেছে তবু থামিনি, তুষারঝঞ্ঝায় পথ ভুলেছি তবু থামিনি। দেখেছি নতুন মানুষ, নতুন পৃথিবী। ভুলে গেছি পথের দুঃখ, ভুলে গেছি মনের যত কান্না, যত ব্যথা, যত বেদনা। মানুষের কাছে কত আঘাত পেয়েছি আবার

মানুষেরই কাছে হাত পেতেছি বারে বারে। মানুষের মাঝখানেই সেই পরমকে খুঁজে পেয়েছি। মানুষকে ভালবাসিস, তাকেই আরাধ্য করিস।

মনে পড়ে সন্ন্যাসিনীর উপদেশ, মনে পড়ে তাঁর অশ্রুসজল দুঃখের কাহিনী। জীবনে হয়ত আর কোনদিন তাঁকে দেখবো না।

তিনি বলতেন—সংহিতার মর্ম কি জানিস? মুক্তির পথ হল চিন্ময় সাধনা। উপনিষদের সার কথাও তাই, আবার বেদ-পন্থের বাণীও তাই। মহাবীর বুদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক মহাপুরুষগণও একথাই বলে গেছেন বার বার। মানুষকে জয় করাই হল প্রকৃত সাধনা, শাশ্বত সার্থকতা। সেখানেই চিন্ময় বিজয়। নীতিশতক গ্রন্থে মহারাজ ভর্তৃহরি—যিনি ছিলেন যোগী, মনীষী, রাজনীতিজ্ঞ, তিনিও বলেছেন—মুক্তির মন্ত্র পরার্থ সাধনে। বৈরাগ্যশতকের মূল কথাও তাই।

পথভোলা বাউল নিরঞ্জন তার গানের কলিতে আমাকে এ কথাই বলেছে। অশিক্ষিত বাউল তার জীবনদর্শন আমাকে শুনিয়েছিল অপূর্ব এক গানের ছন্দে—

পরমকে জানবি যদি আগে মানুষ ধর।
তুই ধরবি মানুষ, হবি মানুষ, ঘুচবে মনের অন্ধকার॥
এ দেহ দেখলি নারে জরীপ করে, দৈর্ঘ্যপ্রস্থ অর্থ করে,
আছে তার এক উল্টো তালা, চাবি বিনে না যায় খোলা—
জীবের মাত্র হরিবোলা তাতে কি কূল পাবি আর।
তোর পরমব্রহ্ম আছে ঢাকা—কোন সন্ধানে পাবি দেখা,
মিছে ভক্তিস্তুতি করা—সন্ধান বিনে পাওয়া ভার।
গোঁসাই চণ্ডী বলে ঘোল টানিলে মাখন কি উঠিবে আর॥

আমার মনের কথা বুঝতে পেরে ভৈরবীদি হাসতে হাসতে বলতেন—ভাবছিস অশিক্ষিতা সন্ন্যাসিনী এত কথা জানল কি করে।

বলতে বলতে ভৈরবীদি কেমন যেন উদাসীন হয়ে পড়তেন। বলতেন —আর পারছি নারে এ দেহটাকে বয়ে বেড়াতে। আর পারি নারে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় একটা একটা করে দিন গুনতে। ধ্যানে বসে একটি কামনাই শুধু দেবতাকে জানাই—এবার আমায় ছুটি দাও, মুক্তি দাও।

শুদ্ধ উচ্চারণ করে তিনি আবৃত্তি করতেন মহাকবি কালিদাসের অমরসৃষ্টি থেকে—যেখানে অমরছন্দে ধ্বনিত হয়েছে গভীর নির্বেদ ও অনাসক্তির সুর—

প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয্যতাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ॥

আমি অবাক্ হয়ে শুনতাম। কত বছর চলে গেছে—আজও যখন গভীর অন্ধকার রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায়, রাতের পাখী কাঁদে আপন সুরে, রাতজাগা শঙ্খচিলের কাতর কান্না শুনি ভেসে আসে দূর থেকে, আমার মনে পড়ে ভৈরবীদির কথা। কোথায় তুমি হারিয়ে গেছ জানি না। আর কি কোনদিন খুঁজে পাব না তোমাকে? একদিন না একদিন খুঁজে পাবই—আমার একান্ত বিশ্বাস। সেদিন আবার মিষ্টি হেসে কাছে ডেকে বলবে—জানিস, রবীন্দ্রনাথও ঠিক একথাই বলেছেন নির্লিপ্ত কণ্ঠে—

বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে,
শেষ প্রহরের ঘণ্টা, সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।

জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি,
সেই কটি বাতি দিয়ে রচিব আমার সন্ধ্যারতি।
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে, দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন-বীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে॥

সন্ন্যাসিনী বলতেন—দুঃখ করিস না ভাই, জীবনে আর কোনদিন যদি দেখা না-ও হয়—দুঃখ করিস না, দুঃখ কি! আনন্দ কর। এই যে দেখা, এই যে ক্ষণিকের পরিচয়, এই সত্য।

॥ ৮ ॥

আমিও আবার সেই কথাটিই বোঝাতে চেয়েছিলাম তিলককে সপ্তর্ষি আশ্রমে যাবার পথে।

সপ্তর্ষি আশ্রম হরিদ্বার থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। ভীমগোড়া, পাঞ্জাবী-সিন্ধ, ছেত্র, খড়খড়ি ছাড়িয়ে সপ্তসরোবরের পারে পরমহংস রামতীর্থ মহারাজের প্রতিষ্ঠিত এ সপ্তর্ষি আশ্রম। বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন, শাস্ত্রপাঠ, ধর্মালোচনার জন্য সুপ্রসিদ্ধ এ বিদ্যায়তন। সুন্দর মনোরম নির্জন আবহাওয়ায় জ্ঞানার্জনের জন্য সত্যি সুন্দর, আদর্শ এ-স্থানটি।

সন্ন্যাসী রামতীর্থের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কর্মযোগের কথা চিন্তা করলে শ্রদ্ধায় মন আপনি নত হয়ে আসে। মনে পড়ে সপ্তর্ষির কাহিনী। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ —সপ্ত ঋষির নামে উৎসর্গিত সাতটি মন্দির ও নিকটেই সপ্তর্ষি-পত্নীদের নামের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত সাতটি সুন্দর সুন্দর দেবালয়। কিন্তু সবার চেয়ে সুন্দর এর প্রাকৃতিক পরিবেশ।

ধীরে ধীরে মন্দির ছেড়ে সপ্তধারার পারে এসে বসলাম আমি আর তিলক। দুহাত ভরে গণ্ডূষ করে তুলে নিলাম সপ্তধারার পবিত্র বারি। সারা অঙ্গে ছড়িয়ে দিলাম মনের আনন্দে। মন তবুও ভরে না, বলে, দাও, দাও, আরও দাও—এ যে সপ্তঋষির তপোধন, স্বর্গের অমৃতধারা।

অবতরণ কালে এখানেই গঙ্গা বন্দিনী হলেন সপ্তঋষির কমণ্ডলুতে। বন্ধন দশা থেকে মুক্ত হলেন পতিতপাবনী সপ্তঋষির সপ্ত পর্ণকুটিরের পাশ দিয়ে সপ্ত ধারায় প্রবাহিতা হয়ে। মুক্তি

পেলেন বন্দিনী, ধন্য হলেন সপ্তঋষি পুণ্যসলিলার পুণ্যশীতল পরশে।

দিনশেষে দিনমণি চলেছেন অস্তাচলে। ছায়ায় অন্ধকার নেমে আসে ধীরে ধীরে পাহাড়ের কোলে অরণ্যের বুকে। নদীর বুকেও নেমেছে ছায়া, যারা ঘরে যাবার সবাই গেছে ঘরে। বলাকার সারি চলেছে আপন কুলায়ে, রাখাল ছেলে অনেক আগেই ফিরেছে গাঁয়ে, পারাপার বন্ধ হয়েছে বহুক্ষণ, ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাক উঠেছে বনে বনে।

দিন শেষে এল রাত্রি। আনমনে দেখছিলাম প্রকৃতির এ লীলা। যাওয়া আর আসা, আসা আর যাওয়া।

—জান বাবুজি। এ জঙ্গলে অনেক জানোয়ার আছে। অন্ধকারে তারা চুপি চুপি জল খেতে আসে নদীতে। আমি নিজে দেখেছি। তিলক আপন মনে বলে চলে তার আরণ্যক অভিজ্ঞতা। কবে সে কোন এক গভীর অরণ্যে নাকি পাগলা হাতির পাল্লায় পড়েছিল। একবার নাকি স্রেফ কিসমতের জোরেই জান নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছিল ইয়া বড়া এক শেরের মুখ থেকে।......বলেই চলেছে তিলক আপন পৌরুষ-কাহিনী।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডটার উপর বসে বসে দেখছিলাম চারিদিকে শুধু লতাগুল্মের শ্যামলিমার আভাস, সবুজের মেলা। শিলাখণ্ডের কালোছায়া নদীর বুকে রোমাঞ্চের জাল পেতেছে যেন। যখন আকাশে জাগে তারার দল তখন স্তূপটির চূড়ায় আর ঐ ঝুঁকে পড়া অশ্বত্থ গাছের ডালে ডালে হীরার মত ঠিকরে পড়ে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার প্লাবন আর তারই প্রতিবিম্ব বুকে নিয়ে বয়ে চলে নীলধারার নিস্তরঙ্গ শীতল জলরাশি। চারিদিক উদ্ভাসিত অবারিত কাকজ্যোৎস্নায়—সর্বত্র ছেয়ে আছে অখণ্ড শান্তি আর গভীর স্তব্ধতা। মাঝে মাঝে উড়ে যায় দু একটা রাতের পাখী। বুঝিবা ভোর হবার কথা ভেবেই ভুল করে ডেকে

ওঠে। পরমুহূর্তেই ভুল বুঝতে পেরে নীরব হয়ে যায়। আবার আকাশে বাতাসে সমগ্র পরিবেশে নেমে আসে গভীর স্তব্ধতা। সে ক্ষণিক বিস্মৃতি আমার সত্তাকে যেন ভুলিয়ে দিয়ে গেল, ভুলে গেলাম আমার অভ্যস্ত নাগরিক জীবনের সব বিশৃঙ্খল আচরণ-গুলিকে।

নীল আকাশ, নীল পাহাড় আর নীলধারা চারিদিক দিয়ে বলয়ের মত বেষ্টন করে আছে—যেন কালের প্রহরী অনন্ত প্রহরায় রত। আকাশে উঠেছে ক্ষীণ বাঁকা চাঁদ আর তাকে ঘিরেই ভেসে চলেছে সাদা মেঘের লঘু তরী। মধুর মুহূর্ত কেটে যায় এক অপূর্ব আবেশে, এক অব্যক্ত মাদকতায়। মৃদু হাওয়ায় দোলা লাগে অরণ্যের শাখায়, নদীর কালো জলে ও মানুষের মনে।

তিলকের কথাও নীরব হয়েছে প্রকৃতির এই অখণ্ড নীরব স্তব্ধতায়। ওর মন হয়তো আজ ছুটে চলেছে যেখানে ছিল ওর ছোট গ্রাম, ছোট পরিবেশ আর ছোট এতটুকু আশা আর কল্পনায় রঙ্গিন নীল উন্মুক্ত আকাশ আর অবাধ মুক্তি।

—বাবুজি! তোমার মা আছে?

—আছে। কেন রে?—চেয়ে দেখি জবাব শোনার আশায় তিলক আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। মুখে হাসি নেই, চোখে জল। মনটা হু হু করে ওঠে রিকসাওয়ালার চোখের জলে। সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো তিলক। সারাজীবনের রুদ্ধ জলস্রোত আজ বাঁধ ভেঙ্গেছে—কোন নিষেধ মানবে না। কোন বাধায় আজ ভ্রুক্ষেপ নেই তিলকের।

মনে পড়েছে তার ঘরের কথা, মনে পড়েছে তার আপন কথা। হতভাগ্য তিলক পৃথিবীতে চোখ মেলে কোনদিন দেখেনি মায়ের মুখ, শোনেনি তার পিতৃপরিচয়। মানুষ হয়েছিল এক অনাত্মীয়ার কাছে, হোসিয়ারপুর জিলার এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে। মৌসীর

ভালবাসা কোনদিন সে পায়নি, পেয়েছে শুধু অশিষ্ট ভাষণ আর রুক্ষ শাসন। অনাদরে আর অবহেলায় কেটেছে শৈশব, কেটেছে কৈশোর। যৌবনের দোরে পা বাড়িয়ে প্রথম যেদিন সে বুঝতে পারল তারও আছে পূর্ণ অধিকার মানুষ বলে দাবী করার এ পৃথিবীর কাছে, সেদিন কিন্তু সে তার জন্মের সহজ ইতিহাস খুঁজে পায়নি।

মৌসীর কাছে শুনতে পেল জন্মের কুৎসিত ইতিকথা। পতিতা সন্তান জন্ম দিয়েই নিষ্কৃতি পেয়েছে। কিন্তু শিশু নিষ্কৃতি পায়নি। পেয়েছে সারাজীবন পিতৃপরিচয়হীন, গোত্রহীন জারজ বলে পরিচয় দেবার একমাত্র পাথেয়। সারাজীবন এখন বয়ে বেড়াতে হবে পরের পাপের বোঝা। মানুষের পাশবিক উদগ্র কামনার জীবনের এক নির্লজ্জ উদাহরণ সে নিজে। সারাজীবনে কোথাও পেলনা এতটুকু ভালবাসা, এতটুকু স্নেহের পরশ। পেল শুধু ঘৃণা, অবহেলা আর বঞ্চনা। স্নেহের কাঙাল। কি অপরাধ করেছিল তিলক!

সেও মানুষ। তাই আজ প্রকৃতি এ নীরব নীল আকাশের নীচে অন্ধকার বনচ্ছায়ে তার বুভুক্ষিত আত্মা কাঁদে আকুল হয়ে। তারও মন চায় দিনের শেষে ছুটে যেতে মায়ের কাছে যেখানে কোন জ্বালা নেই, নেই কোন ভয়, নেই কোন ভাবনা।

তার পরের ইতিহাস খুব ছোট। মৌসীর অত্যাচারে তিলক একদিন রাত্রির অন্ধকারে পালিয়ে এসেছে সব ছেড়ে। পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছে দুর্গম দুস্তর পথ। কেউ চোখের জল ফেলেনি—কেউ বলেনি—তুমি যেওনা। হয়ত মৌসী পরম স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে—আঃ, পাপ বিদায় হল, হাড় জুড়োলো আমার।

নিজের কথা বলতে বলতে তিলকের সে কী কান্না। সারা পৃথিবীর কাছে তার সমস্ত অস্তিত্ব অবলুপ্ত, অস্বীকৃত, তাই তার চোখে পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ আলো সবকিছুই বেদনাদায়ক—এক ধূসর রুক্ষ মরুভূমি। সব হারিয়ে সে বসে আছে জীবন্ত মৃত্যুর

অন্ধকার কারাগারে। বধির, অন্ধ, বাক্‌রুদ্ধ, অচল জীবন তার। 'মানব হৃদয় নিয়ে এত অবহেলা—খেলা যদি, কেন হেন মর্মভেদী খেলা'!

তিলক কাঁদে। কাঁদুক, আরও ভাল করে কাঁদুক, বুকের যত বোঝা, বেদনা হাল্কা হয়ে যাক। নতুন আলোয় নিশ্চয় একদিন তিলকের মনের যত কিছু কালো ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেদিন সেও আবার বলবে—

"সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।"

দিন চলে যায়, আমাকেও চলতে হয় অনির্দিষ্টের পথে। জানিনা এ পথের শেষ কোথায়। পথ চলতে চলতে আজও মনে পড়ে আনন্দমুখর সে দিনগুলির কথা। কারও কথাই ভুলিনি—মনে পড়ে ভৈরবীদির কথা, তিলকের কথা, নরেনদার কথা—সবাইর কথাই মনে পড়ে।

মনে পড়ে বাউল নিরঞ্জনকে, যাযাবরী সরবতিয়া, কুলি রামলাল, পাণ্ডা দুর্গাজি। আজও মনে পড়ে মিসেস মীনাক্ষী মুখার্জির কথা।

মিসেস মুখার্জি বলতেন—রাখবে? আমার একটা কথা রাখবে বল। আমার জীবনটাকে নিয়ে তুমি একটা উপন্যাস লিখো। সবাই হাসবে, কিন্তু তুমি হেস না যেন।

কে হেসেছে আর কে হাসবে জানিনা, কিন্তু আমার মনের কথা কাকে বোঝাবো। সে চলে গেছে দূরে, ঐ নীল নীলিমার শেষে তারার দেশে, কিন্তু আমার চলার ত আজও শেষ হল না।

মীনাক্ষী বলত—আর পারি না, পাপের জ্বালায় সারাটা বুক আমার জ্বলে গেল। পাপ, পাপ আর পাপেই ডুবে রইলাম সারাটা জীবন। কি পেলাম তার বদলে!

ধর্মশালার খোলা ছাদে শুয়ে শুয়ে মীনাক্ষীর কথাই ভাবছিলাম

—ভাবছিলাম কলকাতার লিটল রাসেল স্ট্রীটের বিখ্যাত সুন্দরী মিসেস মীনাক্ষী মুখার্জির কথা। ভাবনার বুঝি কোন শেষ নেই।

—কি ভাবছেন দাদা?

চেয়ে দেখি কালীকিংকর বাবু। বিড়ি ফুঁকছেন আর তীক্ষ্ণ চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন আমায় আর আমার নতুন পাতানো সংসারটিকে।—বলি আপনার দাদাটি গেলেন কোথায়? প্রশ্ন করলেন কালীকিংকর বাবু। দাদা, মানে নরেনদার কথা বললেন।

—আপনার দাদা হবার মত সৌভাগ্য কি আর সহজে মেলে? —বলেই মিটিমিটি মুচকি হাসছেন। কালীবাবুর এই বাঁকা কথা, বাঁকা বাঁকা টিপ্পুনী আমার মোটেই পছন্দ হত না; সযত্নে তাই এড়িয়ে যেতাম কালীঘাটের কালীকিংকর বাবুর সাহচর্য। পরনিন্দা আর পরালোচনা পেলে বিড়িতে সুখটানটা দিতেও ভুলে যেতেন কালীবাবু। বৃদ্ধবয়সে কী গভীর ধৈর্যসহকারে যে পরনিন্দা করতেন তা যে শুনেছে সে আর ভুলবে না কোনকালে।

—নরেন বাবু আপনাকে বশ করেছে মশাই, বশ করেছে। যদি একবার শুনতেন নবদ্বীপের কৃষ্ণদাসীর কাণ্ডটা, তবে আর নরেনদা নরেনদা করে দিনে দশবার ভিরমি খেতেন না।

আমি যত বাধা দিই ততই যেন তাঁর উৎসাহ বাড়ে।—বুড়ো বয়সে নবদ্বীপে আপনার দাদাটি কী কাণ্ডটাই না করে এলেন! বউ ত আর কারো মরে না! একা আপনার নরেনদাই যেন প্রথম বিপত্নীক হলেন সংসারে। মেজ ছেলেটাকে ত ঘাড়ে ধরে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছে মশাই। জানেন সে সব কথা? এখানে এসে সাধু হয়েছেন, বড় বড় শাস্ত্রকথা আওড়াচ্ছেন, ধর্মকথা শোনাচ্ছেন। আমরা ত কচি খোকা সব!

কিন্তু একের কাহিনী অপরের কাছ থেকে শোনবার তেমন আগ্রহ আমার ছিল না। উভয়েরই কিছু কিছু আমার জানা আছে। নরেন বাবুর কথা যদি কিছু জানতেই হয় তবে তা নরেনদার কাছ থেকেই শোনা ভাল। সংক্ষেপে তাই বললাম—আপনি এখন আসুন কালীকিংকর বাবু। আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

ঠিক এমনি সময় হাঁপাতে হাঁপাতে নরেনদা এলেন। হাতে এক ঠোঙা মিষ্টি। নরেনদাকে দেখেই কালীবাবুর চেহারাটা যেন বদলে গেল। একমুখ হেসে বললেন—আরে নরেন বাবু যে! এতক্ষণ ছিলেন কোথায়? আপনার জন্য সারা হরিদ্বারটা চষে ফেলেছি মশাই। আচ্ছা মানুষ যাহোক।

মধুর হেসে নরেনদা প্রশ্ন করলেন—কী ব্যাপার?

—সাধুসঙ্গে স্বর্গবাস—এসব হল শাস্ত্রের কথা দাদা। তাই না আপনার সঙ্গ লাভের আশায় এতবার একতলা আর তেতলা করলাম। জিজ্ঞেস করুন না, আপনার ভাইটিকেই জিজ্ঞেস করুন।

আমি তৃতীয় পুরুষ অবাক হয়ে দেখছি কালী বাবুর বিচিত্র বহুরূপী মুখোশটা। নরেনদাও সোজা মানুষ, মিষ্টির ঠোঙাটা খুলে ধরলেন কালী বাবুর সামনে। তিনিও একাই একটার পর একটা করে সাবাড় করেছিলেন আধসেরী ঠোঙাটাকে।

তারপর সুরু করলেন খোসগল্প।

—বুঝলেন দাদা। হরিদ্বারে এলাম, কিন্তু মনের মত মানুষ পেলাম না। তাইত সৎসঙ্গের লোভে বার বার আপনার কাছে ছুটে আসি। সাধু কী আর গেরুয়া বসন পরলেই হওয়া যায়। চলুন দাদা, আজকে আপনাকে আর ছাড়ছি না। আমাদের বর্ধমান জেলার ইসলামপুরের নাম জানেন ত। সেখানকার নামজাদা কীর্তনিয়া কেষ্টচরণ দাস বাবাজি। নাম জানেন না? দাদা বলেন কি? নৌকাবিলাস পালা। আহা। চলুন, চলুন দাদা। সাধুসঙ্গ ছাড়া স্বর্গে গিয়েও আনন্দ নেই।

কালীকিংকর হাজরা এক মুখে বিড়ি ফুঁকছেন আর পঞ্চমুখে নরেনদার তোষামোদ করছেন। নরেনদা সোজা মানুষ, আত্মপ্রশংসায় মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন। আস্তে আস্তে অতি বিনয়সহকারে বললেন—আজ মাফ করুন কালী বাবু, শরীরটা তেমন ভাল নেই।

—তবে থাক। শরীরের ওপর ত আর জোর চলে না। বিশ্রাম করুন আজকে। আপনাকে হিংসে হয় দাদা।

বাকি কথাটুকু আমাকে দেখিয়ে বললেন—এমন লক্ষ্মণের মত অনুজ সত্যি ভাগ্যের কথা দাদা, ভাগ্যের কথা। আহা, দেখলেও পুণ্য অর্জন হয়। বলেই শূন্যে একটা প্রণাম ঠুকে দিলেন কালীকিংকর বাবু। অবশেষে সত্যি কালী বাবু মুচকি হেসে বিদায় নিলেন—আচ্ছা, আজ চলি দাদা !

—আহা ! আত্মভোলা সদাশিব ব্যক্তি। নরেনদা স্বগতোক্তি করলেন।

সত্যি আত্মভোলা মানুষ কালী বাবু, নইলে এত তাড়াতাড়ি আর এত সহজে অবলীলাক্রমে ভুলে গেলেন নিজেরই উক্তিগুলি। রাগে আমার সর্বশরীর থর থর করে কাঁপছিল। চুপ করে বসেছিলাম।

—কি হল মৌনীবাবা ? চুপচাপ কেন ? যা, কিছু খাবার নিয়ে আয়। শুধু শুধু চা গিলব কি করে !

—আচ্ছা—ত্রিসংসারে নিজের আত্মজীবনী শোনাবার কি আর কোন লোক পেলেন না !

—ওঃ এই কথা ! হাঁপ ছেড়ে বাচলেন নরেনদা। —কালী বাবু বুঝি আমার কথা তোকে কিছু বলেছেন। তাতে হোলটা কি ! কালী বাবুর দোষ কোথায় দেখলি, শুনি। উনি ত আর মিথ্যা বানিয়ে বলেন নি। সত্যি, অতি সত্যিকথা। রাগ করিস না ভাই, তোকেও বলবো। নিজের কথা নিজের মুখে যদি না বলতে পারি তবে কেন এলাম তীর্থে ! আত্মপ্রবঞ্চনাই যদি না গেল, তবে যে সবকিছুই

আমার মিথ্যা হবেরে। বলতে বলতে চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল নরেনদার।

—গরীব বাপ মায়ের ছেলে, অনেক দুঃখে, অনেক কষ্টে এনট্রান্সটা পাশ করেছিলাম। লয়েডস্‌ ব্যাঙ্কের বড়বাবু আমাদের তেলেনীপাড়ার সন্তোষ চাটুজ্যে যখন আমাকে প্রথম কাজে ঢুকিয়ে দিলেন তখন মাইনে কত পেতাম জানিস? মাত্র পনের টাকা। তারপর নিজের চেষ্টায় কঠিন পরিশ্রম করে আমিও একদিন সেই অফিসেরই বড়বাবু হয়েছিলাম। বড় কষ্ট করে একবেলা না খেয়ে আমরা স্বামীস্ত্রীতে ছেলে দুটোকে মানুষ করেছি। মনোরমা আজ নেই। থাকলে তিনি নিশ্চয় বলতেন—তুমি ভুল করনি।

মনোরমা আমার ঘর করেছিল মাত্র ত্রিশটি বছর, কিন্তু দশ বছরই কেটেছে রোগশয্যায়। দারুণ ক্যানসার রোগে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় একটা একটা করে দিন গুনেছে মনোরমা। আমার যথাসর্বস্ব দিয়েও চেয়েছিলাম মনোরমাকে। কত চিকিৎসা করলাম, কত ডাক্তার এলেন, কত ওষুধ ফুরালো, কিন্তু মনোরমাকে পারলাম না ধরে রাখতে।

মনোরমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন সমস্ত বিশ্বসংসার ছত্রখান হয়ে গেল। নিজের সঞ্চিত অর্থ, বালীগঞ্জের বাড়ীটি, সবকিছুই ছেলে দুটোকে ভাগ করে লিখে দিলাম। সামান্য কিছু সম্বল রেখে বেরিয়ে পড়লাম তীর্থে। কত দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালাম পাগলের মত, কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যও মনোরমাকে ভুলতে পারলাম না।

এমনি সময় বৃন্দাবনে দেখা পেলাম বৈষ্ণবী কৃষ্ণদাসীর। কালো, নিবিড় কালো দেহের বর্ণ, কিন্তু তার কালোহরিণ চোখ দুটো আজও ভুলতে পারিনি। ঠিক যেন আমার মনোরমার চোখ দুটো চুরি করে নিয়ে এসেছে কৃষ্ণদাসী। আবার যেন নতুন করে নতুন রূপে পেলাম মনোরমাকে। কৃষ্ণদাসীও সেবায় যত্নে আমার জীবন ভরিয়ে দিল নতুন আনন্দে। কৃষ্ণদাসীর নামে লিখে দিলাম

বাকি যা ছিল সঞ্চিত। অর্থের আর কি প্রয়োজন আমার! আমার আর আমি বলতে কতটুকু!

একসঙ্গেই বৃন্দাবনে ছিলাম প্রায় বছর তিনেক, তারপর আবার কলকাতায় এলাম ব্যাঙ্কে গচ্ছিত মনোরমার গহনাগুলোর একটা সুব্যবস্থা করবো বলে। এলাম কলকাতায়, সঙ্গে কৃষ্ণদাসী। কিন্তু কোথাও আশ্রয় পেলাম না। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কেউ ছিল না, নিজের ছেলে দুটো পর্যন্ত তাড়িয়ে দিল আমাকে। চরিত্রহীনের কোন মূল্য নেই সন্তানের কাছে। চলে এলাম। হাওড়ায় একটা ঘর ভাড়া করে রইলাম দুজনে। কিন্তু বেশীদিন সে সুখও সইলো না আমার কপালে। একদিন দুপুর রোদ্দুরে বাসায় এসে দেখি দরজা খোলা। কৃষ্ণদাসী চলে গেছে। যাবার সময় মনোরমার সমস্ত গহনাগুলি পর্যন্ত নিয়ে গেছে।

আবার একদিন সব ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। বছর খানেক পর ঘুরতে ঘুরতে নবদ্বীপ এসেছি। হঠাৎ একদিন দূর থেকে দেখলাম আমার হারানো কৃষ্ণদাসীকে অনুকূলদাস বাবাজির আখড়ায়। কণ্ঠিবদল হয়ে গেছে বাবাজির সঙ্গে কৃষ্ণদাসীর। নতুন সংসার পেতেছে নবদ্বীপে। রূপ যেন আরও উথলে উঠছে কালো অঙ্গে। কত সুখে আছে, কত আনন্দে আছে কৃষ্ণদাসী। চোখদুটো জুড়িয়ে গেল কৃষ্ণদাসীর নতুন সংসার দেখে। আহা! সুখে থাক। তাই কিছু না বলে, দেখা না করেই নবদ্বীপ ছেড়ে চলে এলাম।

কিন্তু কোনদিন যদি বৈষ্ণবী ঘুণাক্ষরে জানতে পারে যে আমি নবদ্বীপ গিয়েছিলাম অথচ বৈষ্ণবীকে দেখেও দেখা করে আসিনি তবে কিন্তু কৃষ্ণদাসীর মনে খুবই লাগবে। নিশ্চয় দুঃখ পাবে সে।

নরেনদার কথায় হাসি চেপে রাখে এমন মানুষ জন্মেছে কিনা জানি না। আমার হাসি দেখে নরেনদা ছল ছল চোখে বললেন —হাসছিস? তা হেসে নে, কিন্তু বিশ্বাস কর ভাই, আমার আজ

কোন খেদ, কোন দুঃখ নেই, কোন অভিমানও নেই কৃষ্ণদাসীর উপর। কৃষ্ণদাসীই আমাকে দেখিয়েছে নতুন আলো, সন্ধান দিয়েছে নতুন পথের। কৃষ্ণদাসী আমার গুরু, আমার ঠাকুর কানাই, আমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আজ আমি আমার মনোরমাকে ভুলতে পেরেছি, ভুলতে পেরেছি কৃষ্ণদাসীকে, আমার ছেলে দুটোকে। আজ আমার কোন দুঃখ নেই। বলেই চোখদুটোকে ভাল করে মুছে নিলেন, তারপর হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন—যা ভাই, দৌড়ে কিছু খাবার নিয়ে আয়, ক্ষিদেয় পেট জ্বলছেরে ভাই। যা বকালি মিছামিছি। যা শিগগির যা। হিং-এর কচুরী আর ছানার জিলিপিই বেস্ট্ হবে, কি বলিস। খানাটা গ্র্যাণ্ড জমবে—তাই না-রে।

নরেনদা সহজ হলেন কিন্তু আমি সহজ হতে পারলাম না। নরেনদা, তুমিই মানুষ, তুমিই পেয়েছ আসল রতনের সন্ধান। বললাম—নরেনদা, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর।

হঠাৎ যেন আঁতকে উঠলেন নরেনদা। তারপর আমার পিঠের উপর বিরাশি সিক্কা ওজনের একটা কিল চড়িয়ে বললেন—ইয়ারকি করার জায়গা পাওনা, ইডিয়ট কোথাকার।

তারপর গভীর আবেগে স্নেহের ঝুলি উজাড় করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। নরেনদা আজ সত্যি কাঁদছেন।

কতদিন চলে গেছে, আরও কতদিন চলে যাবে। তুমি বিশ্বাস কর নরেনদা, তোমাকে ভুলিনি, কোনদিন তোমাকে ভুলতে পারবো না।

কী চমৎকার গানের গলা ছিল নরেনদার—যেমন দরাজ তেমনি সুরেলা। আজও যেন কান পাতলেই শুনতে পাই নরেনদা আপন মনে গাইছেন—

জান নারে মন, পরম কারণ
শ্যামা কভু মেয়ে নয়।

সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে ধড়া কভু বাঁধে চূড়া
ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়,
কখন পার্বতী কখন শ্রীমতী
কখন রামের জানকী হয়।
যে রূপে যে-জন কর হে ভজন
সেই রূপ তার মানসে রয়।

* * * *

হরিদ্বার ছাড়বো সকাল আটটায় কিন্তু নরেনদা ভোর পাঁচটায় হাজির। কত জিনিস, কত টুকিটাকি, ওষুধপত্র, সবকিছু ঢুকিয়ে দিয়েছেন আমার ঝোলাটায়। অ্যাসপ্রো, ত্রিফলা, হজমিগুলি, ইসবগুল থেকে সুরু করে বিস্কুট, আচার, ঘি, কিছুই বাদ পড়েনি নরেনদার নজর থেকে। দুর্গম পথে চলেছি, চলেছি মহাপ্রস্থানের পথে, সঙ্গে নিয়ে চলেছি মানুষের ভালবাসা, আশীর্বাদ ও শুভকামনা। নরেনদার চিন্তার শেষ নেই, একাই সব গুছিয়ে দিয়েছেন জিনিসপত্র, মাঝে মাঝে চোখ বুজে ভেবে নিচ্ছেন কিছু বাদ পড়লো কিনা।

যাবার সময় হয়ে এল। নরেনদার পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে মনে মনে বললাম—আমায় আশীর্বাদ কর নরেনদা, যেন তোমার মত হতে পারি।

চোখ তুলে দেখি নরেনদা কাঁদছেন। মনে হল, খুব না তুমি সংসার ছেড়ে এসেছো বলেছিলে,—সবার কথা ভুলতে পেরেছ ?

যাবার সময় আমার হাতে মজবুত একটি বাঁশের লাঠি তুলে দিয়ে বললেন—দুর্গম পথের একমাত্র সহায়, একমাত্র বন্ধু। সারাক্ষণ তোর হাতে হাতে থাকবে আর মনে পড়বে তোর নরেনদাকে। লাঠিটা হাতে নিয়ে একবার দাঁড়া দেখি ত চোখের সামনে। একবার দেখতে দে।—বলেই ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগলেন।

জীবনের চলার পথে চলেছি অন্ধের মত। কিন্তু চোখের কোণে সারাক্ষণ দেখেছি তোমাদের প্রতিবিম্ব—কাউকেই ভুলিনি। ক্ষণিকের সে মন দেওয়া নেওয়া, ক্ষণিকের সে ভালবাসা, ক্ষণিকের সে বন্ধুত্ব—হোক সে ক্ষণিকের, কিন্তু, সে ক্ষণিক মুহূর্তটুকুই আমার জীবনের মানচিত্রে অম্লান হয়ে থাকুক। তোমরাই আমার নীল আকাশের তারা, আমার জ্যোৎস্নারাতের চাঁদ, বর্ষণমুখর শ্রাবণ রাতের বৃষ্টির রিমঝিম সুরের ঝংকার, মসীময় ঝড়ের আকাশে তোমরাই ক্ষণিকের বিদ্যুৎলেখা।

মনে পড়ে ভৈরবীদির কথা, ভৈরবীদি মাঝে মাঝে বলতেন—

'পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,
মহাকাশ হতে ওই বার বার
আমারে ডাকিছে সবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।'

—জানিস ভাই, আজ পঁচিশটি বছর দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছি রাত্রিদিন নিজের বিবেকের কাছে। না-বলা কথা তোকে বলে স্বস্তি পেলাম, কাউকে বলিনি কোনদিন। পুলিশের হাত থেকে বেঁচেছি, কিন্তু বাঁচতে পারিনি নিজের বিবেক-দংশন থেকে।

ভৈরবী বলেছিলেন—আর কোনদিন হয়ত দেখা হবে না তোর সঙ্গে। কিন্তু সেদিন সে-কথায় বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম অসম্ভব। তারপর কতবার হরিদ্বার এলাম, কিন্তু তাঁকে আর খুঁজে পেলাম না। তীর্থে তীর্থে, প্রতিটি ধর্মশালায়, চটিতে, ছত্রে, পথে পথে কত খুঁজেছি ভৈরবীদিকে।

সন্ন্যাসিনীর শূন্যগুহা লতা গুল্মে জঙ্গলে ঢেকে আছে, রাত্রিবাস করে শৃগাল আর নিশাচর বাদুড়ের দল।

সেই দিনটির কথা মনে পড়ছে। আগামীকাল ভোরেই হরিদ্বার ছেড়ে চলে যাব। বাইরের আকাশ মসীলিপ্ত, কালো কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। চলেছি ভৈরবীদির কাছে বিদায় নিতে।

অন্ধকার গুহা। সাড়া নেই, শব্দ নেই—যেন কোন জীবনের সংকেত নেই। ডাক দিলাম—দিদি। জবাব নেই। আবার ডাক দিলাম—দিদি, দিদি।

জড়িত কণ্ঠে জবাব এল—কে?

আলো জ্বালিয়ে ভিতরে গিয়ে দেখি অসংবৃতা অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন সন্ন্যাসিনী। বুকের আঁচল গেছে খুলে, চুলের বোঝা লুটিয়ে পড়েছে ধূলায়, উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। নেশায় মাতাল ভৈরবী আমাকে দেখেই হো হো করে হেসে উঠলেন। সে হাসি প্রতিধ্বনিত হ'ল গুহার অভ্যন্তরে। নেশার জড়তায় দেহ কাঁপছে, সমস্ত শরীরে নেমে এসেছে ক্লান্তির অবসাদ। আমাকে বললেন—কালই চলে যাবি? যা—যা, পালিয়ে যা, পালিয়ে যা।

পাগলের মত অসংলগ্ন কথা বলে যায় ভৈরবী। ভৈরবী কাঁদে, ভৈরবী হাসে, আর হাসেন বিধাতা অন্তর্যামী।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মতিস্থির করে যখন একটা কিছু না করলেই নয়, আমার সমস্ত শক্তি যেন তখন চুঁইয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। ভৈরবী আপন মনে বকতে থাকলেন।

গুহার অন্ধকারে প্রতিটি কথা অব্যক্ত রহস্যে গম্ গম্ করতে থাকলো। এ রহস্য ভেদ করবার সামর্থ্য আমার নেই, কৌতূহলও সামান্য। এর যে আদৌ একটা অস্তিত্ব আছে সেদিন সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণাই আমার ছিল না। অকস্মাৎ যেন মনে হল এক অতল গভীর গহ্বরের কানায় দাঁড়িয়ে

আছি। অর্থহীন অবোধ্য এক একটা শব্দ যেন যুগযুগান্তরের অজ্ঞান অন্ধকার অতিক্রম করে ভেসে আসছে। কোন শব্দেরই দ্ব্যর্থহীন কোন অর্থ নেই। কিন্তু অগ্রাহ্য করবো তেমন সাধ্যও নেই। রহস্যের নেশায় দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরা, চেতনার প্রতিটি অণু পরমাণু সম্পূর্ণ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। অথর্বের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভৈরবী তখনও হাসছেন কাঁদছেন আর আপন মনে বকে চলেছেন।

সমাজের চোখে ভৈরবী আজ মৃতা, কিন্তু আমার চোখে তিনি বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

হাত কাঁপছে, পা পড়ছে না ঠিকভাবে, তবুও সন্ন্যাসিনী উঠে দাঁড়ালেন। এক টুকরা মিছরির দানা হাতে দিয়ে বললেন—আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি, তোর যাত্রা সফল হোক।

আমার সারাটা প্রাণে জেগে উঠলো হতাশার হাহাকার, দারুণ ব্যথায় বুকটা কেঁপে উঠলো। সে ব্যথার সান্ত্বনা নেই। বিদায়ের আগে আমার আরো অনেক কথা বলার ছিল, শোনারও ছিল।

কিন্তু আপন মনেই বকতে বকতে সন্ন্যাসিনী মাটির শীতল শয্যায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ নির্বাক নিষ্পলক দাঁড়িয়ে রইলাম। জীবনের এ উদ্ধত নগ্নতায় যেন আস্তে আস্তে আবার চেতনার সম্বিৎ ফিরে আসছিল। কী আর জানার ছিল, কী আর শুনতে বাকি রইলো!

অবশেষে পথে নেমে এলাম। আকাশ তখনও অন্ধকার, পাগলা হাওয়া উঠেছে, পথ ধূলায় অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি।

কত কাল হয়ে গেছে। আজও যেন কান পাতলেই স্পষ্ট শুনতে পাই ভৈরবীদি বলছেন—অন্তরের অবচেতন স্তরের যত মধুর কামনা, যত অলীক বাসনা আছে, সবগুলিকে জ্ঞানের সচেতন প্রাচীর দিয়ে বন্দী করে রাখিস। তবেই না তুই মানুষ।—পথ চলি আর ভাবি…

সঞ্চয়িতার পাতা পূর্ণ হল মানুষের ভালবাসায়, স্নেহে আর ব্যথার ইতিহাসে।

ভোর হয়ে আসছে, আসছে আমার যাত্রার শুভলগ্ন। আজই হরিদ্বার ছেড়ে চলে যাচ্ছি। অন্ধকার হাল্কা হয়ে আসছে। আকাশের তারাগুলি মিলিয়ে যায় যবনিকার অন্ধকারে। শুক-তারাটা তখনও জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে পূব আকাশে। কালোছায়ার অবগুণ্ঠন সরে যায়, দেখা যায় নতুন আলোর ঝরণাধারা। বলাকার শ্রেণী চলেছে সাদা রঙের পাল তুলে, মন্দিরে মন্দিরে সুরু হল প্রভাতী বন্দনার মঙ্গল শঙ্খধ্বনি। পণ্ডিত নারায়ণ দত্ত শাস্ত্রীজি গঙ্গার পারে দাঁড়িয়ে সূর্য-অর্ঘ্য দিচ্ছেন।

যাবার সময় হয়ে এল। সবাই এসেছেন আমায় বিদায় দিতে, কিন্তু তিলকের দেখা নাই। লালাজিকে জিজ্ঞাসা করলাম—তিলক এল না?

—ও অ্যায়সাই এক আজব আদমি। আমাকে বলেছে জোয়ালাপুরে নাকি ঘণ্টা হিসাবের এক শেঠ সওয়ারা মিলেছে।

হাসিই এল তিলকের শেঠ সওয়ারীর গল্পটা শুনে।

হাবুলের পিসিমা এসেছেন।—বাবা, আমার হাবুলের জন্য একটা সোয়া পাঁচ আনার পূজো দিও বাবা। আমার ভাগ্যিতে ত আর অদ্দুর যাওয়া হবে না। হাবুল বড় মাতৃভক্ত ছেলে আমার। আজ তিন বছর হল যাদবপুর হাসপাতালে পড়ে আছে। কচি বউটার মুখের দিকে চেয়ে দেখা যায় না বাবা। আশীর্বাদ কর যেন হাবুলকে রেখে যেতে পারি। দেড় বছরের মা-মরা শিশুকে নিজের হাতে মানুষ করেছিলাম, তাই এ শাস্তি আমার বাবা। মানতের পূজো দিতেই হরিদ্বারে এসেছি।

কী কাতর অনুরোধ অসহায়া জননীর! যাবার সময় ছোট একটা পুঁটলি দিয়ে বললেন—এতে আমার হাতে-কোটা খানিকটা

আলাধানের চিঁড়ে আছে। আসার সময় হাবুলের বৌটা জোর করে দিয়েছিল পথে খেতে। তুমি খেও—হাবুলের মঙ্গল হবে। জবাব একটা কিছু নিশ্চয় দিয়েছিলাম, কিন্তু কি বলেছি তা আজ শত চেষ্টায়ও মনে করতে পারছি না।

ঋষিকেশে যাবার বাসে চড়ে বসেছি, এক্ষুনি ছাড়বে। হঠাৎ দেখি তিলক ছুটতে ছুটতে আসছে, হাতে একটা নতুন লণ্ঠন। হাঁপাতে হাঁপাতে এসেই কাঁদতে লাগল অবুঝ ছোট ছেলেটির মত। —বাবুজি মুঝে ভুল যাওগে? কী সহজ আর কী অবুঝ প্রশ্ন।

—রাতের অন্ধকারে তোমার খুব তখলিফ হবে বাবুজি, তাই আমার লল্‌টন্‌টা তোমার জন্য এনেছি। মিট্টি কা তেলের অভাবে লল্‌টন্‌টা জ্বালাতেই পারি না—তাই কতকাল যাবৎ ঘরেই পড়ে আছে।

আমি জানি সম্পূর্ণ বানানো গল্প এটা তিলকের। আমার জন্য আজকেই ও কিনে এনেছে এ লণ্ঠনটা, কারণ তাড়াতাড়িতে নতুন দামের লেবেলটা যে ছিঁড়ে ফেলতে হয় বোকা তিলকটা জানেই না। তবুও সে মিথ্যা ছলনাটুকুই চিরকাল আমার মনের আকাশে সত্যের আলোকে ধ্রুবতারার মত জ্বলবে।

বিদায় হরিদ্বার! বিদায়!

॥ ৯ ॥

বাস চলেছে উঁচুনীচু পথ বেয়ে—বনভূমির মাঝখান দিয়ে, নদী নালা পেরিয়ে, রেল লাইন ডিঙ্গিয়ে। পথে যেতে পড়লো ছোট লোকালয়, গাঁয়ের নাম মতিচুড়। সত্যনারায়ণজীর মন্দির। একটু বিশ্রাম নিয়ে বাস আবার ছুটল হৃষীকেশের উদ্দেশ্যে। পথের ধারে ধারে প্রকৃতির শ্যামল মেখলায় ঢাকা উদার অনন্ত রূপের পসরা।

আজকে লিখতে বসে বার বারই কলম থেমে আসে, পারছি না ত মনের সে আবেগ, প্রকৃতির সেই নৈসর্গিক শোভা আমার কলমের লিপিচাতুর্যে ফুটিয়ে তুলতে। সে দিনগুলি ছিল আমার আলোয় রঙ্গিন জীবনের ছোঁয়ায় জীবন্ত, আকাশের মত নির্মল, ঝর্ণার মত গতিময়, প্রকৃতির মত শান্ত।

বাসেতে আলাপ হল কুচবিহারের উপেনবাবুর সঙ্গে। চলেছেন, লছমনঝুলা স্বর্গাশ্রম হৃষীকেশ দেখে আজই আবার হরিদ্বার ফিরবেন। দুপাশে তাঁর দুজন—সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী। পরম শান্তিতে আর নিশ্চিন্তে বিড়ি টেনে চলেছেন উপেনবাবু। কখনও দোক্তা দিয়ে পান সেজে হাতে তুলে দিচ্ছেন সুয়োরাণী, কখনও বা কমলার কোয়া ছাড়িয়ে মুখে তুলে দিচ্ছেন দুয়োরাণী। দুই স্ত্রী নিয়ে সুখে নির্বিবাদে ঘর করছেন উপেনবাবু।

আমার বিশ্বাস ছিল, দেশ ভাগ করা চলে, জমি, টাকা, চাল ডাল, গয়না কিংবা ঘটি বাটি সবকিছু ভাগ করা চলে, কিন্তু মন ভাগ করা চলে না। কিন্তু উপেনবাবুকে দেখে বুঝেছি মনও ভাগ করা চলে। হৃদয়ের একাংশ প্রথমাকে আর অপরাংশ দ্বিতীয়াকে দিয়েও দুজনারই বিশ্বাসভাজন হয়ে আছেন মার্টিন কোম্পানীর প্রাক্তন গোডাউন কিপার শ্রীউপেন্দ্র মোহন দত্ত। সন্তান লাভের আশায়

বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ করতে হয়েছে দত্ত মশাইকে—সেও নাকি প্রথমারই প্ররোচনায়।

বৃদ্ধের তরুণীভার্যাকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছিলাম। অবগুন্ঠিতা দ্বিতীয়া একহাত আবক্ষ ঘোমটা টেনে বসে আছেন। কখন বা হাওয়ায় ঘোমটা সরে যায় আর সেই ফাঁকে চোখে পড়ে। কচি মেয়ের সরল সুন্দর প্রশান্ত মুখখানা মিটি মিটি হাসছে। প্রথমার কঠিন নজর এড়িয়ে দ্বিতীয়াকে বেশীক্ষণ দেখবার সৌভাগ্য আমার হল না, উপেনবাবুরও হয় কি না জানি না। কঠিনার নজর সর্বত্র। মণ তিনেক ওজনের বিরাট কালো দেহখানাকে নেড়ে চেড়ে সর্বদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা সত্যি কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর পক্ষে।

উপেনবাবু দুঃখ করছিলেন—তিন বছর বিয়ে করেছেন আজও সন্তানের মুখ দেখলেন না। কাশীতে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর মন্দিরে সন্তান লাভের আশায় পূজা দিতে। মাদুলি নিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি দত্ত পরিবার, তাই হরিদ্বার এসেছিলেন বিল্বকেশ্বরের মন্দিরে—একই মানত নিয়ে।

—কি বলেন দাদা, এবার নিশ্চয়ই হবে ? তাই না ?

—নিশ্চয়, নিশ্চয় !—বলেই চেয়ে দেখলাম দ্বিতীয়ার মুখখানায় খেলে গেল আনন্দের ঝিলিক। স্থূলাঙ্গিনী প্রথমারও কী আনন্দ ! আমায় বললেন—আপনি আশীর্বাদ করুন।—বলেই এক বিরাট ঠেলা দিয়ে স্থানচ্যুত করে দিলেন উপেনবাবুকে। বললেন—তুমি কি গা মানুষ ! ওঁকে খাবার কথা বলনা গো।

আপনাকে খান কতক লুচি আর হালুয়া দি। মড়ার বাসের যা ঝাঁকি, ক্ষিদে না পেয়ে পারে !

আমার মতামতের অপেক্ষা না করেই টিফিন ক্যারীয়ার খুলে বসলেন দত্ত মশাইর অর্ধাঙ্গিনী। বাধা দিতে গিয়ে হঠাৎ দেখি দ্বিতীয়া আমার দিকে গার্জিয়ানের ভঙ্গীতে বলেন—ওসব চলবে না, খেতেই হবে।

হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলেন এক নম্বর। বললেন—কথা না বলে জলটা গড়িয়ে দে দিকিনি।

হাসিমুখে জল গড়াতে লেগে গেলেন দত্ত মশাইর তরুণীভার্যা, আর উপেনবাবু নির্বাক্। আপন মনে নিমীলিত চক্ষে বিড়ি টেনে চলেছেন।—গলা আর দেহটাই শুধু বাজখাঁই মশাই, ভেতরটা কাদা, নরম কাদা। উপেনবাবু প্রথমার হয়ে খানিকটা ওকালতি করেই আবার নির্বিকার ভঙ্গিতে গ্যাঁট হয়ে বসলেন। আর আধপোড়া নিভে যাওয়া বিড়ির টুকরোটাকে গোটা দুই তিন নিষ্ফল টান মেরে বিরক্তিভরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন জানালা দিয়ে।—দুত্তোরি ছাই!

বাস চলেছে। নানাজনের নানা কোলাহলে মুখরিত। সবাই তীর্থযাত্রী। রাজপুতানীদের একটা বিরাট দল চলেছে নানা রঙের ঘাগরা আর উড়ানি উড়িয়ে। মাত্র একজন পুরুষকে অবলম্বন করে তাঁরা বেরিয়েছেন ভারত-দর্শনে। পণ্ডিত আনোখিলাল নির্বিকার ভাল মানুষ। তিনমাস হল রাজপুতানা ছেড়ে তীর্থে বেরিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের মীনাক্ষীদেবীর মন্দির, মাদুরা, রামেশ্বরম, সেতুবন্ধ হয়ে কামরূপ কামাখ্যা, কালীঘাটের কালীমাতা, কাশীর বিশ্বনাথ, গয়ায় পিণ্ডদান করে আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন হয়ে এখন চলেছেন কেদার বদরী ও গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী।

বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, কিশোরীর প্রায় ত্রিশজনের বিরাট দলকে একাই সামলে নিয়ে চলেছেন অধিনায়ক পণ্ডিত আনোখিলালজী। হাতে যার যার ঝোলা—ব্যবহারের টুকিটাকি সামগ্রীতে পূর্ণ। আমার পাশটিতে বসেছিলেন পণ্ডিতজী। গভীর সঞ্চারী দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন শ্যামল বনভূমি ছাড়িয়ে ঐ দূর পাহাড়ের কালো সীমানা পেরিয়ে ঐ নীল আকাশের পানে, যেখানে চলেছে ভেসে বনহংসীর দল পাখা মেলে হিমালয়ের কন্দরে নতুন সরোবরের

সন্ধানে। বাস চলেছে সভ্যসমাজের বিভিন্ন স্তরের বিচিত্র মানুষের মিছিল নিয়ে।

তরুণ সূর্য পাহাড়ের প্রাচীর ডিঙিয়ে সবে দেখা দিয়েছেন পূব আকাশে, কিন্তু তার প্রভায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দুন উপত্যকার বনভূমি। রঙিন আলোর নেশা ভেঙ্গেছে মাতাল পৃথিবীর। ঘুম ভেঙ্গেছে শ্যামল বনানীর। সমস্ত কিছু শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর, মৃদু মন্দবায়ে উষ্ণ অনির্দেশ্য অন্তরঙ্গতা।

—দাদা দিয়াশলাই আছে?

—আজ্ঞে না।

—সিগারেট হবে একটা?

—আজ্ঞে না।—এবার চোখ তুলে তাকালাম প্রশ্নকর্তার পানে। পাটকাঠির মত শরীরের গড়ন, বর্ণ কালো তামাটে, চোখ দুটো কোনপ্রকারে কালো কোটরে বসে কালাতিপাত করছে, ভাঙ্গা চোয়াল, টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত উঁচু নাকের ডগা। মাথায় উস্‌কোখুস্‌কো চুল। বসন ও ভূষণ অতি জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন। পানের পিচকিতে লাল পুরু ঠোঁট। যেমন চেহারায় তেমন আচরণে, ভদ্রলোক তাঁদেরই একজন, যাঁরা পরিচিত হবার অপেক্ষায় কালক্ষেপ করেন না।

নিজে থেকেই সুরু করলেন নিজের নাম, ধাম, বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের পরিচয় দিতে। নাম—রাইচরণ মহলানবিশ, ধাম বহরমপুর বাজারের বিশেষ এক তল্লাটে। লাল দাঁতগুলোকে পরিস্ফুট করে, আর কি বিচিত্র ভঙ্গীতে হাত নেড়ে, মুখ নেড়ে রাইচরণবাবু বললেন—প্রিন্‌সিপ্যাল্ ছাড়া মানুষকে পায়ে পায়ে ঠকতে হয়! এই দেখুন না আমাকে—কড়া প্রিন্‌সিপ্যালের লোক মশাই আমি। প্রত্যেকেরই উচিত প্রিন্‌সিপ্যাল নিয়ে চলা। তাই না?—ঠিক বলছি কি না বলুন?

জবাব না দিয়ে গত্যন্তর ছিল না, অনিচ্ছা সহকারে বললাম—নিশ্চয় নিশ্চয়। তা, চলেছেন কোথায় ?

—কোথায় যে যাবো ঠিক করিনি মশাই। দেখি, ইচ্ছা তো আছে হৃষীকেশে একটা চায়ের দোকান খুলবার। দেখলাম ত ঘুরে ঘুরে, মেড়ো ভূতগুলো কি খেতে জানে মশাই ? জানে ত এক পুরি আর প্যাঁড়া, জিলিপি আর পাকৌড়া। মশাই, আজকে যদি একবার পেতাম আমাদের বহরমপুর বাজারের রাধারাণীকে, দেখিয়ে দিতাম এখানকার দোকানগুলোকে। শালা! ঋষিকেশ বাজার ক্যাপচার করে ফেলতুম না মশাই। মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করেছেন কি মরেছেন। দেখুন না রাধারাণীকে। কত করলুম, এক ছড়া চেইন-হার পর্যন্ত গড়িয়ে দিলুম তিন ভরি দিয়ে, বহরমপুর বাজারের ওপর বেগুনী-ফুলুরীর দোকান করিয়ে দিলুম, আর মাগী কিনা ভাগলো গিয়ে ঐ সুন্দরপানা পানওয়ালা ছোকরাটার সঙ্গে! আরে বলবেন না মশাই। ঐ জাতটার পরেই ঘেন্না ধরে গেছে।—বলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন রাইচরণবাবু।—তবে স্যার, স্বভাবটি বড় নরম ছিল রাধারাণীর! আর যা ছিল হাতের রান্না! বড় চমৎকার—এখনও যেন মুখে লেগে আছে!

পকেট থেকে এক প্যাকেট কাঁচিমার্কা সিগারেটের বাক্স বের করলেন, একটাতে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে পরম নিশ্চিন্তে নড়ে চড়ে বসলেন বহরমপুরের রাইচরণবাবু।

রাইচরণবাবুর আচারে, ব্যবহারে, বচনে, মনটা ঘৃণায় রি রি করে উঠেছিল সেদিন।—দেখুন দেখুন।—রাইচরণবাবুর ঝাঁকুনিতে চেয়ে দেখি কোণার সিটটায় একজোড়া যুবক যুবতী বসে আছেন। যুবতী উত্তর প্রদেশিনী ও যুবকটিকে হাব-ভাবে মনে হল পাঞ্জাবী। পরণে ঢোলা দামী রঙিন ট্রাউজারস, গায়ে ব্রুকলিন ব্রিজ কিংবা হাওড়া পুলের ছবিওয়ালা সিল্কের হাওয়াই সার্ট। চোখে কালো চশমা, পায়ে দামী জুতো, হাতে চকচকে ঘড়ি, কাঁধে ক্যামেরা,

মুখে সিগারেট। যেন বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে আরও দু-চার দশক এগিয়ে গেছে।

—বুঝলেন! মেয়েটাকে ভাগিয়ে নিয়ে চলেছে শালা।

অবোধকে আবারও একটু জ্ঞান দেবার প্রয়াস পেলেন শ্রীরাইচরণ মহালানবিশ।

—আমার চোখকে ফাঁকি দেবে এমন শালা এখনও জন্মায়নি স্যার। মানুষ চিনি না আমি? বিশটা বছর মেয়ে মানুষের দালালী করে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম বহরমপুর বাজারে, আর আমি মশাই মানুষ চিনি না?

রাইচরণবাবুর প্রকৃত পরিচয় পেতে সত্যি এত দেরী করেছি ভেবে দুঃখই হল মনে মনে। অবশ্য সামাজিক অনুশাসন অনুযায়ী আমার একটু বিরক্ত হবার বাধ্যবাধকতা ছিল, কিন্তু, সেদিন সকালে হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ যাবার সেই মধুর অধীরতায় ঘৃণায় বা বিরক্তিতে নিজেকে সঙ্কুচিত করবার অবকাশ ছিল না। রাইচরণবাবুর বিকৃত উদ্ভাবনী শক্তিতে সামান্য কৌতুক বোধ করলাম। বললাম—তা মুসৌরী নৈনিতাল ছেড়ে হৃষীকেশ চলেছে, সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী হবে না ত!

—রসিকতা করছেন দাদা। আমি আগেই বলে রাখছি স্যার, মেয়েটার ঐ মোটা মোটা গয়নাগুলো বাগিয়েই শালা চম্পট দেবে।

সেদিন সত্যি কুৎসিত লেগেছিল রাইচরণবাবুর ভবিষ্যৎবাণী। কিন্তু যেদিন সত্যি সত্যি দেখলাম নিরলঙ্কারা মেয়েটি ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, সেদিন মনে হল, রাইচরণবাবু, তুমিই সত্যি।

সেদিন রাইচরণবাবু এসেছিলেন আমার ধর্মশালায়।

—দেখলেন, আমার কথা বাসি হয়ে ফলল কিনা। গত রাত্রে সমস্ত সোনাদানা সমেত শালা সটকেছে। এ বিদেশ-বিভুঁয়ে মেয়েটা কী বিপদেই না পড়েছে। কথা জিজ্ঞাসা করলাম—কথার জবাবই

দেয়না। এখন সমস্ত দোষ যেন শালা রাইচরণের। না খেয়ে না দেয়ে মেয়েটা শুধু কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতেই মরবে ও, এও বলে রাখছি স্যার। হ'ল ত ভালবাসা। এবার যাও কোথায় যাবে। আত্মহত্যা করবে, কর। নইলে এসো রাইচরণের কাছে, বাজারে ঘরভাড়া করে পয়সা কামাবার ফিকির বলে দেবে। মেয়েটা সিওর মরবে, আমি আগেই বলে রাখলাম।

রাইচরণবাবু হুবহু রাইচরণবাবুর ভাষাতেই কথা বলছিলেন, কিন্তু যেন আর ঠিক সেই রাইচরণবাবু নয়। কিছুক্ষণ গজর গজর করে হঠাৎ কোটরের ভিতরের চোখ দুটোকে কাপড়ের খুঁটে মুছেই ধর্মশালার বাইরে মিলিয়ে গেল বিচিত্র মানুষটি।

পরদিন। বাস স্ট্যাণ্ডে লোকের ভীড়। হরিদ্বারের বাস ছাড়ছে। হঠাৎ দেখি সেই মেয়েটি একটি বাসের ভিতরে বসে। কাকে যেন খুঁজছে আঁতি পাঁতি করে। অনুসন্ধিৎসু মন আমার, তাই ত্রস্ত পদে কাছে গেলাম। হিন্দীতে যা বলল মেয়েটি তার সারাংশ হল—হরিদ্বার চলেছে, আবার আগামী কালই বাবা মার কাছে এলাহাবাদ চলে যাবে।

জীবনের এই সামান্য একটু ভুলের জন্য বড় বেশী মাসুল তাকে দিতে হল। অতি ধীরে ধীরে আমাকে সে প্রশ্ন করল—সেই রোগা বাঙ্গালীবাবুটি কোথায়?

—কে? রাইচরণ বাবু?

—হাঁ! জি হাঁ।—মেয়েটির মুখে আনন্দের ছায়া ভেসে উঠল।—জানো, দেশে যাবার জন্য সেই ত একশ টাকা দিয়েছে আমাকে। বার বার বলেছে কেউ যেন না জানে। কই এখনও ত এলোনা বাঙ্গালীবাবু? বলেছিল নিশ্চয় আসবে আমাকে বাসে তুলে দিতে।

আজও চোখে ভাসে ব্যথিতা মেয়েটির সে কাতর চাহনি আর রাইচরণবাবুর জন্য মিথ্যা পথ চাওয়া। আমি জানি সে আসবে না, হয়তো এতক্ষণে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছেন বহরমপুর বাজারের বিখ্যাত রাইচরণ মহলানবিশ।

মেয়েটি হাত তুলে নমস্কার জানাল আমাকে, আর নীরবে আমি জানালাম রাইচরণবাবুকে। তোমার যাত্রা সফল হোক্!

বাস ছেড়ে দিল।

॥ ১০ ॥

ভাবছিলাম নিজের কথা। কলকাতা ছাড়বার আগেই সযত্নে সংগ্রহ করেছিলাম একখানা ভাল নোটবুক ও একটি ঝরণা কলম। ভ্রমণকাহিনী লিখব, কত আশা করেছিলাম, কিন্তু এ কি লিখে চলেছি রাত্রিদিন? কোথায় ভ্রমণের নানাবিধ ভৌগোলিক তত্ত্ব! কোথায় ইতিহাসের সেই পুনরাবৃত্তি! কোথায় রেলপথে খুঁটিনাটি নিখুঁত টাইম টেবিলটি! তাই বুঝি এ পাণ্ডুলিপি পড়ে বন্ধু বেণু মজুমদার হেসে বলেছিল—ছাই হয়েছে, তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। একে ভ্রমণ-কাহিনী বলে না। লেখক স্বয়ং কি করলেন, কি বললেন, কি খেলেন, কি দেখে অভিভূত হলেন—কোথায় সে সব মনোমুগ্ধকর দীর্ঘ ফিরিস্তি? কোথায় সে পলকে ফোটা পলকে মিশে যাওয়া ভ্রমণের ছায়াছবি? তবেই না সাহিত্যসৃষ্টি! আর তুমি লিখেছ কতগুলো অখ্যাত বাউণ্ডুলে মানুষের জীবন পাঁচালী।

বন্ধুর কথায় সেদিন যে আনন্দ আমার হয়েছিল তা বোঝাবার মত কোন ভাষা নেই। মানুষ চেনার আশায় মানুষকে জানবো বলেই না আমার এ কঠিন পথ চলা। অখ্যাত মানুষের দুঃখের পাঁচালীই ত লিখতে চাই। নাইবা হল সাহিত্যের আসরে রচনার কুলীন বলে খ্যাতি, নাইবা হল এপিক সৃষ্টি। চিরদিন অন্ধকারেই থাকুক পড়ে আমার রচনা অনাদৃত অবহেলিত।

কল্পনাবিলাসী মন আমার, ভাবপ্রবণতায় যে কোন বাঙ্গালীকে পিছে ফেলে আসার স্পর্ধা রাখি। হিন্দুর ছেলে আমি। প্রকৃত হিন্দু যে হতে পারিনি সে বোধটুকু আমার আছে। জন্মেছি প্রাচ্যের গ্রামীণ আলো বাতাসে কিন্তু শিক্ষা পেয়েছি প্রতীচ্যের মিথ্যা অনুকরণে। এ দুয়ের মাঝখানে আমাদের চক্ষু উন্মোচন।

এ জারজত্বকে অস্বীকার করার অধিকার কারও নেই। প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সুরু থেকেই দেখেছি অ আ'র পাশেই এ বি সি ডি, সুপের সঙ্গে সুক্তো আর ধুতির পাশে ট্রাউজারস। হয়তো আমাদের কস্‌মপলিটান আউটলুক বিস্তৃত হয়ে থাকবে কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্যাদাও যে সে সঙ্গে অনেক ক্ষুন্ন হয়েছে—তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

অতি শৈশব কাল থেকেই অন্যান্য হিন্দুর মত মনের ক্যানভাসে আঁকা ছিল হৃষীকেশের সুন্দর স্বর্গীয় আভায় রঞ্জিত একটি মহান নিসর্গচিত্র। ঠাকুরমার মুখে শুনেছি ঋষিদের তপস্যায় পূত দেবতাদের আশীর্বাদে ধন্য হিমালয়ের পাদদেশে এ নিরালা জনপদের কত সুন্দর পৌরাণিক গল্প কাহিনী। মন প্রস্তুত ছিল না তাই হৃষীকেশ হঠাৎ দর্শনে মনটা দারুণ হতাশায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো।

হৃষীকেশ। হরিদ্বার থেকে চৌদ্দমাইল দূরে গঙ্গার তীরে অবস্থিত হিন্দুদের তীর্থভূমি। এই সেই হৃষীকেশ। পিচঢালা পথ গিয়েছে সহরের মাঝখান দিয়ে। এইত বাঁ পাশে মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন্‌স্, দোকান পসার, লোকজনের কোলাহলে সরগরম পথ ও পান্থশালা। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের দোকানগুলো কিংবা দিল্লীর চাঁদনিচকের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই এই জনপদের। প্রতি মুহূর্তে মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করবে হোটেলওয়ালা আর গাড়োয়ালী মুটের দল। কুলপি মালাই, মিঠাই, দরজীর দোকান, কাপড়ের বিরাট কাঁটরা, চা কফির দোকান, বিলিতি কায়দার সেলুন—কি নেই হৃষীকেশে! মায় বাটা কোম্পানীর জুতার দোকানটি পর্যন্ত। এমনকি চোখে পড়বে লাক্স সাবানে উজ্জ্বল চিত্রতারকাদের অম্লান নির্মল দেহলাবণ্য ও সুন্দর মুখচ্ছবি। ঐ ত কোকাকোলার মেমসাহেব সমুদ্রের পারে শুয়ে শীতল পানীয়ের পরম রমণীয় স্বাদ গ্রহণ করছেন। তার দেহাংশের প্রকাশ্য প্রচারে কোকাকোলার কতটা স্বাদ বৃদ্ধি পেয়েছে

জানিনা, তবে তৃষিতের তৃষ্ণা বেড়েছে। পাঞ্জাবী সিন্ধী দোকানীদের হাঁকডাক, নেপালী কুলিদের একঘেয়ে কাতর মিনতি, লরী বাসের অসহ্য কর্ণপটহবিদারক একঘেয়ে কর্কশ আওয়াজ আর টাঙাওয়ালার চীৎকার—সব মিলিয়ে যে রসের সৃষ্টি হয় তাকে বস্তুতান্ত্রিক কান্ত-তত্ত্বেও মধুর বলে স্বীকার করা চলে না। নোংরা পথঘাট, মাছি আর গবাদি পশুতে, টাঙা আর লরীতে ঠেলাঠেলি চলেছে। আমার কল্পনার হৃষীকেশের পথের ধূলায় পড়েছে টায়ারের দাগ, আকাশে উড়ছে তেলকোম্পানীর উড়ন্ত ঘোড়ার বিজয় কেতন। বাতাসে ভেসে আসে পেট্রোলের গন্ধ আর রেডিও সিলোন কা ব্যাপার বিভাগ কা কারিয়ক্রম—অ্যাসপ্রো কা ভরষা কিজিয়ে, অ্যাসপ্রো লিজিয়ে, দিন ভর তাজা আউর তন্দ্রুস্ত্ রহিয়ে!

মনটা খুবই দমে গেল প্রথমটায়। কিন্তু হঠাৎ যখন চোখ মেলে দেখলাম ভুবনটাকে, দেখলাম উত্তরগগনে তুমি দাঁড়িয়ে, গগনভেদী, আকাশচুম্বী, অসীম উদার ধ্যানগম্ভীর তুমি! শান্ত, সমাহিত অনুচ্ছল, আনন্দময়, নির্বাক্, অচঞ্চল—উচ্ছ্বাস নেই, প্রগল্ভতা নেই। তোমার এই বিরাট উদার ব্যাপ্তির কাছে দাঁড়িয়ে নিজেকে ক্ষুদ্র অতিক্ষুদ্র মনে হল। মনে হল, আমার এ ক্ষণিকের আশাভঙ্গের অবসাদ একটু আগেই অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরেছিল আমার অণুপরমাণুকে কিন্তু সূর্যকরোজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত তোমার ঐ গিরিশ্রেণী আমার দুর্বল মনের দিগন্ত উন্মোচিত করে দিল, যেন কোন এক যাদুকরের মায়াকাঠির কোমল পরশে!

গঙ্গার তীরে হৃষীকেশ অতিক্ষুদ্র জনপদ। এখানকার প্রতিটি গৃহই যেন ধর্মশালা, প্রতিটি মানুষ তীর্থযাত্রী। যাত্রীই হৃষীকেশের একমাত্র সম্বল। এখানকার যা কিছু ব্যবসা বাণিজ্য সব এই হিমালয়ের যাত্রীদের অবলম্বন করে। দারুণ শীতে যাত্রীর অভাবে বছরে ছ'মাসই প্রায় ব্যবসাপত্র অচল হয়ে থাকে। সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করে কখন আসবে সে পরম তীর্থযাত্রার শুভলগ্ন। হরিদ্বার

হতে আগত বাসগুলোই হৃষীকেশের প্রাণকেন্দ্র, সঞ্জীবনী সুধা—দুর্বল শরীরে ভিটামিন 'এলিক্সার'। মরসুমী ফুলের মত তখন আবার সজীব হয়ে ওঠে হৃষীকেশের বাজার, ত্রিবেণী ঘাট। আবার আলো জ্বেলে দোকানীরা নতুন নতুন পসরা সাজিয়ে বসে পথের পাশে টিনের দোকানঘরগুলিতে। আবার অনেকরাত্রি পর্যন্ত শোনা যায় দরজি-দোকানের সেলাই মেশিনের একঘেয়ে একটানা আওয়াজ।

যাত্রীদের মাল বইবার জন্য পাহাড় থেকে নেমে আসবে দলে দলে নেপালী কুলি, গাড়োয়ালী ছড়িদার কাণ্ডিবাহক, ঘোড়ার মালিক ও সহীসদল। নির্জন ধর্মশালার শূন্যঘরগুলি আবার পূর্ণ হবে যাত্রীর সমাগমে। তখন শুধু একটি কথাই শুনতে পাওয়া যাবে প্রতিটি ধর্মশালায়—স্থান নাই, স্থান নাই। যাত্রীর মরশুমে আবার প্রাণ সঞ্চারিত হবে ঘুমন্ত নগরীর বুকের পঞ্জরে। আফিম-খোরের নেশা ভাঙবে।

সমাগত সবাই হিমালয়ের যাত্রী। রাত্রি যাপন করেই সবাই আবার যাত্রা করবে নতুন পথে। তখন কিছুক্ষণের জন্য ধর্মশালা খাঁ খাঁ করে ওঠে, আবার পরমুহূর্তেই পরিপূর্ণ হয়ে যায় নতুন যাত্রীর আবির্ভাবে। এমনি করেই চলে এখানকার জীবনধারা—আসা আর চলে যাওয়া।

আমিও হৃষীকেশের এক স্বল্পকালীন অতিথি। আশ্রয় চাই, ক্ষুধার অন্ন চাই, রাতের শয্যা চাই, সবকিছু চাই আমার। আশ্রয় মিলল কালীকম্বলি বাবার ধর্মশালায়। নতুন করে আবার সংসার পাতলাম হিমালয়ের পাদদেশে এক পান্থশালার বাইশ নম্বর কামরায়। অন্ধকার বন্ধ কামরার দরজা খুলে দিলাম। এক ঝলক আলো হঠাৎ এসে ঘুচিয়ে দিল বন্ধ ঘরের অন্ধকার। সারাটা মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল হিমেল বায়ুর পরশে।

উত্তরের জানালাটা খুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম হিমালয়ের

গিরিশ্রেণীর দিকে। কালো কালো মেঘ জমেছে কালো কালো ছোট বড় শিখরের শীর্ষদেশে। মনটা আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠলো উচ্ছল ঝরণাধারার মত।

অজানা ভয়ে অজানা আশঙ্কায় আর অজানা পথের দুর্গমতার কথা ভেবে সহসা মন কেঁপে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তেই এক অজানা অনির্দেশ্য আনন্দের জোয়ারে ভয় ভাবনা সন্দেহ সংশয় নিমেষ মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল—সূর্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত।

কালীকম্বলি বাবার ধর্মশালা। কালীকম্বলি বাবার পঞ্চায়েতী ছেত্র, দাতব্য চিকিৎসালয়, ভোজনালয়—কালীকম্বলির নাম হৃষীকেশের সর্বত্র ছেয়ে আছে। হিমালয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বাবা কালীকম্বলির অমর কীর্তির পুণ্যপরশ। সুদূর হিমালয়ের গভীরতম অঞ্চলেও যাত্রীদের সুবিধার জন্য বাবা কালীকম্বলি নির্মাণ করে গেছেন অজস্র ধর্মশালা, সাধুদের জন্য সদাব্রত, অন্ধ-আতুরজনের জন্য আশ্রয়শালা। হিমালয়ের সমগ্র ব্যাপ্তিটুকু ব্যেপে, কেদারবদরীনাথ গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর পথে প্রতিটি প্রস্তরে উৎকীর্ণ আছে এই মহাপুরুষের পুণ্য কীর্তি। দীন দরিদ্র সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—শুধু একখানা কালো কম্বল ছিল শীতনিবারণের সহায়। দুর্গম পথযাত্রীদের জন্য ছিল তাঁর অসীম ঐকান্তিক সহানুভূতি ও মমত্ববোধ। দোরে দোরে ভিক্ষা করে প্রতিটি মানুষের দাক্ষিণ্যে তিনি গড়ে গিয়েছেন এই বিরাট জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। বাবা বিশুদ্ধানন্দজি মহারাজই উদ্বোধন করেছিলেন এ অনন্তযজ্ঞের। তিনি আজও বেঁচে আছেন হিমালয়ের প্রতিটি যাত্রীর ক্লান্তি অপনোদনে, ক্ষুধার অন্নে, নিশীথের আশ্রয়ে, পথের উৎসাহে—প্রত্যেক যাত্রীর প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি জয়ধ্বনিতে।

•

তিনদিন তিনরাত্রি হল হৃষীকেশে এসেছি। দু'দিন হল বন্ধু বেণু মজুমদার এখানে এসে হঠাৎ হাজির। সে-ও যাবে আমার সঙ্গে।

পথে পথে ঘুরে বেড়াই, ক্ষিদে পেলে পাঞ্জাবী হোটেলে নিরামিষ ভোজন সেরে আবার পথ চলি—খুঁজে বেড়াই নতুন মানুষ, নতুন চরিত্র। বন্ধু বেণু আমাকে অনেকবার বলেছে—যাবার আগেই যদি পুঁজি শেষ করে ফেলিস তবে এতটা বাকি পথ চলবি কি করে? আর কিই বা আছে অকারণে দুপুর বেলার রোদ্দুর মাথায় করে ধুলোবালি মেখে টো টো করে ঘুরে বেড়ানর মধ্যে?

সত্যি বেণু বোঝেনি সেই রহস্য। সত্যি ও জানে না যে আমার এ অভিজ্ঞতার ঝুলি কোনদিন ফুরিয়ে যাবে না, এ যে পূর্ণ-প্রাণের জোয়ারে একূল ওকূল দুকূল ভেসেছে মানুষের ভালবাসায়, অজ্ঞাত-কুলশীলের চোখের প্লাবনে আর কত অজানিতার ব্যথার ইতিহাসে।

হৃষীকেশের পথেই প্রথম দেখেছিলাম রামলালকে। ওর বোকা বোকা চেহারাটা আর সুন্দর তরুণ অজাতশ্মশ্রু মুখশ্রী প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বন থেকে কাঠ কেটে আনে আর তা বিক্রি করেই পেট চালায় রামলাল। ভীষণ গরীব তাই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরিশ্রম জলের দরে বিক্রি করে দিতে হয় দালালের কাছে। তবু রামলালের হাসিটুকু অম্লান। নিঃস্ব কিন্তু নির্লোভ, দরিদ্র কিন্তু চোর নয়। ধর্মভীরু রামলাল জানে সেবা কাকে বলে, বিশ্বাস কাকে বলে। জাতে—নেপালি, পেশা—কুলিগিরি। রামলাল—আমাদের কুলিই বলুন আর ছড়িদারই বলুন—সেই ছিল আমাদের দুজনার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু, দুর্গম পথের সহযাত্রী, আমাদের অভিভাবক, পথ-প্রদর্শক—আমাদের একান্ত আপনজন। ছিলাম দুই, হলাম তিন।

রামলালকে কোনদিন ভুলতে পারবো না। রামলাল হাসছে। ছোট্ট ছোট্ট পিটপিটে চোখদুটো একেবারে বুঁজে গেছে। দন্তপাটি বের করে, হাত নেড়ে মুখ নেড়ে সে কি হাসির চোট! কারণ? কিছু নেই। অনেক কষ্টে ত কারণ উদ্ধার করা গেল—সেই যে রামপুরের সাড়ে তিন মণের মোটা মাইজি কাণ্ডি ভেঙ্গে কুলির পিঠ থেকে একদম রাস্তায় চিৎপটাং। আহা! সত্যি কি হাসির সবজেক্ট!

ধমক দিলেও মানবে না—তবুও হাসবে। কি সরল আর কি সোজাই না হয় এই বোকা পাহাড়ীগুলো।

একটা বুড়ো নেপালিকে একদিন টানতে টানতে হৃষীকেশের ধর্মশালায় এনে হাজির। কী ব্যাপার? না—রামলালের গ্যারাণ্টার। রামলাল বলে—আমার বাবা। হৃষীকেশের সবাই আমার বাবাকে চেনে। তোমরা আমাকে তোমাদের কুলি করে নিয়ে চল, বাবাই আমার জামীনদার হবে।

—তোর জামীনদার ত বুঝলাম তোর বাবা, কিন্তু তোর বাবার জামীনদারটা কে হবেন শুনি?

জবাবে বাপবেটার সে কি প্রাণখোলা হাসি।

মোদ্দা কথা আমি সৎ লোক, আমিই তোমাদের কুলি হব। যাক, অধিক কাঠ খড় কেরোসিন না পুড়িয়েই সিলেক্‌সন বোর্ডের রায় বেরুল। রামলাল আমাদের কুলি নিযুক্ত হল,—রামলালই ছড়িদারের পদে নিয়োগপত্র পেল। আগে ভাগেই বলে রাখলাম—দেখ বাপু, যেতে চাও—আপত্তি নেই, কিন্তু দুবেলার রান্নাটাও তোমাকেই করতে হবে।

রামলালের কী খুসি সেদিন! নিজের পয়সা দিয়েই কালী-বাড়ীতে পূজো দিয়ে সিন্দুর মাখানো প্যাঁড়া নিয়ে এল হাসতে হাসতে।

দুদিন পর ওকে জিজ্ঞাসা করলাম—কই তোর বাবার টিকিও যে আর দেখিনা! কি হলো বুড়োর?

সহজভাবে রামলাল জবাব দিল—ও ত আমার আসল বাপ নয়।

—বলিস কি রে!

বাপও যে আসল আর নকল হতে পারে তা কুলি রামলালের কাছেই প্রথম শুনেছিলাম। আমরা চলেছি লাঠি হাতে, রামলালও চলেছে মণখানেক ওজনের মাল পিঠে নিয়ে—

আমাদেরই আয়াসের বোঝা। এত পরিশ্রম এত কঠিন পথচলার পরও কোনদিন দেখিনি রামলালের বিষণ্ণ মুখ। সদাহাস্যময় রামলাল বন্ধু আমাদের। বেণু আদর করে ডাকত—বুদ্ধু বাহাদুর! সারাদিনের পথপরিক্রমণের পর রামলাল শুদ্ধ পাচকটির অভিনব বেশ ধারণ করে রান্না করত আলু কা সব্জি ও রহড়কি ডাল।

সন্ধ্যার অন্ধকারেও দেখেছি—রামলাল যখন স্নান সেরে সযত্নে সারাদিনের ব্যবহৃত পোষাকটিকে পরিহার করে মাত্র একখানা গামছা দিয়ে সভ্যতা বজায় রেখে রান্না করতে বসতো, তখন তার কালোকুচকুচে পৈতেটিকে বার বার সযত্নে প্রকাশ করে দেখাবার সে কী ভঙ্গী! কুলি এবার পাচক হলেন।

রামলালের রান্নার উপমায় অনায়াসে বলা চলে—বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, আর তোমার এ রান্না ক্ষুধিত জঠরে।

রামলাল মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলত—পাহাড়ে কিছু মেলে না, না হলে রান্না কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম।

দুষ্প্রাপ্যতাকে সৌভাগ্য বলে মেনেছিলাম। একই স্বাদের আদি ও অকৃত্রিম আলুর ঝোল। কত নামেই না ডেকেছি—আলু কা সব্জি, আলু কা ভর্‌তা, আলু কা ঝোল, আলু কা চড়চড়ি। আলু আলু আর আলু, একমাত্র আলু ছাড়া পৃথিবীতে যে অন্য কোন আনাজ উৎপন্ন হয় সে কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। যদি কোনদিন পিঁয়াজ জুটতো কপালগুণে, সেদিন আহা! যেন মোগলাই খানা চালাচ্ছি হিলস্টেশনে বসে। হৃষীকেশের পর মনে পড়ে না উত্তরাখণ্ডের কোথায়ও দেখেছি অন্য কোন তরকারী। অবশ্য কখন সখন মাঝে মাঝে কাঁকড়ি, কদু আর লেবু দেখেছি চাষার ক্ষেতে। বাজার! প্রয়োজনই বা কোথায়! আলু ছাড়া ভোজ্য ত আর কিছু মেলে না। কাপড়ের দোকান—সামনে একঝুড়ি আলু, কিংবা সোনে চাঁদি কি দুকান—পাশেই একটুকরী আলু। সম্ভবতঃ এসব দোকানগুলিকেই গাড়োয়ালী ভাষায় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর জাতীয় কিছু বলে থাকে।

আলু প্রসঙ্গ ছেড়ে আবার রামলালের কথায় আসা যাক। ওর কথা মনে পড়লেই যেন শুনতে পাই রামলাল বলছে—বাবুজি, আমরা ত লেখাপড়া জানি না, আমরা জানি যাত্রীদের পা টিপে দিলে, ভক্তি করলে, চারধামের সুফল পাওয়া যায়।

শুনতাম আর হাসতাম, রামলালের অখণ্ডনীয় লজিক শুনে। দুপুরে নিজে না বিশ্রাম করে আমাদের হাওয়া করত, মাছি তাড়াত। আপন মনেই নিজের ভাষায় গালাগাল করত মাছিগুলোকে। মাঝে মাঝে আবার আনন্দ হলে বাজখাঁই গলায় আর অবোধ্য ভাষায় সুরু করত মালকোষ কিংবা দরবারী কানাড়া। কত না বিচিত্র সুর খেলে যেত রামলালের রাসভ কণ্ঠে। রামলাল গাইত, আমাদের তাই শুনতে হত। হাসি এলেও হাসা চলবে না, বেণুর কড়া ওয়ার্নিং জারী করা ছিল। কারণ—সরল পাহাড়ী প্রাণে নাকি আঘাত লাগতে পারে।

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে ধৈর্যের পরীক্ষায় বিজয়ী হয়ে প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন রবার্ট ব্রুস আর বেচারী মাকড়সা। কিন্তু আমার নাম ত আর কোনকালেও লেখা হবে না ইতিহাসের পাতায়, কারণ শেষরক্ষা আমার হয়নি। মাকড়সাকে দেখে বিজয়ী হতে পারিনি বটে, কিন্তু ধৈর্য ও সহনশীলতায় আমিও যে রবার্ট ব্রুসের সমকক্ষ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। ভেবেছিলাম পথ চলতে চলতে রামলালকে একটু আধটু লেখাপড়া শেখাবো, কিন্তু হায়রে! বিধাতার সঙ্গে সঙ্গে রামলালও হেসেছে আমার বাতুলতায়। যত বলি—বল্ গঙ্গোত্রী, ও বলবে গমতোরী। যমুনোত্রী হল যমতোরী, হৃষীকেশকে বলবে ড়িকেশ আর অগস্ত্য মুনি চিরকাল রামলালের কাছে অকস্টমুণি হয়েই রইলেন। আমার এ অকারণ পরিশ্রম দেখে বন্ধু বেণু মজুমদার হাসতেন আর আমার পিত্ত জ্বলতো হতাশায়।

আমাদের দীর্ঘদিনের সঙ্গী, সর্বক্ষণের বন্ধু রামলাল আজ

অনেক পিছনে পড়ে রইলো। পাহাড়ের মাঝখানেই হারিয়ে গেল পাহাড়ী রামলালটা। ওর পরিশ্রমের মূল্য ত আমি কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। চুক্তির চেয়েও বেশী দিয়ে এসেছি আমাদের কুলিকে। খুসী হবারই ত কথা। কিন্তু বিদায় বেলায় বোকাটা একটু হাসলও না, একটা কৃতজ্ঞতার কথাও বলেনি। বিদায় বেলায় আমি আমার বর্ষাতিটা ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম—কাছে রাখ্, তোর অনেক কাজে লাগবে।

কিন্তু অভিমানী রামলাল আমার উপহার প্রত্যাখ্যান করে দিল অনায়াসে—চাই না। চাই না বাবুজি, আমার কিচ্ছু চাই না। বলেই পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল রামলাল। বাস ছাড়ার তখনও অনেকটা দেরী ছিল।

হৃষীকেশে রামনবমীর রাত্রিটি আজও মনে আছে। নবমীর চাঁদ আকাশে আর রামনাম বাতাসে। রাস্তায় রাস্তায় বসেছে রামনামের আসর। কত ছন্দে আর কত সুরে রচিত রামধূনের মাধুর্যমণ্ডিত কলিগুলো—শুনছিলাম মুগ্ধ হয়ে। শুক্লা নবমীর রাত্রি, পুষ্যানক্ষত্র, রাত্রির শেষপ্রহরে ধীরে ধীরে এসে বসলাম গঙ্গার কিনারায়—ত্রিবেণীসঙ্গমে। ত্রিবেণীসঙ্গম কেন বলা হয় জানিনা। কোথায় সঙ্গম!

মনে হল প্রকৃতির এ লীলাভূমিতে দাঁড়িয়ে, পৃথিবীর সব কোলাহল থেকে অনেক, অনেক দূরে এসে আমারও উচিত পাশ্চাত্য শিক্ষায় লালিত ও বৈজ্ঞানিক ধারায় ক্লিষ্ট জিজ্ঞাসু মনটাকে বেঁধে ছেঁদে রামলালের কাঁধেই চড়িয়ে দিই। তাতে হাল্কাও হবো, পথ চলাতেও আনন্দ আসবে অনেক বেশী আর অনেক সহজে।

তড়িৎগতিতে চলেছেন নৃত্যচটুলা লাস্যময়ী উচ্ছল সফেন গঙ্গা। উপলব্যথিতা অচ্ছোদ তটিনীর সে কী কলনাদ! যেন দূরদূরান্ত থেকে ভেসে আসে অপূর্ব ছন্দোময় সামগান। অপর

পারে ডুন উপত্যকার শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যানী—পাইন আর দেওদার গাছের মেলা। ভোর হয়ে আসছিল। একে একে তারার দল বিদায় নিল ভোরের আলো জাগবে বলে। আমি বসে ছিলাম বালুর চরে পাণ্ডাদের ছোট ছোট মাচাগুলোর একটাতে। ব্রাহ্ম-মুহূর্তের সে যে কি এক প্রশান্ত অনুভূতি, সে ঐশীভাব, সে আত্ম-বিস্মৃতি, সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকা, যার প্রকৃত বর্ণনা কেউ কোনদিন দিতে পারবে না।

প্রভাত পাখীর নানা বিচিত্র মধুর কলকাকলী, নদীর কলরোল, দূরের মন্দিরে ভোরের আরতির মঙ্গলঘণ্টাধ্বনি, সে সুর, সে ছন্দ, আমার কানে কানে যেন এক অজ্ঞাত সত্যের আভাস দিয়ে গেল। ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নানে এসেছেন কত সাধু-সন্ন্যাসী কত তীর্থযাত্রী দল। তাঁদের উদারকণ্ঠের শিব প্রাতঃস্মরণ স্তোত্র আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে।

প্রাতর্নমামি গিরিশং গিরিজার্ধদেহং
স্বৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণ-মাদিদেবম্।
বিশ্বেশ্বরং বিজিতবিশ্বমনোঽভিরামং
সংসার-রোগ-হরমৌষধম-দ্বিতীয়ম্॥

ভোর হয়ে এল। কালোপাহাড়ের দিগন্তবিস্তৃত প্রাচীরের অসীম সীমারেখা দেখা দিল উত্তর গগনে। পাহাড়ের পর পাহাড় আবার পাহাড় তার পিছনে আরও দেখা যায় আরও কত তুষার-ধবল গিরিশৃঙ্গ—যেন দিক্‌চক্রবালের মেখলায় ঢাকা হিমতুষারাচ্ছন্ন মহামৌন পর্বতশ্রেণীর অন্তহীন শোভাযাত্রা।

কিন্তু তন্ময়তা জিনিসটা যেন একসঙ্গে বেশীক্ষণ ঠিক সহ্য হয় না। তন্ময় হতে না হতে আবার অস্থির হয়ে উঠি। নিজেকে ভোলবার জন্য গঙ্গার তটভূমি বেয়ে এগুতে থাকলাম।

নীরব নিস্তব্ধ তটভূমি—কেউ কোথাও নেই। শুধু নুড়ির মেলা। গঙ্গা বয়ে চলেছেন অশ্রান্ত ধারায়, একপাশে হিমালয়ের

কঠিন বেষ্টনী আর অন্যদিকে আমি একা। কেউ নেই আমার পাশে। নিজেকে সেদিন বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিল, কিন্তু পর-মুহূর্তেই যেন আমার সব সঙ্কোচ, সব লাজ, একাকিত্বের সব নির্জনতা, সব শূন্যতা মিলিয়ে গেল হিমালয়ের নিশ্চিত অঙ্গীকারে। উপলখণ্ডের উপর বসে নদীর শীতল জলে পা ডুবিয়ে সেদিন কি ভাবছিলাম জানি না। হয়ত একেই বলে আত্মবিস্মৃতি। না—হয়ত আত্মবিস্তার!

চন্দ্রভাগা নদী একদিন এখানেই গঙ্গার শীতল জলে আত্মনিবেদন করেছিলেন। আজ চন্দ্রভাগা মৃতা, এখানে আজ নেই নদীর স্রোত-ধারা, প্রবাহিণীতে নেই কিছুমাত্র প্রাণের স্পন্দন। আজ মরা চন্দ্রভাগার গতিপথে শুধু নুড়ির মেলা আর পাথরের 'নুমাইশ'। চন্দ্রভাগার শুষ্কধারা বেয়ে দৃষ্টি অনিবার্য রূপে গঙ্গার দিকে ধাবিত হয়। সবুজ কচি ঘাসে ঢেকে আছে নদীর তীর। ছোট্ট ছোট্ট সবুজ পাখী দোল দিয়ে যায় টিয়ারঙ ছোট ছোট সবুজ গুল্মলতায়। জল এখানে এতই অগভীর যে তলার চকচকে বালি আর রূপালী নুড়িগুলো অতি স্পষ্ট চোখে পড়ে। নদীর স্রোত ক্রমাগত এসে আঘাত খায় উন্নত উপলখণ্ডে। এখানে নদী কোথাও বা দুগ্ধফেননিভ—কোথাও বা কাঁচের মত স্বচ্ছ, বল্‌গাহীন ঘোড়ার মত অস্থিরমতি। হাজার হাজার মাছের ঝাঁক আপনমনে খেলে বেড়ায় মনের আনন্দে। হরিদ্বার থেকে যতই উত্তরে গেছি সর্বত্র দেখেছি মাছের সমারোহ্। জলে পা ডুবিয়ে দেখছিলাম মাছের খেলা আর মাছরাঙার চকিত আকস্মিক উপস্থিতি। বালিহাঁসের ঝাঁক চলেছে পাহাড়ের গা ঘেঁষে, মাঝে মাঝে কানে আসে শ্বেত শঙ্খচিলের সুতীক্ষ্ণ শিসের আওয়াজ।

নদীর পারে একা দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ এক শিবের মন্দির, নেই মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্যময় শিল্পচাতুর্য কিংবা নেপালের সূক্ষ্মদারুময় কারুকার্য অথবা উত্তরভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক শিলালিপির কিছুমাত্র আভাস। ভূগর্ভস্থিত এক শিলাময় গহ্বরে শিবলিঙ্গটি স্থাপিত। স্নানান্তে শহরে ফিরে

যাবার আগে ভক্তজন গঙ্গার জলে প্রাতঃস্নান করিয়ে দিয়ে যায় তাদের আরাধ্য দেবতাকে।

তারপর বহুপ্রাচীন ভরতজীর মন্দিরটি দর্শন করে চন্দ্রভাগার নতুন পুলটা পেরিয়ে নেপালী ছেত্র পিছে রেখে এগিয়ে গেলাম স্বামী বিবেকানন্দজির পবিত্রচরণধূলিস্পর্শে পবিত্র কৈলাস আশ্রমে।

কৈলাস আশ্রম—বেদবেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য প্রসিদ্ধ এ বিদ্যানিকেতন। স্বামীজি কিছুকাল এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। নির্জন পরিবেশ, গাছে গাছে নানারঙের ফুলের মেলা, আমের বোলের গন্ধে আকুল বাতাস। মৌমাছি শুনিয়ে যায় গুণ গুণ গান আর প্রজাপতি তার রঙিন পাখনা মেলে জ্বালিয়ে দিয়ে যায় রঙের আগুন। দূরের গঙ্গার যে অনির্বচনীয় রূপ এখান থেকে চোখে পড়ে তা শুধু দেখাই চলে, বর্ণনা করা মানুষের অসাধ্য। মনে হয়, এই বুঝি সেই কবির কল্পনার খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার। মুগ্ধ ও বাক্‌রুদ্ধ করে রাখে।

সারাদিনের পর সন্ধ্যার একটু আগেই ধর্মশালায় ফিরে এসেছি। আমাদের পাশের কামরা তেইশ নম্বর ঘরটায় একটু আগেই এসেছেন আমাদের হরিদ্বারের সেই স্বামীজি, বেণু যার নাম রেখেছিল ফ্যামিলি সন্ন্যাসী। স্বামীজি তাঁর সুন্দর সুঠাম দেবতুল্য দেহকান্তি নিয়ে পুরুষ ভক্তের চেয়ে নারীদের মন হরণ করেছিলেন অনেক বেশী। সর্বক্ষণ পাশে পাশে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াত সুন্দরী একটি বিধবা যুবতী। একটু স্থূলা কিন্তু রূপসী। নীরন্ধ্র অন্ধতমিস্রা তার কুন্তলরাশি, হরিণীর মত টানা টানা কাজল কালো দুটি চোখ, চাঁপা ফুলের মত মিষ্টি দেহের বর্ণ। নাম ছিল বেদবতী, স্বামীজির ছায়া-সঙ্গিনী।

অনেক ঝামেলা সহ্য করে বেণুকে এসব গোপন তথ্য আবিষ্কার করতে হয়েছে। বেণুর মুখে শুনেছি রাজার হালে আরামে আছেন আমাদের ফ্যামিলি সন্ন্যাসী। বেণুর লজিক হোল, ফ্যামিলি ফিজি-

সিয়ান হতে পারে যদি তবে কেন ফ্যামিলি সন্ন্যাসী হতে পারবে না। অখণ্ডনীয় যুক্তি।

বেদবতী ধনশালিনী, রূপবতী, তরুণী বিধবা। স্বামীজির কাঁধে চেপেছেন ভূত হয়ে কি ভূত তাড়াতে সে খবর বিধাতাপুরুষই জানেন ভাল, কারণ পরের খবরাখবর রাখার পারসোন্যাল পোর্ট-ফোলিওটা তো তাঁরই হাতে। তবে শুনেছি স্বামীজি সঙ্গীত-পারদর্শী আর সেই সুবাদেই বেদবতীকে জয় করেছিলেন—জয় করেছিলেন মহল্লার যত বৃদ্ধা ও যুবতীর মন। বেণু বলত—ব্যাটা একটা ইম্‌পস্টার। লোকের সামনে বলে—বেদবতী মেরি বেটি কী তরা। ভণ্ডটাকে যদি পেতাম একবার আমাদের পার্ক সার্কাস পাড়ায়!

অনেক বুঝিয়ে আশ্বস্ত করেছিলাম বেণুকে। চলেছি তীর্থে, কেন মিছিমিছি পরের কথা নিয়ে মন খারাপ করিস্ বল্ ত? কি দরকার আমাদের?

দরকার সত্যি ছিল না, কিন্তু যে উচ্চগ্রামে গুরু-শিষ্যার ধর্মালোচনা ও কথোপকথন হচ্ছিল তাতে অকারণে বার বার অশিষ্ট কান দুটো উৎসুক হয়ে উঠছিল—যদি ধর্মালোচনার ছিটেফোঁটা ছিটকে খানিকটা তেইশ থেকে বাইশ নম্বরে এসে পড়ে।

সায়ন্তন সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে গেল দিগ্বলয়ে। অন্ধকার নেমে এল পাহাড়তলীর বুকে। পুঞ্জীভূত মেঘ জমেছে আকাশের ঈশান কোণে, যেন পয়স্বিনী গাভী আপন সৃষ্টির আনন্দে গর্বিতা। গুরু গুরু মেঘের ডাকে আর হিমেল হাওয়ায় জানিয়ে দিয়ে গেল আকুল আকাশের আনন্দধারার আগমনবার্তা। আকাশ ঝেঁপে বৃষ্টি এল, ঝাপ্‌সা হল গাছপালা ঝাপ্‌সা হল পাহাড়। অবিশ্রান্ত ধারায় অসময়ে নেমে এল যেন শ্রাবণের ধারা। বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা—কিন্তু মনে হল যেন গভীর রাত্রি চুপিসাড়ে এসে গেছে আপন-গৃহের দ্বারপ্রান্তে। কালের আস্তরণে ঢাকা অতীতের অবশ স্নায়ু-গুলো যেন আস্তে আস্তে আবার স্পন্দিত হয়ে উঠল।

অবচেতন মনের গহন-ঘন অন্ধকার ভেদ করে মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে মার মুখখানা, মনে পড়ে আপনজনের কথা, কত শত ফেলে আসা, ভুলে যাওয়া মধুর স্মৃতি। সারাদিনের কাজের শেষে মা হয়ত ভাবছেন তাঁর ঘরছাড়া ছেলেটার কথা। অঝোর ঝরে নেমেছে বৃষ্টির ধারা—নিদাঘের তাপদগ্ধ নগরী মনের আনন্দে উপভোগ করছে এ ধারাস্নান। মায়ের মনে পড়ে অবাধ্য চঞ্চল শিশুর কথা, আজ সে বড় হয়েছে তাই মার নিষেধ মানেনি—ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে অজানার সন্ধানে। মা আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন। মেঘভারাক্রান্ত আকাশের দিকে চেয়ে আমারও মনে পড়ে আমার মায়ের কথা, ঘরের কথা, ফেলে আসা মধুর দিনের অলস বিহ্বল স্মৃতিমুখর ক্ষণগুলির কথা।

এমনি দিনে মহাকবির প্রবাসী মনও আকুল হয়ে উঠেছিল, মিলনের আকাঙ্ক্ষায় চেয়েছিল বিরহবিধুরা প্রিয়াকে আপন বাহুডোরে কঠিন আবেগে বেঁধে রাখতে।—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽ
প্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে
কিং পুনর্দূরসংস্থে।

—নববরষার নবীন মেঘ ও বৃষ্টির এই রিমঝিম সুর মনকে আকুল করে, ব্যাকুল করে তোলে। পাগলা হাওয়া বুঝি পাহাড়ের চূড়োটাকে উড়িয়ে নিয়ে আসছে—অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ।

অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি ঝরতে লাগল, আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। বেণু ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরের কাঠের দরজাটা দমকা হাওয়ায় খুলে গেছে, একটানা খটাখট আওয়াজে আবার সম্বিৎ ফিরে পেলাম। বাইরে এলাম দরজাটা বন্ধ করে দিতে।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙলো চেয়ে দেখি বৃষ্টি থেমে গেছে অথচ কিচ্ছুই টের পাইনি। ঘুম ভাঙলো স্টোভের আওয়াজে। চা প্রস্তুত। সুপ্রভাত বলে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিলেন বন্ধুবর। চা পানান্তে বাইরে এসে দেখি বেদবতীর কামরায় বিরাট একটা তালা ঝুলছে আর বাইরের আকাশ সোনালী রোদ্দুরে ঝলমল। আমার বিস্মিত মুখের ভাব দেখে দারোয়ান নিজে থেকেই বলল—'ও দোনো বহুৎ সুবে চলা গ্যায়া।

—কাঁহা?

—মুঝে মালুম নেহি।

॥ ১১ ॥

আগামীকাল খুব ভোরে আমাদের হৃষীকেশ ছেড়ে যেতে হবে। অগত্যা আজকেই লছমনঝুলা স্বর্গাশ্রম দেখে ফেলতে হয়। সময় কোথায় আর? বেলা থাকতে থাকতেই লছমনঝুলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। হৃষীকেশ থেকে মাইল তিনেক পথ। বাসের ভাড়া তিন আনা আর টাঙ্গায় আনা চারেক লাগে প্রতি সওয়ারী।

মুনি-কি-রীতি—ছোট্ট একটি জনপদ—পেরিয়ে চড়াই-এর পথ হল লছমনঝুলার পথ। বড় সুন্দর পরিবেশ। এপারে মুনি-কি-রীতি ওপারে স্বর্গাশ্রম, মাঝখানে সুরধুনী পতিত-পাবনী গঙ্গা। মুনি-কীর্তিই আমার মনে হয় মুনি-কি-রীতির আসল পরিচয়। ভারতবিখ্যাত সন্ন্যাসী স্বামী শিবানন্দজির প্রতিষ্ঠিত এখানকার আশ্রম ও ডিভাইন লাইফ সোসাইটি, হাসপাতাল—গরীব দুঃখী আর্তজনের সেবায় উৎসর্গিত একটি মহান্ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া মুনি-কি-রীতির বহু মন্দির, আখড়া, আশ্রম, ধর্মশালা সেবাপ্রতিষ্ঠান পথিক মনকে সদাই আপ্লুত করে রাখে গভীর আধ্যাত্মিক আদর্শে। অবশেষে ছোট ছোট কতগুলি চায়ের দোকানের সামনে এসে বাস থামলো। বাস কণ্ডাক্টর পথের নির্দেশ দিল আঙ্গুল উঁচিয়ে—একদম সিধা। ব্যাস্, লছমনঝুলা মিল যায়েগা।

মিল ত যায়েগাই। অতএব তাড়া কিসের? এক ভাঁড় গরম চা না খেয়ে পাদমেকম্ ন গচ্ছামি। বন্ধুর কথাই মানতে হল। পথের পাশেই চায়ের দোকান। বসেই গল্প জুড়ে দিলাম আমাদের হাওড়া পুলের কারিগরী দক্ষতার। শ্রোতাও জুটে গেল।

লছমনঝুলার পথ এখান থেকে আগাগোড়াই উৎরাই। বিনাক্লেশে তরতর করে নেমে গেলাম। খানিকটা যেতেই পথের

দুপাশে অসংখ্য কুষ্ঠরোগী ভিক্ষার আশায় ঝড়জল উপেক্ষা করে রোদ মাথায় সারাদিন বসে আছে যাত্রীর পথ চেয়ে। ভিখারীদের শারীরিক বীভৎসতা দাতার মন থেকে দয়ার কথা ভুলিয়ে দিয়ে ভীতির সঞ্চার করে।

লছমনঝুলার এমন কুৎসিত ভূমিকায় মনটা প্রথমেই বিষণ্ণ হয়ে গেল। ত্রস্তপদে পালিয়ে এলাম চোখ কান বুজে। একটু পরেই পথের বাঁকে দূরের গঙ্গার যে দৃশ্য দেখলাম তাতে এক অনাবিল আনন্দের স্রোতে আমার নালিশি মনটা ভেসে গেল অনিন্দ্য রূপের জোয়ারে। উপলব্যথিত খরস্রোতার সে কী কলনাদ, সে কী উচ্ছ্বাস! সবুজ আর সাদায় মিশে অপূর্ব এক রঙের ছটা জেগেছে নদীর স্রোতে আর তাতে ভেঙ্গে পড়ছে লক্ষ লক্ষ শ্বেততুষার চূর্ণী যেন। অনন্ত কাল ধরে চলেছে নদীর এ অভিযান। বিরামবিহীন অক্লান্ত অশ্রান্ত অচ্ছোদ জলধারা। অবশ দেহ আর বিবশ নয়ন যেন শুনেছে নিশির ডাক। প্রকৃতির এ অনন্ত উদারতা, এ বিশাল ব্যাপ্তি। সে এক অনির্বচনীয় অবিস্মরণীয় আকুল অনুভূতি।

সামনেই লছমনজির প্রাচীন মন্দির। প্রায়ান্ধকার মন্দিরের ভিতরটা ভাল করে আর দেখা হলনা, একাকী পূজারীজি আপন-মনে রামায়ণ পড়ছিলেন সুর করে আর লছমনজির কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যাত্রীদের।

মন্দির ছেড়ে কয়েক পা নেমে এলেই সামান্য একটু সমতল-ভূমি, তারপর আবার উৎরাই। চলতে চলতে হঠাৎ যেন চোখের সামনে থেকে যবনিকা উঠে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে বহুজল্পিত বহুখ্যাত লছমন-ঝুলা। বিরাট একটি লোহার ঝুলন্ত পুল এপার-ওপারে সংযোগ স্থাপনা করেছে। এই কি সেই লছমনঝুলা—যা অতিক্রমণের দুর্গমতার কথা শৈশবকাল থেকে কতবার শুনেছি মাসীমার কাছে ঠাকুরমার মুখে,—পড়েছি বইয়ের পাতায়! মনটা দমে গেল

লছমনঝুলা দর্শনে। এ যে নিছক মানুষের বাহাদুরি, কারিগরি বিদ্যার ভোজবাজি—শুধুই যেন এনজিনীয়ারিং ঔদ্ধত্য। অতিক্রমণ কালে যে দোলা অনুভূত হয় সে উপলব্ধিটুকুই আনন্দের। মনে পড়ে বাল্যকালে এই অনুভূতির আশায় লেকের পুলে ঝাঁকি দিতে গিয়ে কত না গালাগাল আর তাড়া খেয়েছি উড়ে মালী আর বিরাট গোঁফওয়ালা ভোজপুরী দারোয়ানটার কাছে। এমন অভিজ্ঞতার এইটেই উপযুক্ত অনুষঙ্গ।

একপাল বাঁদর নিজ নিজ বাচ্চাদের কোলে পিঠে করে আপনমনে দোল খাচ্ছিল লোহার তারের উপর বসে, বোধহয় কিচিরমিচির করে 'লালাবাই' গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল অশিষ্ট বানর শিশুদের। মৃত্যুভয় নেই কিংবা অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী, নইলে এ ভাবে ও অবস্থায় কোন্ প্রাণী দোল খেতে পারে! নীচেই মৃত্যুগহ্বর গভীর খাদ আর খরস্রোতার ভয়াবহ কলনাদ। শত শত পাথরের বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করে নদী ছুটে চলেছে সমতল ভূমির উদ্দেশে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে সে খেয়াল আছে? এখন কবিত্ব ছাড়, —বেণুর সতর্কবাণীতে সচেতন হতে হল। তাইতো! তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পুল পার হয়ে নদীর অপর পারের রাস্তা ধরলাম স্বর্গাশ্রমের উদ্দেশে। এখান থেকেই প্রকৃত হাঁটাপথ গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে বদরীনাথ পর্যন্ত।

পথে যেতে যেতে চোখে পড়ল—একটি গাছের নীচে চক্ষু বুজে ধ্যানে বসে আছেন এক যোগিবর। চমৎকার মেকআপ নিয়েছেন সন্ন্যাসীঠাকুর—ঠিক যেন নট্ট কোম্পানী যাত্রাদলের শিবঠাকুরটি। মাথায় জটা, ব্যাঘ্রচর্ম পরনে, সারা অঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কানে ধুতুরা গোঁজা। সামনেই একটি সাদা চাদর বিছান—তাতে আনি, দুয়ানি ও নয়াপৈসা ছড়ানো। কাছেই ধুনি জ্বালিয়ে বসে দুজন শিবসহচর—নন্দী ও

ভৃঙ্গী। চমৎকার মানিয়েছিল শিব ঠাকুরটিকে—যেন রবিবর্মার আঁকা ছবিটি—গভীর ধ্যানে মগ্ন। তবে মাঝে মাঝে একটি চোখ বুজে অপরটি খুলে তড়িৎগতিতে দেখে নিচ্ছিলেন পয়সার হিসাবটি। নয়া পৈসা চালু হওয়াতে বড়ই অসুবিধায় পড়েছেন মুনিবর। সময় নেয় বেশী অথচ হিসাবটিও মেলেনা ঠিকমত।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন আমার হাসি লক্ষ্য করে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন—ছি ছি, এখনও গেল না আপনার ঠাট্টা করার বদ্‌অভ্যাস? জানেন, উনি একজন ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ?

অত্যন্ত লজ্জিত হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

—শহরের মানুষ বলেই কি আপনাদের পদে পদে কেবলই সন্দেহ! ছি ছি, মানুষ চিনতে শিখুন!—বলেই যাত্রাদলের বিবেকটি আসর ছেড়ে নিজের পথ ধরলেন। আমি হতবাক্। উত্তর দেব কাকে—তিনি হয়ত এতক্ষণে স্বর্গাশ্রমে পৌঁছে গেছেন।

স্বর্গাশ্রম, গীতাভবন, পরমার্থভবন সবকিছুই দেখলাম ট্যুরিস্টের শুষ্ক দৃষ্টিতে। অর্থের বিরাট জৌলুষে প্রতিমুহূর্তে যাত্রীদের চোখ ধাঁধায়। অর্থের ঝলকানিতেই চোখ বুজে এল—আসল দ্রষ্টব্য তাই অদেখাই রয়ে গেল এখানেও। যেখানে অর্থের প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে পরমার্থের সন্ধান করা নিতান্তই অর্থহীন। হিমালয়ের উদার ব্যাপ্তিতে পরমার্থভবনের উন্নাসিক টাওয়ার ক্লকটা নিছক হাস্যকর বলেই মনে হল। এসবের উপস্থিতি এখানে অর্থহীন, অবান্তর। দ্রষ্টব্য সব কিছুই দেখা হয়ে গেল এক নিমেষে।

দায় সারা হতেই চায়ের দোকানটায় এসে বসলাম। এক ভাঁড় গরম চা সামনে নিয়ে পুরোনো সেই আড্ডাজীবি মনটা খুলে ধরলাম বিদগ্ধ আড্ডাজীবিদের মাঝখানে। ক্রমে ক্রমে আড্ডা জমে বসল মনের মতন করে। একজন পাঞ্জাবী

যুবক—নাম প্রেম তালোয়ার। চমৎকার বাঙ্গলা বলেন—দীর্ঘকাল কলকাতা বাসের ফলেই।—সে কথা তিনিই জানালেন। আরও বললেন—দেখলেন মিষ্টার, আড্ডাটা কেমন জমেছে? জমবে না! —আড্ডাবাজ বাঙ্গালী আর গল্পবাজ পাঞ্জাবী! ওয়াণ্ডারফুল পাঞ্চ। কি বলেন? যেন দু পেগ জিনে একটু লাইমজুস আর কয়েক টুকরো বরফ—বলেই, বহুকাল অনাস্বাদিত সেই পরম অমৃতের কাল্পনিক স্বাদে জিব ও তালু দিয়ে চাটাস্ করে একটা শব্দ করে শুকনো ঠোঁটটাকে ভিজিয়ে নিলেন গরম চা দিয়ে। খানিকটা গালাগাল করলেন অবিবেচক ইউ. পি. গভর্ণমেণ্টকে—এ অঞ্চলটাকে অযথা ড্রাই এরিয়া ডিক্লেয়ার করার জন্য।

প্রেম তালোয়ার ভাবছিলেন ড্রিঙ্কসের কথা আর আমি ভাবছিলাম আমার কলেজি জীবনের মজলিসী কথা। সে সব মধুর দিন কি আর কোন দিন আসবে! কী আড্ডাটাই না মারতাম! কলেজ পালান আর প্রক্সি দেবার ভেতর যে দারুণ একটা রোমাঞ্চ আছে, দারুণ একটা থ্রিল আছে সে কথা কিছুতেই বুঝতে চাইতেন না কলেজের প্রফেসাররা আর বাড়ীর গার্জিয়ানরা।

আমাদের জন্যই নাকি শৈলেনদের রেস্টুরেণ্টের বারটা বেজেছে, নিউ কাফেতে লালবাতি জ্বলেছে—অগত্যা তাই আপনা গাঁ ছেড়ে সদরঘাটের বলাইএর চায়ের দোকানটাকেই বেছে নিয়েছিলাম আমাদের রঁদেভ্যু হিসাবে। কিন্তু বেচারী বলাই কিছুতেই বুঝবে না আমাদের লজিক। আমাদের মতিগতি ফেরাতে বেচারী বলাইএর কি কম ধকল গেছে! কত উপদেশ কত ভাল কথা, কত শাসানি কিন্তু আমরা অটল ছিলাম আমাদের আড্ডায়, অবিচল ছিলাম আমাদের সাধনায়। ঘণ্টায় এক কাপ চা, মানে চারপয়সা হিসাবে ঘণ্টা আটেকের জন্য কত মুদ্রা প্রয়োজন সে হিসাব ছিল আমাদের কণ্ঠস্থ। কিন্তু সে সহজ হিসাব রাখার জন্যই বলাইকে

আবার নতুন করে একটা ক্রেডিট একাউণ্টের খাতা খুলতে হয়েছিল।

লোকটি বড় ভাল ছিল বলাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের দেখলেই পাগলা কুকুরের মত খেঁকিয়ে উঠত। আমাদের তাড়াবার জন্য কত নতুন নতুন নিয়মাবলী যে প্রচারিত হল, কত যে মহাপুরুষের উপদেশাবলী কাঁচ দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙানো হল, কিন্তু আমরা এক একটি অজেয় অপরাজিত ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপের সন্তান, বিজয়ী আলেকজাণ্ডার। শেষ পর্যন্ত আমাদের আসতে দেখলেই বলাই তার কয়লার তোলা উনানটাতে আগুন দিয়ে দিত। সাধারণ লোকের কাছে সে ধোঁয়া অসহনীয়, কিন্তু আমরা চোখে রুমাল গুঁজে নির্বিকার বসে থাকতাম। চোখের জল আর নাকের জলে একাকার হয়ে গেছি, তবুও আড্ডা ছাড়িনি। গুরুদেব প্রভাস চক্রবর্তী বলতেন—সহের বড় গুণ নেই। এইরে শালা সিওর আগুনে লঙ্কা ছেড়েছে! চোখে রুমাল চেপে বসে থাক, এক্ষুনি অল ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

কত আর অযথা কয়লা পোড়াতে পারে গরীব বলাই আমাদের জন্য। ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে গেলেই আবার নতুন উৎসাহে নতুন উদ্দীপনায় নতুন টপিক নিয়ে গুলজার করে আড্ডায় বসতাম।

তারপর আমাদের এত সাধের আড্ডাও একদিন ভেঙ্গে গেল। বলাইএর দোকান গেল উঠে আর সেই সঙ্গে আমাদের কলেজ জীবনও শেষ হল। তারপর কে কোথায় ছিটকে পড়লাম সংসারের আবর্তে। সেদিনকার প্রাণের বন্ধু প্রভাস, মোটকা ভূদেব, অন্তরঙ্গ দোসর কালীপদ মুখুজ্জ্যে, গামলা মিত্তির, শৈলেন দে—তারা আজ সবাই সময়ের আড়ালে হারিয়ে গেছে। সবাই হারিয়ে গেল আমার কাছে, না, আমিই শুধু হারিয়ে গেলাম তাদের মন থেকে! আজও মাঝে মাঝে একলা বসে তাই ভাবি, কিন্তু কোনদিনই ভাবনার থই মেলেনি।

তখনও ভোর হয়নি। এক মুঠো তারা ছড়িয়ে আছে অনন্ত নীল আকাশের একূল ওকূল জুড়ে। রামলাল এসে হাজির। পবিত্র গঙ্গার জলে শুচিস্নান সেরে পবিত্র হয়ে এসেছে সে। পরণে নতুন জামা নতুন পাজামা, কপালে লালচন্দন ও আতপ চালের পবিত্র টিপ। শুভযাত্রার শুভলগ্নে শুচিশুভ্র মন নিয়ে আমার পথের সঙ্গী রামলাল প্রস্তুত।

—কি রে!

হেসে শুধু জবাব দিল—জয় বদরীবিশালজিকি জয়! জয় কেদারনাথজিকি জয়!

শত কণ্ঠের স্তুতিনাদে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ। আমাদের ধরাসু যাবার বাস ছাড়ল। যাত্রীসংখ্যা অতি নগণ্য কিন্তু দেবপ্রয়াগগামী বাসগুলো যেন কুমড়োঠাসা। আসমুদ্র হিমাচলের এমন কোন প্রদেশ নেই যার অধিবাসী আসেনি এ দুর্গম পথযাত্রায়। একটির পর একটি করে সব বাসগুলিই ছেড়ে দিল পথের দেবতাকে স্মরণ করে।

প্রয়াগতীর্থ হৃষীকেশ পিছনে পড়ে রইল। হৃষীকেশই হল ত্রিধারার সঙ্গম ক্ষেত্র, দেবলোক ও মর্তলোকের মিলনসেতু। ওদিকে কেদার-বদরীনাথ এদিকে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী আর পিছনে মর্তের বন্ধন হরিদ্বার।

খানিকটা পথ গিয়েই চন্দ্রভাগা আর মুনি-কি-রীতির পুল পেরিয়ে বাসকে থামতে হল হৃষীকেশ আউটপোস্টে। যাত্রীরা সবাই কলেরা বসন্তের টিকা নিয়েছেন কি-না তাই পরীক্ষা হবে। টিকা ছাড়া পাহাড়ে প্রবেশ নিষেধ। আমাদের আগে আরো গোটা তিনেক বাস দাঁড়িয়ে অনুমতির অপেক্ষায়।

দুটো টাকার বিনিময়ে আগেই আমাদের জোগাড় করা হয়েছে জাল সার্টিফিকেট, সুতরাং নির্ভয়ে নেমে এলাম বাস থেকে। ভীরু পাহাড়ীদের কাছে টিকার উপকারিতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটা লেকচারও ঝেড়ে দিলাম সুযোগ বুঝে। মিথ্যা দিয়েই সুরু হল আমার হিমালয় যাত্রা।

চারিদ্দিকে সে এক হুলস্থূল কাণ্ড। টিকার ভয়ে শঙ্কিত যাত্রীদল নানা অজুহাত দেখিয়ে নানাভাবে অনুনয় বিনয় করে বোঝাতে চায় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীদের, কিন্তু তারা কানে তুলো দিয়ে আপন কাজ করে যাবার উৎকৃষ্ট পন্থাটি বেছে নিয়েছে। কান্নাকাটির

রোল পড়ে গেল যাত্রীদের মাঝে, কিন্তু নাস্তি গতিরন্যথা। হঠাৎ দেবপ্রয়াগের বাসে শুনি আমাদের মুখরা দাক্ষায়ণীদির উচ্চকণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর অম্লমিশ্রিত কলনিনাদ।—বলি ও ভোলা, বসে আছিস কেন রে মেনিমুখো? নেমে আয়, নেমে আয় বলছি। মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেবে কি লা! কথার ছিরি নেই গা! বলি অত যদি সখ তো যাওনা নিজের মাগের কাছে। ধর্ম করতে এয়েছি বলে কি মান ইজ্জতের ভয় নেই গা। ভাল করে বুঝিয়ে দে ভোলা, তোর পিসির গায়ে হাত দেবে এমন মিন্‌সে মাতৃগর্ভে আসেনি। ঝ্যাঁটা মেরে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবো না, টিকে দেবো বললেই হল—একলা দাক্ষায়ণীদেব্যার গলার আওয়াজেই সমস্ত আবহাওয়া গম গম করে উঠেছে।

বেচারী ডাক্তারবাবু! না বোঝেন বাংলা না পারেন বোঝাতে বাংলার অবলাকে। ইনি বুঝবেন না, উনিও ছাড়বেন না।

দেবপ্রয়াগের বাসে চলেছেন বুড়ি মোক্ষদা ঠানদি, হরনাথবাবু, কালীকিংকর বাবু, সরযূবালা, বামুনদি, চারুবালা, হিরণদি, যশোদা—সবাই সুঁই ফোঁড়াবার ভয়ে বিষাদগ্রস্ত।

হঠাৎ আবার তারস্বরে চীৎকার করে উঠলেন—বলি ও ভোলা, নেমে আয় বলছি, দরকার নেই আমার দেবপ্রয়াগ গিয়ে। ভেবেছিলুম তোর পিসের একটা পিণ্ডি দিয়ে আসবো দেবপ্রয়াগে। তা মিনসে যেমন কপাল করে এয়েছে। মর সারাজীবন ভূত হয়ে। আমার কি। পারবোনা আমি বুড়োবয়সে টিকে নিতে। বেঁচে থাকতেও জ্বালিয়েছে এখনও জ্বালাবে মিন্‌সে।

কথার মাঝখানে বাধা দিলেন মাণিকগঞ্জের বাঙ্গাল বামুনদি—ওমা! দিদি কন কি? মরা সোয়ামিরে এমন কইর‍্যা কি কওন লাগে?

—কি! সোয়ামিটি কার শুনি! তোমার না আমার? খুব যে দরদ পরের মিনসের জন্য।—বলেই ডাক্তারবাবুটিকে ছেড়ে

পড়লেন ভাল মানুষ বামুনদিকে নিয়ে। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য।

সুযোগ বুঝে ডাক্তারবাবু হাওয়া হলেন, কিন্তু ব্রবাহূত আমি ভাবছিলাম ভোলার পিসে, মানে দাক্ষায়ণীদির মৃত স্বামী ভদ্রলোকটির কথা। শেষ পর্যন্ত শোনা আমার সৌভাগ্যেও হল না। ধরাসুর যাত্রীরা সবাই প্রস্তুত। কালক্ষয় না করে বাস ছেড়ে দিল।

বাস চলেছে পাহাড়ী পথ বেয়ে। একপাশে কালো পাহাড় আর অপরপার্শ্বে মৃত্যুগহ্বর। বাসের ভেতর মাত্র আমরা গুটি কয়েক যাত্রী। সামনে কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যায় সোয়া পাঁচহাত পিচঢালা রাস্তা আর তার পাশে অতল গভীর খাদ। মৃত্যু যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ম্যাজিকের ভাষায় টানেল অব ডেথ।

হিমালয়ের অমন উদার অনন্ত রূপও চোখের সামনে দেখা দিল মৃত্যুদণ্ড হাতে। বাইরে চাইলে বুক কাঁপে আর চোখ বুঝলে ভয় বাড়ে। মাঝে মাঝে শঙ্কা জাগে, পারবো ত ধরাসু পৌঁছুতে! চলার সময় বাসের চারটে চাকাই অনবরত রাস্তার উপর ছিল কিনা—এখনও সে সম্পর্কে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। প্রথম অভিজ্ঞতার অজ্ঞতা ছিল বলেই সম্ভবত সবাই এক আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বিব্রত। বদরীবিশাল কিংবা গঙ্গামাইয়ার কথা ভুলে শ্যাম সমান মরণের কথা ভেবে কেউ বা চক্ষু বুজে ঘন ঘন বিড়ি টানছেন কিংবা গঞ্জিকার কলকেটাকে আরও শক্ত করে হাতের মুঠোয় চেপে জীবনের শেষ সুখটান টেনে নিচ্ছেন। হিন্দুস্থানী মহিলা যাত্রীরা তারস্বরে সমবেত কণ্ঠে সুরু করেছেন আপন আপন দেহাতি ভাষায় কাজরী কি রামধূন—তা তাঁরাই জানেন। বেণুও তার শুদ্ধ ভক্তিমন নিয়ে বেসুরো গলায় সুরু করেছে রামপ্রসাদী—কবে সমাধি হবে মা শ্যামা, তোমার চরণে। রামলাল খৈনি টিপছে আর আমি আত্মদর্শনে লিপ্ত।

সবার অবস্থা খানিকটা কল্পনা করা চলে যদি বাইবেল পড়া থাকে। সবাই শঙ্কিত সন্ত্রস্ত মন নিয়ে অপেক্ষা করছে চেতাবনীর সেই মহাপ্রলয়ের অন্তিম ক্ষণটির জন্য। কিন্তু বার বার চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল একটি মেয়ের চপল হাসির খিল খিল শব্দে। সবাইকে ব্যঙ্গ করে যেন হাসছে উচ্ছলা চপলা শ্যামা রহস্যময়ী একটি যুবতী। কোলে বছরখানেকের একটি বাচ্ছা কাঁথা কাপড়ের আবরণ ভেদ করে পিট্ পিট্ করে দেখছিল বিশ্বভুবনটাকে আর পাশেই যুবতীটির স্বামী। নির্বিকার, আপন-মনে হারমোনিয়াম বাজিয়ে চলেছে। মধ্য প্রদেশের যাযাবর সম্প্রদায়ের একটি বানজারা পরিবার। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, কাল কী হবে আর কাল কী খাবে সেসব অযথা ভাবনা ভেবে মনের স্বাভাবিক আনন্দধারাকে ব্যাহত করে না কখনও। পরে জেনেছিলাম সেই যাযাবরীর নাম সরবতিয়া আর পুরুষটির নাম তিলাইয়া।

অবশেষে একদিন তারাই আমাদের অতি চেনা হয়ে গেল। আমাদের সহযাত্রী সরবতিয়া আমার এ পথ চলার রোজনামচার আর একটি উপনায়িকা। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর পথে তোরা কেন চলেছিস্ ?

জবাবে যাযাবরী বলল—তা তুমি কেন চলেছ বাবুজি ?

কেনর সে জবাব সেদিন ওকে দেওয়া হয়নি। কারণ—আমার জানা ছিল না। চলেছি কেন ? কেন পিছনে ফেলে এলাম ঘরের অযুত বিলাসিতা, ছিঁড়ে এলাম আপন মানুষের স্নেহের বন্ধন। শুধু চলেছি আর দেখেছি, দেখেছি আর অজ্ঞাতসারে কেঁদেছি। কি যেন এক অব্যক্ত ব্যথা আমার মনের বন্ধ দুয়ারে শুধু মাথা খুঁড়ে মরেছে আর গুমরে গুমরে গোপন ব্যথায় কেঁদেছে। এসেছিলাম ট্যুরিস্ট হয়ে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে, ভেবেছিলাম একটা ওয়াইড প্যানোরমিক ভিউ মনের মাঝখানে গেঁথে নেব।

কিন্তু এ কী হল আমার! কার অমোঘ নির্দেশে আমার পশ্চিম ঘেঁষা মনের এ আকুল পথ-হারানো? ছিলাম ট্যুরিস্ট, হলাম যাত্রিক। সব অহংকার সব জিজ্ঞাসা পথের ধূলায় মিলিয়ে গেল—অজানা কোন্ সে অপর আকাশের হাতছানিতে। কেন এসেছি! দেশ দেখতে, না মানুষ চিনতে, না শুধুই তীর্থের সুফল নিতে—নিজেই বুঝিনি সে উদ্দেশ্য। সে আজও রহস্যই রয়ে গেছে।

পোড়া চোখদুটোকে ক্ষণিকের জন্য বুজতেও ভয় হত, পাছে অদেখা কিছু চিরকাল অদেখাই থেকে যায়। পাছে নিজের অজ্ঞাতসারে পরশপাথর আবার ছুঁড়ে ফেলে দিই। আজকে দীর্ঘকাল পরে শুধু একটি অবাধ্য অনুশোচনাই বার বার আর্তনাদ করে ওঠে, কেন এলাম ঐশ্বর্যের সেই ভাণ্ডার অস্বীকার করে। যা হারিয়ে এলাম হিমালয়ের তুষারগিরিশৃঙ্গের কোলে, দীর্ঘপথের প্রতিটি যাত্রীর উষ্ণ অন্তরঙ্গতায়, গোপন গুহায়, রুক্ষ বনানীর মাঝখানে, সে ক্ষতির অঙ্ক কেউ পারবে না পূরণ করে দিতে—সাতরাজার ধন মাণিক দিয়েও না।

আজ আমার পথচলা বন্ধ হয়েছে। এখন প্রতিদিন সকাল দশটায় অফিসে যাওয়া আর বিকেল পাঁচটায় অফিস থেকে ফেরা। চেতনায় আস্তে আস্তে আবার মরচে ধরচে। ঠিক সেই পুরোনো আচার-আচরণ। বাইরে থেকে ঘুণাক্ষরেও কেউ কিছু বুঝতে পারবে না, কিন্তু সেই পুরোনো ইমারতের কোথায় যেন ফাটল ধরেছে। আগেকার উৎসাহে আর যেন তেমন উৎসাহিত বোধ করি না, অভ্যস্ত অনুষঙ্গে আর সেই নিবিষ্টতা নেই। একটা স্বচ্ছ কিন্তু অনতিক্রম্য প্রাচীর যেন পরিচিত জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে আমায়। তাদের ব্যথায় আর তেমন ব্যথা অনুভব করি না, আনন্দে আর উচ্ছ্বসিত হইনা। কোন এক অজ্ঞাত অভিশাপে কবে থেকে যেন একঘরে হয়ে গেছি। আজ আমি বড় একা। কিন্তু এই নিঃসঙ্গতা মুখর হয়ে আছে সেদিনের সেই পথ চলার

পদধ্বনিতে। সেই সব সহযাত্রীদের হাসি কান্নায়, কথাবার্তায়, বিচ্ছেদে ও ঘনিষ্ঠতায়। স্মৃতি কিন্তু অভিজ্ঞতার চাইতেও যেন অধিকতর বাস্তবানুগ। তাই কেবল স্মৃতির রোমন্থন করে চলেছি রাত্রিদিন।

মনে পড়ে মায়াকুরঙ্গী যাযাবরী সরবতিয়াকে। বিধাতার এক কলুষ সৃষ্টি, পাপের সহচরী বহুরূপিণী সরবতিয়া। সত্যের অরি, সুন্দরের বৈরী। আজন্ম স্বেচ্ছাচারিণী সে—চিরচঞ্চলা। সুখনীড় ধ্বংস করার উন্মাদনাই যার আদিম-তৃষ্ণা, উৎসাদন ছিল যার একমাত্র চিন্তা, সেই ব্যভিচারিণী সরবতিয়া যাযাবরী সরবতিয়ার কথা আজও মনে পড়ে।

ধনুকের ছিলার মত ঋজু তার দেহলতা আর সেই ঋজু দেহ-বল্লরীর উপর নতুনফোটা শিরীষস্তবকের মত সুন্দর মুখ। বন্য-হরিণীর মত চঞ্চল, মরালের মত গ্রাবা, চোখের চাহনি অগ্নিশরে দগ্ধ। কালো সাপের মত দীর্ঘ কালো বিনুনীতে দোলা দিয়ে রস্তোরু সরবতিয়া নাচে আর তিলাইয়া হারমোনিয়ামের সুরে সুরে জ্বালিয়ে দেয় সুরের আগুন। সরবতিয়া ভুলে যায় যে সেও সন্তানের জননী—শিশুর মা। সরবতিয়া নেচে আর গান গেয়ে পুরুষের মনে জাগায় ধ্বংসের মাতন। আকর্ষণ করে উচ্ছৃঙ্খলতার সর্পিল সরণিতে। পথের পাশে পাইন গাছের ছায়ায় শিশু তৃষ্ণায় কাঁদে।

রূপোপজীবিনীদের নিয়ে বহু সার্থক সৃষ্টি আছে পৃথিবীর সাহিত্যের দরবারে—বহু কাব্য, বহু কাহিনী, বহু অমর গাথা। হিউগো লিখেছেন মারিয়োঁ দেলার্মি, মুসেত লিখেছেন বারনারেট, জোলা লিখেছেন নানা, ড্যুমা লিখেছেন ফারনানন্দ। শরৎচন্দ্রের চন্দ্রমুখী কিংবা বিজলি সাহিত্য-জগতের অপূর্ব চরিত্রসৃষ্টি। কিন্তু সরবতিয়া আমার দেখা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নতুন জীব।

প্রেম কাকে বলে সে জানে না। সে জানে দৈহিক আনন্দই

প্রেম, এক রহস্যময় প্রগল্‌ভ স্খলনের অপর নামই ভালবাসা। সরবতিয়াকে যতবার দেখেছি ততবারই হতবাক হয়েছি তার নব নব মিথ্যার কৌশলে, ছলনা আর চাতুরীতে।

সরবতিয়ার কথা এখন থাক।

বাস চলেছে আপনগতিতে অতল গভীর খাদ নিশ্চিন্তে পাশে রেখে একমুখো সঙ্কীর্ণ ছোট্টপথ ধরে। আমরা যে যার চিন্তায় চক্ষু মুদে নিবিষ্ট হয়ে আছি। সরবতিয়া কিংবা ত্তিলাইয়ার উচ্চ-হাসির কলরোলে ভয় আদৌ ভাঙ্গল না, শুধু বিরক্তি বাড়ল। আমাদের কর্ণধার—সর্দারজী, অটল অচল দৃঢ়বদ্ধ-মুষ্টিতে স্টিয়ারিং ধরে আছেন, কিছুমাত্র ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না তাঁর চোখে। মাঝে মাঝে আপন হেঁড়ে গলায় কখন বা হীর-রণ্‌ঝা, কখন বা সোনী-মাহিওয়াল, কখন বা ভাংড়া গেয়ে চলেছেন একটার পর একটা বিনা ইণ্টারভ্যালে।

দশ মাইলের মাথায় এল নরেন্দ্রনগর। বেশ পরিচ্ছন্ন শহরটি —আধুনিকতার ছাপ আছে, সমৃদ্ধির দাবী রাখে। পাহাড়ের ওপরে রাজাবাহাদুরের সুন্দর অনুপম প্রাসাদটি সুরুচির মান বজায় রেখেছে। নরেন্দ্রনগরে এসে সবাই খানিকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। গরম চায়ের ভাঁড়টি হাতে করে নিজের মনেই গুছিয়ে নিলাম প্রাচীন রাজধানীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তত্ত্বগুলিকে। বাসকে খানিকটা জিরুতে হল এখানে। ওপথ দিয়ে হৃষীকেশের বাস আসবে, তারপর সে পুনর্যাত্রার নির্দেশ পাবে। কলকাতায় গিয়ে বোকা না বনতে হয় তাই জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি নোটবইতে তাড়াতাড়ি টুকে নিলাম। নরেন্দ্র-নগর দেখা হল—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,৮৫০ ফিট উচ্চে হিমালয়পর্বতের গাত্রে অবস্থিত প্রাচীন টেহরি গাড়োয়ালের রাজধানী—বর্তমানে জিলার হেডকোয়ার্টার, জনসংখ্যা ৩,৫০০, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার বাস ছাড়ল। এবার যাত্রীরা পূর্বাপেক্ষা অনেক স্থির হয়েছেন, জানিনা কোন্‌ কারণে। সর্দারজির ভাংড়া গানে না বেণু

মজুমদারের কালী-কীর্তনে। পথের এই দুর্গমতা, এই অসমান বন্ধুর ও প্রস্তরাকীর্ণ সঙ্কীর্ণতাই যে স্বাভাবিক ও সহজ সে কথাটা এতক্ষণে সবাই অল্পবিস্তর অনুধাবন করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাবান্তর এসেছে সকল যাত্রীর আচরণে। আপন আপন পাশের সহযাত্রীর সঙ্গে সুখ-দুঃখ, জমি-জমা দেশের কথা বলে চলেছেন।

পরিবেশ সহজ হলে আমিও সহজ। বাসের শূন্য গবাক্ষ পথ দিয়ে দেখি নয়ন-ভোলান প্রকৃতির রূপ-ভাণ্ডার। বিস্ময়ে বিহ্বল, আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেলাম মুহূর্তমধ্যে। হিমালয়ের ধ্যান ভেঙ্গেছে অতীন্দ্রিয় আলোকধারায়। চোখ মেলে পৃথিবীকে যেন প্রথম দেখলাম এত সুন্দর, এত মনোরম, এত শ্যামল।

হিন্দোলা, আগরখাল, জাজল ছাড়িয়ে হিউনি নদী ডিঙিয়ে নাগিনী, চামুয়াকে পিছনে রেখে বাস এবার চলেছে ঢালু পথে। টিহরী পর্যন্ত বার মাইলের ঢালুপথ। টিহরীতে বাস ঢুকলো না, অন্যপথ দিয়ে ধরাসুর রাস্তা ধরল।

টিহরীকে লোকে বলে গণেশপ্রয়াগ। এখানে মিলেছেন ভাগীরথী, ভিলাঙ্গনা আর ঘৃতনদী।

ছোট ছোট বস্তী, ছোট ছোট গ্রাম ছাড়িয়ে বাস চলেছে আপনগতিতে, উপরে চলেছে সাদা-মেঘের দল আর চলেছে দলে দলে রাজহংসীর শ্রেণী পথিকদের পথ দেখিয়ে। 'সম্পৎ স্যন্ত নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ'।

সিরিয়ান, বলদিয়ানা, সিসাঁসু পেরিয়ে আমরা চলেছি ধরাসুর অভিমুখে।

কত ছোট ছোট গ্রাম, কত ছোট ছোট ক্ষেতখামার। পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ির মত থাকে থাকে লাল পাথুরে মাটি সরিয়ে তৈরী হয়েছে চাষের ক্ষেত। মনে হয় নিছক খেলার ছলেই রচনা—জীবন-ধারণের বাধ্যবাধকতায় নয়। এ কিন্তু আমার কল্পনাবিলাসী মনের নিছক স্বপ্নবিলাস। সরল গাড়োয়ালীরা অতি দীনদরিদ্র

জাত—বিশ্বাসী আর ধর্মভীরু। দেশবাসী দরিদ্র, কিন্তু মহারাজা যে কোন দেশের যে কোন শ্রেষ্ঠ ধনশালীর সঙ্গে এক আসনে বসার অধিকার রাখতেন এককালে। ব্রিটিশ আমলে মহারাজার দেশ ছিল এই টেহরী গাড়োয়াল। নিরক্ষর দরিদ্র দেশবাসী এতদিন আলাদিনের দেশে থেকেও কখনও মাথা তুলে জানাল না মানুষের গণ-অধিকার। গোলাম জাত ভুলেও কোনদিন প্রদীপটা ঘসে দেখল না—আসল মানুষটা লুকিয়ে আছে কোন্ অতলে? রাজা আর গোলামের দেশ ছিল গাড়োয়াল। পা টিপে আর জুতোর ঠোক্কর খেয়েই দিন কেটেছে দরিদ্র গাড়োয়ালবাসীর। নিরক্ষর, নিরন্ন দেশবাসী আজও বিশ্বাস করে, রাজা হচ্ছেন পালক, পিতা—ভগবানের প্রতিভূ।

আজকের গাড়োয়ালে অবশ্য অনেক পরিবর্তন এসেছে দেখলাম। ব্রিটিশ রাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাজামহারাজাদের মহামূল্য উষ্ণীষে নিষ্প্রভ হয়েছে হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ছটা। রাজ্য হস্তান্তরিত হল—স্বাধীন ভারতের মানচিত্রে যুক্ত হল গাড়োয়াল। ধর্মভীরু গাড়োয়ালীরা আজও জানে না মিথ্যাচার, আজও দেখেনি বাষ্পীয় শকট, দেখেনি বিজ্ঞানের আলো। কিন্তু কান পেতে শুনলে আজ যেন দূর থেকে সভ্যতার পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। আজকের গাড়োয়ালী সহরেও কোট-প্যাণ্ট পরা মানুষগুলিকে দেখে ওরা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চোখ মেলে চায় আর অকারণে বোকার মত খিল খিল করে হাসে।

অবশেষে মাল্লিদিওয়াল অতিক্রম করে সন্ধ্যা পাঁচটা নাগাদ ধরাসু এস পৌঁছুলাম। স্থানও পেয়ে গেলাম কালীকম্বলির ধর্ম-শালায়। সারাদিনের এই একঘেয়ে পথ-পরিক্রমণ, বাসের একটানা যান্ত্রিক আওয়াজ আর বনস্পতিতে ভাজা পুরির দৌলতে শরীরটা যেন বড়ই বিকল হয়ে পড়েছিল। ধর্মশালায় ঢুকেই মনটা খুসীতে ভরে উঠলো—মনে হল দীর্ঘ প্রবাসের পর ফিরে এসেছি আপন গৃহে।

রামলাল বিছানা পেতে দিয়ে আহার্যের সন্ধানে গেছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম এলোমেলো কত কথা, অসংলগ্ন জীবনের সব ছোটখাটো ঘটনা। আমাদের ঘরের সামনেই ছোট একফালি বারান্দা। বটগাছের একটা বড় শাখা ঝুঁকে পড়েছে ধর্মশালার অঙ্গনে। অলস মুহূর্তগুলি কাটছিল যাত্রীদের ভেসে আসা ছোট ছোট কথার রেশ শুনে। সারাদিনের পর আশ্রয় মিলেছে—তাই সবাই সংসার গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। কেউবা গেছেন স্নানে, কেউবা গেছেন খাদ্যের সংস্থানে, কেউবা শুধু আমারই মত হাত-পা ছড়িয়ে চক্ষু বুজে অবসন্ন বিনোদন করছেন। কেউবা বুড়ো আঙ্গুলটা দিয়ে ঠেসে ঠেসে ভরছেন গঞ্জিকার কলকেটাকে নতুন মালমসলায়।

যাত্রীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এ দুর্গম পথে পুণ্যালোভাতুর যাত্রীর সংখ্যা অতি নগণ্য, আর সেইজন্যই কখনও এ পথে রাত্রিবাসের অসুবিধায় পড়তে হয় না যাত্রীদের। সবাই ছুটেছেন কেদার-বদরীনাথ। বদরীনাথের তুলনায় এ পথের দুর্গমতা শতগুণে বেশী। শতগুণে বেশী প্রয়োজন—সংযম, তিতিক্ষা আর সহিষ্ণুতা। বদরীনাথের পথে যেভাবে পিচঢালা পথ এগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন, তাতে এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না যে বছর দুই তিনেকের ভিতর নিশ্চয় কলকাতাবাসী উইকএণ্ডে হনিমুনে কিংবা তীর্থভ্রমণে বদরীনাথ দর্শন সেরে আবার সোমবার অফিস অ্যাটেণ্ড করতে পারবেন অনায়াসে। তখন কাশীর বিশ্বনাথ আর হিমালয়ের বদরীনাথকে একই ঢালা ফরাসে আসন করে নিতে হবে। তখন হয়ত বা পথের দুর্গমতা অনেক সহজ হবে, কিন্তু মন জানে তাঁর দূরত্ব অনেক বেড়ে যাবে।

বড় আক্ষেপ হয় যে কেন এলাম না আরও বহু আগে এ হিমালয় অতিক্রমণে। পাকদণ্ডীর আঁকাবাঁকা সর্পিল পথরেখা অশান্ত মনকে বার বার জিজ্ঞাসা করেছে—কেন এলেনা সেদিন

যেদিন আমি ছিলাম একা আর ছিল ঐ উদার, অনন্ত, চিরনীহার, চিদাত্মা হিমালয়।

অবশ্য এমন গবেষণায় আমি কোনকালেই উৎসাহ বোধ করিনি—কেন আগে জন্মাইনি কালিদাসের কালে; জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যজি কিংবা স্বামী বিবেকানন্দজির সহযাত্রী হয়ে কেন আসিনি দেবদর্শনে, হিমালয় ভ্রমণে;—অত দূরদৃষ্টি আমার নেই। বরাতের জোরে যদি জলধর সেন কিংবা প্রবোধ সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গেও আসতে পারতাম মহাপ্রস্থানের পথে তবে আমার এ মনঃক্ষোভের অনেকটা লাঘব হতে পারত। সেদিন ছিল না এ পিচঢালা পথ, ছিল না ইউ. পি. সরকারের স্টেট ট্রানস্‌পোর্টের পরিবহণ ব্যবস্থা—ছিল শুধু যাত্রীদের অজেয় মনোবল, অটুট প্রতিজ্ঞা আর ভক্তি অচঞ্চল। বদরীনাথের পথে যেতে যেতে অনেকবারই আমার মনে হয়েছে হয়ত বা আমাদের ছেলেমেয়েদের কালে এসব ধর্মশালা চটি ছেত্র সব উঠে যাবে, মুছে যাবে বাবা কালীকম্বলির নাম। তার বদলে মনোরম নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্থাপনা করবেন মিস্টার ওবেরয় নতুন নতুন আপ-টু-ডেট হোটেল ও পানশালা। আমি ভাবি আর নিজে নিজেই হাসি। মনে পড়ে নরেনদা বলতেন—কালধর্মকে মানতে না পারলেই আমার মত অবস্থা হবে রে! চোখ মেলে চল্‌।

চোখ মেলে দেখি বৈশাখের ঝোড়ো হাওয়া দোল দিয়ে যায় চৈত্রদিনের পল্লবহীন শুকনো ডালপালাতে। সামনে গরম চায়ের গ্লাস রামলাল রেখে গেছে, তরকারী কোটা, চালডাল ধোয়া, উনানে আঁচ দেওয়া হয়ে গেছে—সব কাজ শেষ। কিন্তু আমার কিছুই হোল না। আমার ভাল লাগে শুধু দিনশেষে পরিশ্রান্ত দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দিতে। ভাল লাগে অশান্ত পাগলা জিজ্ঞাসু মনটার লাগাম ছেড়ে শূন্যে ভেসে যেতে।

উত্তর আকাশের গায়ে ভেসে চলেছে মেঘ। যেন 'মেঘ সে বাষ্পগিরি, গিরি সে বাষ্পমেঘ।'

অতি স্বল্পক্ষণের পরিচয়েই ধরাসুকে যেন ভালবেসে ফেলেছি। এখানে এসেই আবার গঙ্গাকে পেলাম। এ সেই ধরাসু—তুষারতীর্থ যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী যাবার প্রথম আলোক-তোরণ। এখান থেকেই পায়ে হাঁটা পথ সুরু। যমুনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যমুনোত্রীর পথ গিয়েছে বাঁয়ে, আর ডাইনে গেছে গঙ্গাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গঙ্গোত্রী গোমুখের আঁকাবাঁকা দুর্গম পথরেখা।

—ভিতরে আসতে পারি? পরিষ্কার ইংরেজিতে প্রশ্ন করেন আগন্তুক। অপূর্ব সুন্দর, দীর্ঘ বলিষ্ঠদেহী এক যুবাপুরুষ। দীর্ঘবাহু, উন্নতনাসা, টানা টানা চোখ।

অনুমতি নিয়ে ভিতরে এলেন বপুষ্মান তরুণ যুবক। ইংরেজিতে বাক্যালাপ সুরু করলেন—টুকরো টুকরো মামুলি কথায়। প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ কাটিয়ে ধীরে ধীরে দুজনেই দুজনার কাছে আপন হয়ে গেলাম। পথের সঙ্গী মিলল নতুন করে।

নাম কীর্তিদৎ। দিল্লীর নামকরা এক তরুণ চিত্রকর। মায়ের একমাত্র ছেলে কীর্তি। শিশুকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মায়ের স্নেহ, ভালবাসা আর শাসনেই বড় হয়েছে। মা ছাড়া কিছু জানে না।

সেই মায়ের মৃত্যুশোক বড় ভীষণ করে লেগেছিল তার বুকে। অকস্মাৎ যেন সব যুক্তি অর্থহীন হয়ে গেল, সব আলো নিভে গেল চোখের নিমেষে। এতকালের অভ্যস্ত জীবনে আর কণামাত্র নিষ্ঠা রইল না। চোখের সামনে থেকে যেন পরদা সরে গেছে—তারপরই বিরাট শূন্যতা। ঘর ছেড়ে বাইরে এসে একা দাঁড়িয়েছে কীর্তিদৎ। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আজ এসে পৌঁচেছে হিমালয়ের পায়ের কাছে।

কীর্তির সঙ্গে প্রথম আলাপ এই ধরাসুর ধর্মশালায়।

কীর্তির অন্তরঙ্গতা বড় ছোঁয়াচে। মিষ্টভাষী সদালাপী নবীন যুবক। কিছুক্ষণ এসে বসতেই উপস্থিত সবাইকে নিজের উৎসাহে উৎসাহিত

করে তুলল, তখন আর কিছুতেই পারলাম না নিজেকে সামলে নিতে। বললাম—তোমারও কেউ নেই, আমাদেরও কেউ নেই। আমাদের সঙ্গে চল তুমি—পথ একটাই। মিষ্টি হেসে বললো—আমার কেউ নেই অতি সত্যি কথা, কিন্তু কিছুও যে সঙ্গে নেই সে কথা অস্বীকার করব কি করে? একটি মাত্র ছোট ঝোলা, ছবি আঁকার কিছু তুলি আর রং, আর এই বাঁশীটিই একমাত্র সম্বল।

—ও এই কথা।—বলেই একটানে কীর্তিকে আমাদের সবার মাঝখানে বসিয়ে দিল বেণু। সমবেত অনুরোধের জোয়ারে কীর্তির কোন কথা, কোন আপত্তিই আর টিকল না। তিনজনের বিছানাটাকে একটু সরিয়ে আরেকজনের জায়গা করা হয়ে গেল অনায়াসে। ছিলাম তিন হলাম চার।

আমাদের একটানা চলার পথে নতুন সঙ্গী জুটল দিল্লীর কীর্তিদৎ। রামলাল, বেণু খুসীতে সবাই আটখানা। গরম চা এল, বাজার থেকে গরম গরম পাকোড়া এল। নতুন পরিচয়ের শুভলগ্ন সেলিব্রেট করা হল বিরাট উদ্দীপনার মাঝখানে। কর্ম-তৎপরতা বেড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, চাল ডালের পরিমাণ বাড়িয়ে দিল রামলাল, বেণু লেগে গেল ঘর গোছাতে আর আমি চক্ষু মুদে ভাবছিলাম—'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই'র নিগূঢ় তত্ত্বটি!

॥ ১৩ ॥

কীর্তিদত্তের কথা মনে হলে আজও মনটা উদাস হয়ে যায়, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে সান্ত্বনাহীন বিষাদে। জানি কোনদিন তোমাকে আর দেখব না, কোনদিন আর পাব না তোমার সাহচর্য, কোনদিন তুমি আর তোমার হাতটা বাড়িয়ে দেবে না সহযাত্রিত্বের উষ্ণ সমবেদনায়। যে ভুল আমি করেছি, যে আঘাত তোমাকে দিয়েছি—তার দুঃখ কোনদিন আমার ঘুচবেনা। তোমার চেয়ে শতগুণ দুঃখ পেয়েছি আমি নিজে। এ জীবনে তোমাকে বোঝাবার সুযোগ পেলাম না। সে দুঃখ আমার সারাটা বুক জুড়ে আছে। জানি চিরকাল আমাকেই বয়ে বেড়াতে হবে সে দুঃখের বোঝা। সেই হবে আমার প্রায়শ্চিত্ত।

ভোর চারটে তখন, আমরা সবাই প্রস্তুত। যাত্রার শুভলগ্ন সমাগত। ভোর না হতেই গরম গরম চা খাইয়ে তাজা করে গেছে রামলাল। শয্যা থেকে ঠেলে ঠুলে আমাদের উঠিয়ে দিয়ে গেছে। বিছনাপত্র সব বাঁধাছাঁদা শেষ। মণ দেড়েক ভারী মালের বোঝাটাকে পিঠে ফেলে হাসিমুখে রামলাল এসে দাঁড়াল—কহিয়ে গঙ্গামাইয়া কি জয়! যমুনা মাতা কি জয়!

আমরা প্রস্তুত। ক্যানভাসের জুতো পায়ে, পরনে গরম সার্ট ও ট্রাউজারস, কাঁধে ক্যামেরা, পিঠে হ্যাভারস্যাক, কাইটমার্কা ওয়াটার বটল, হাতে সুদৃশ্য লাঠি, চোখে কালো চশমা, মাথায় বিলিতী ফেল্ট হ্যাট। আমাকে দেখে বেণু হেসেই অস্থির—জঘন্য...অতি জঘন্য লাগছে তোকে। মনেই হয় না হিমালয়ের যাত্রী বলে—যেন চলেছিস টাইগার হিল্‌সে সানরাইজ দেখতে।

ভোরের কুয়াসা তখন কেটে গেছে। ধীরে ধীরে আমাদের পদযাত্রার প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের যবনিকা উন্মোচিত হল।

পথে নেমে এলাম। পিছনে রইল ভাগীরথী-বিধৌতা ধরাসু।

একটু সরু পথ গেছে গঙ্গার ধারে ধারে। প্রথমে সমতলভূমি, তারপর ধীরে ধীরে গঙ্গার গা বেয়ে উঠেছে চড়াই।

খানিকটা চলার পর পথ এক তিন মাথার মোড়ে এসে থামল। পিছনে ধরাসু, ডাইনে গঙ্গোত্রী যাবার উঁচুনীচু পথ আর বাঁয়ে বার্তাফলকে লেখা—'রোড টু যমুনোত্রী'। গঙ্গার স্রোতরেখা অদৃশ্য হয়ে গেল পাইনগাছের বিলম্বিত ছায়ার আড়ালে। শ্রুতির বাহিরে হারিয়ে গেল নদীর কলতান—বনানীর বনমর্মরে, আর নাম না জানা পাখীর কলকাকলীতে। প্রভাতী শীতল হাওয়ায় শরীর মন জুড়িয়ে গেল।

ঘন পাইনের বন। গাছের শাখে শাখে কত পাখী, কত মৌচাক। কানে আসে মৌমাছির মধু গুঞ্জন। ডালে ডালে মৌ জমছে—তাই মধুর লোভে গুণ্ গুণ্ করে মৌমাছি। গাছের উঁচু উঁচু ডাল-পালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নীল আকাশ আর হাল্কা সাদা মেঘের দল চলেছে ভেসে। আর একা একা চলেছি আমি—আপন সঙ্গীসাথী কেউ বা গেছেন সামনে এগিয়ে, আবার কেউ বা পড়ে আছেন পিছে। চলেছি···চলেছি। কত ভাবনা আসে মনে, আবার শেষ হবার আগেই নতুন ভাবনা এসে মেশে তার সঙ্গে—চেতনা যেন এক প্রশস্ত নদীশয্যা। সেদিনের সেই প্রকৃতির উদার স্বীকৃতি আমার সংশয়-সঙ্কুল সমস্ত বাচালতাকে অনায়াসে নীরব করে দিয়ে গেল। নিথর হয়ে রইল আমার অনুভূতি।

আস্তে আস্তে পথ দুর্গম হয়ে আসছে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে হয়, লাঠিটাকে আরও ভাল করে চেপে ধরতে হয় দৃঢ়তর মুষ্টিতে। সূর্যের তেজ বাড়ছে। পথ চলতে ক্রমশঃ বেশ কষ্ট হচ্ছে। মাইল চারেকের মাথায় কল্যাণী। চায়ের দোকানটাতে বসেই দু কাপ কড়া চায়ের হুকুম দিয়ে খানিকটা হাঁপ ছেড়ে নিলাম। হিমালয়ের পার্বত্যপথে পদব্রজনের অভিজ্ঞতা যার নেই,

এই চায়ের স্বাদ, এই বিশ্রামের নিবিড় আনন্দ তাকে বোঝাবার চেষ্টা বিড়ম্বনা হবে। কিন্তু হায়, এই আনন্দও অপরাপর জাগতিক আনন্দের মত, সূর্যোদয়ে শিশিরবিন্দুর মত ক্ষণস্থায়ী। যাদের সবাইকে অতিক্রম করে এসেছি তারা সবাই আবার একে একে এগিয়ে যায়। বসে থাকতে ভাল লাগে কিন্তু বসে থাকতে ইচ্ছা করে না। লাঠি হাতে নিয়ে আবার দোকানের ছায়া থেকে পথের রৌদ্রে নেমে এলাম।

আবার পথ চলা, থামলে চলবে না। এবার পথ চলতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। পথ কেবল উঁচুতেই উঠছে। শীতের রেশটুকু অবলুপ্ত, কপালে দেখা দিল লক্ষ লক্ষ স্বেদবিন্দু। ক্রমেই সূর্যের তাপ বাড়ছে, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে আসছে। কিন্তু পথের নির্দয়তা যতই নিষ্করুণ হয়, ততই যেন একটা বলিষ্ঠ অভিমান আস্তে আস্তে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম কয়েকবার দেহমন অবাধ্য ছেলের মত নালিশ জানায়। অবশেষে একসময়ে পথের এই নির্মমতাও কেমন যেন স্বাভাবিক মনে হয়। দুর্গম-পথের দুর্গমতা তখন আদৌ অলঙ্ঘনীয় মনে হয় না।

কল্যাণীর পর পাঁচ মাইলের মাথায় এসেছিল কুমরারা চটি। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার সুরু হয়েছে পদব্রজন। চড়াই পথ। ঘন পাইনের বন আর শ্যামল বনভূমি। শুকনো পাতা পায়ে দলে পথ চলি আর তার শব্দে ওঠে অদ্ভুত এক বিচিত্র সুরের ব্যঞ্জনা। মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হয় দু-একজন যাত্রীর, কেউ বা বিশ্রাম নিচ্ছেন ছায়ায় বসে আবার কেউ বা আমাকে পিছে রেখে এগিয়ে গেলেন সামনে।

আজ প্রথমদিন ন' মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করেছি। সূর্য ডোবার আগেই সিলকিয়ারা পৌঁছে গেলাম। সত্যি ত পেরেছি ন' মাইল একটানা অসমান দুস্তর উপলাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে! চপল আনন্দে বুকটা ভরে ওঠে।

ধর্মশালায় এসে দেখি রামলাল অনেক আগেই পৌঁছে গেছে। কীর্তিদৎও এসেছে কিছুক্ষণ—বাকি ছিলাম আমি ও বেণু। আমিও এসে গেলাম। বাকি এখন শুধু বেণু। আমাদের আসার আগেই রামলাল বিছানা পেতে রেখেছিল। পা'টা ছড়িয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লাম গভীর অবসাদে। সারাদিনের পথশ্রমে ক্লান্ত, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই বুঝতে পারিনি। জুতো জোড়াও খোলা হয় নি আলস্যে। হঠাৎ একসময়ে ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি কোণায় লণ্ঠনটা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে, উনানে ভাত টগবগ করে ফুটছে। আবার তন্দ্রায় চোখ জড়িয়ে এল, কিন্তু এক অপূর্ব সুরের নৈর্ব্যক্তিক মূর্ছনায় মন প্রাণ উন্মুখ হয়ে উঠল। এক বাঁশুরিয়া হৃদয়ের সব অনুভূতি উজাড় করে বাজিয়ে চলেছে পাহাড়ীয়া ধূন। সম্বিৎ হারিয়ে গেল আমার। কার বুকে এমন করে কান্নার সুর বেজেছে!—কে বাজায় রে রামলাল ?

ছোট্ট কথায় জবাব দিল—কীর্তিদৎজি।

আত্মবিহ্বল মত্ত ময়ূরের মত আমি অবাক হয়ে শুনি। বাঁশীর সুরে সুরে মূর্ছনা জাগে পাহাড়ী বাতাসে, মাদকতা জাগে নদীর কলতানে। আমার সমস্ত চেতনা প্লাবিত হয়ে গেল অদৃশ্য নিগূঢ় শ্রূয়মাণ এক সুর-ঝংকারে।

ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে পাইনের বনে, যাত্রী-আবাস নিস্তব্ধ। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমরা শুধু কটি প্রাণী জেগে আছি এক রূপকথার অচিন দ্বীপে। লণ্ঠনের আলো অন্ধকারের অস্তিত্ব আরও স্পষ্ট করে ধরেছে। কালো ধোঁয়ায় অন্ধকার লণ্ঠনের কাঁচের চিমনিটা। কীর্তিদত্তের বাঁশীর সুরে বাইরের বিশাল অন্ধকারটা অনুরণিত হয়ে উঠেছে। স্পন্দিত হচ্ছে যেন সজীব। হঠাৎ শুনি পাইনের ঘন বনের মাঝখান থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে নূপুরের শব্দ। একটু সন্ত্রস্ত কিন্তু তার চাইতেও বেশী উদ্দাম। যতটা সচেতন ততটাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ। বাঁশীর সুরে আত্মহারা হয়ে এগিয়ে আসছে

রাতের অভিসারিকা। নিকট থেকে নিকটতর হয়ে নূপুরের শব্দ অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

বাঁশীও থেমে গেল। সমস্ত প্রকৃতি যেন অকস্মাৎ বিরূপ হয়ে গেল। অন্ধকার অধিকতর রহস্যময়, পাইনবনের গাছে গাছে আবার সেই আদিম ষড়যন্ত্র। ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ যেন গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। একটা অনির্দেশ্য অস্বস্তিতে চেতনা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

একটু পরেই কীর্তি ঘরে এল। বেণু ঘরের স্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিয়ে প্রশ্ন করল—এমনি হঠাৎ বাঁশী থামিয়ে দিলে যে?

কথার কোন জবাব না দিয়ে কীর্তি অকারণে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আবার শুনি নূপুরের সেই শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরান্তে—পাইনের বনবীথিকার অন্তরালে।

রাত্রির খাওয়াদাওয়া সমাধা হতে সেদিন বেশ রাত হয়ে গেল, তারপর যে যার মত শুয়ে পড়লাম। সময় কেটে যায়, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। সারাদিনের পথশ্রমের পরও ঘুম আসছে না চোখে। ধর্মশালা নিস্তব্ধ, সবাই যে যার মত ঘুমিয়ে পড়েছে। কালো অন্ধকার পাহাড়ে আর নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতায় কী যে মায়া জড়ান, তার যে কী নিবিড় আকর্ষণ সে কেবল সম্যক উপলব্ধিই করা চলে—বোঝান চলে না। বাইরে পাইন গাছের বনমর্মর, পাহাড়ী রাতের উদ্‌ভ্রান্ত হাওয়া সোঁ সোঁ করে বয়ে চলেছে। কঠিন পাথরের বুকে বাধা পেয়ে আরও উন্মত্ত হয়েছে সে ক্ষিপ্তা ঝঞ্ঝা। কত অজানা শব্দ শুনি ভেসে আসে। সমস্ত অতন্দ্রিত সত্তা, সমস্ত অক্ষোভিত অস্তিত্ব আজ রাতের নিঃসীম তমসায় অবলুপ্ত—সমস্ত হিমালয় যেন গভীর অন্ধকারে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত।

চটির এক কোণে বসে একটানা একঘেয়ে সুরে কেঁদে চলেছে

এক যোধপুরী মহিলা। রামলালের কাছে শুনেছি, আসার পথে কলেরায় তার একমাত্র শিশু সন্তানটির মৃত্যু হয়েছে। সেই থেকে মার বুকে শূন্যতার ক্ষত। সারাদিন পথ চলে কত চড়াই কত উৎরাই—মৃত সন্তানের বিয়োগ ব্যথায় মনটা হুহু করে ওঠে, কিন্তু কাঁদবার সময় সে পায় না। তাই বুঝি গভীর রাতের অন্ধকারে মনে পড়েছে তার শিশুটির কথা। মার বুকের অঝোর কান্নার প্রতিধ্বনি জেগেছে পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে। একটানা কান্নার রোল উঠেছে বাতাসে। মার বুকভাঙ্গা ক্রন্দনে পৃথিবী মুহ্যমান—হিমালয় নির্বাক।

অবসাদগ্রস্ত ক্লান্ত পথশ্রান্ত চেতনায় অসংবদ্ধ ভাবনা ভেবে ভেবে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। আবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখনও শুনি সন্তানহারা জননীর বুকফাটা কাতর আর্তনাদ। রাত্রির পরিসমাপ্তি হয়নি, তখনও প্রহরখানেক বাকি।

আকাশে তখনও অযুত তারার দীপালি। আলো আর আঁধারের চলেছে মন দেয়া নেয়া। শয্যা ত্যাগ করে বাইরে এসে দাঁড়ালাম খোলা আকাশের নীচে। দুর্গম পথযাত্রার দ্বিতীয় দিবসের প্রথম শুভলগ্নে, ঊষার আবির্ভাবের প্রথম শুভক্ষণে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার অশ্রুজল স্বতঃই প্রবাহিত হয় অনাদি, অনন্ত, হিমাঙ্গ হিমাচ্ছন্ন গিরিমালার উদ্দেশ্যে।

ভোর হয়ে এল। কিন্তু অন্ধকারের যবনিকা তুলে প্রভাত আলো যে বরণডালা সামনে ধরল তা দেখে মনটা খুবই দমে গেল। সম্মুখের পথ চোখ রাঙিয়ে আছে, সমস্ত ঈশানকোণ কঠিন প্রস্তর প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য। সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক বিদ্রোহী উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ—মহাস্থবির এক দুর্লঙ্ঘ্য চড়াই—উদ্ধত এক বিরাট জিজ্ঞাসা। মন সন্দেহের দোলায় সঙ্কুচিত, সন্দিগ্ধ। মনে জাগে ভয়, জাগে ত্রাস, জাগে আতঙ্ক। কি করে পার হবো এ বিরাট

আকাশ-ছোঁয়া চড়াই? উন্নত পাহাড়ের গায়ে গায়ে এঁকে বেঁকে ঊর্ধ্বমুখে চলেছে এক সর্পিল সরণি।

হরিদ্বার থাকতেই ত শুনেছিলাম যমুনোত্রীর দুরারোহ দুর্গমতার কথা, কিন্তু সেদিন কেন শুনিনি তাদের পরামর্শ, তাদের উপদেশ! কেন কোন্ আকর্ষণে কিসের বাধ্যবাধকতায় এলাম এ দুর্গম গিরিপথে! সারামন বিদ্রোহ করে ওঠে, যেন কত জন্মের ঋণমুক্ত হতে চলেছি যমুনার মন্দিরে। চলেছি তাপসী তপনতনয়ার উৎস সন্ধানে!

নিজের অজ্ঞাতসারে ভয়ে আতঙ্কে দেহমন কেমন যেন অথর্ব হয়ে এল নিজের অক্ষমতার কথা চিন্তা করে। গতজন্মের অজ্ঞেয় পাপের বোঝা হাল্কা করে দিতে এসেছি হিমালয়ের ব্যাপ্তিতে। মন গভীর বিষাদে মগ্ন হয়ে রইল। উদাসনেত্রে কিছুক্ষণ শূন্যে অনন্ত দিগন্তের পানে চেয়ে রইলাম। সামনে চড়াই মুখব্যাদান করে আছে, কিন্তু অনিবার্যকে অস্বীকার করবার মূঢ় অসহায়তা তখন স্তিমিত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় দিনের চলা সুরু হল। সবাই চলেছে নতুন উদ্দীপনায় —নতুন করে চলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। শুধু কি আমিই পড়ে থাকবো পিছে, মিথ্যা হবে আমার তীর্থযাত্রা! রামলাল চলে গেল। কীর্তি, বেণু সবাই আমাকে পিছনে রেখে এগিয়ে গেল সামনে।

সারাপথ শুধু পাষাণ আর উপলখণ্ডে সমাকীর্ণ। সান্ত্বনা— পাইন বনবীথির অকৃপণ ছায়া। পাইনগাছের অরণ্য চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। পাখীর ডাক শুনি আর শুনি পাহাড়ী দমকা হাওয়ার সোঁ সোঁ ক্রুদ্ধ গর্জন। কিন্তু সব কিছুই যেন মনে হল ছন্দোহীন, ব্যঞ্জনাহীন। মাথায় যেন একটা অসহ্য ব্যথা অনুভব করছি। যেন পা আর চলে না—দারুণ অবসাদে দেহ ভেঙ্গে পড়ছে। সূর্যের তাপদাহে দগ্ধ ঘর্মাক্ত সারাদেহ, অবসাদে সারামন

বিক্ষিপ্ত। ভিণ্ডিলগাঁওয়ের চড়াই ভেঙ্গে যখন পর্বতের সানুদেশে উপস্থিত হলাম—তখন মধ্যাহ্ন।

ছোট্ট একটি চায়ের দোকান—সামান্য নিরীহ আয়োজন, ছায়াস্নিবিড়। বেণু কড়া চায়ের আদেশ দিয়ে আমার পথ চেয়ে বসে আছে। সবাই ক্লান্ত। চায়ের দোকানে উপস্থিত হয়ে সব ভুলে গেলাম। পিছনের এ দুর্গম চড়াই, এ কঠিন পথ সব যেন স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। অমানিশার অন্ধকার কেটে গেল। অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখি বিশাল পর্বতের অপর পার্শ্ব ধীরে ধীরে মাথা নত করে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চলেছে কালিন্দীর কালোজলে।

এবার নামার পালা। একটানা পথ গেছে শিমলি হয়ে গাংনানি। চোখ জুড়িয়ে গেল সবুজবনের অসীমতায়, নীল আকাশের নীলিমায় আর প্রকৃতির নিস্পন্দ স্তব্ধতায়। দূরে প্রথম দেখা দিল তুষারাবৃত বন্দরপুঞ্চ পর্বতমালা। দিগন্তের পানে চেয়ে রইলাম। প্রথম দেখার রোমাঞ্চিত হরষে সারা দেহমন কেঁপে উঠল।

অবান্তর হলেও বলে রাখি। জীবনে কোন ক্ষেত্রেই নিজের ভারসাম্য কিংবা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে আমি পারিনি। হঠাৎ পুরাণের একটি কাহিনী মনে পড়ে ভীষণ হাসি পেল। অমন অবস্থায় হাসি পাওয়া কিংবা হাসিতে ফেটে পড়া যে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় তা সম্যক্ উপলব্ধি করেও নিজেকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারলাম না। আমার অট্টহাসিতে একমাত্র রামলাল ছাড়া সবাইর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপিত হল। আমার এতাদৃশ আচরণে সবাই কুপিত।

—এ অবস্থায়ও তোর হাসি আসে?

—তা এলে কি করতে পারি বল্।—অনুনয়-ভরা কণ্ঠে সবার রাগ প্রশমিত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভবী ভোলার নয়।

রাগত কণ্ঠে বেণু প্রশ্ন করল—বোকার মত হাসছিস কেন?

—কেন বলছি শোন। বলেই গরম চায়ের পাত্রটি আরাম করে টেনে নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসলাম। শোন্—তোকে একটা গল্প শোনাই।

—মৌনব্রতাবলম্বী ব্রহ্মর্ষি মাণ্ডব্য গভীর তপস্যায় নিমগ্ন। পৃথিবীর সব অস্তিত্ব তাঁর কাছে বিলুপ্ত। সেই সুযোগে কতিপয় চোর অপহৃত দ্রব্যাদি মাণ্ডব্য ঋষির আশ্রমে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা রাজপুরুষগণ কর্তৃক ধৃত হল ও সঙ্গে সঙ্গে চোরভ্রমে মাণ্ডব্য ঋষিও চোরদের সঙ্গে শাস্তি-বিধানহেতু প্রেরিত হলেন রাজদ্বারে। বিচারে শাস্তিবিধান হল মৃত্যু—শূলদণ্ডে। কিন্তু শূলদণ্ডেও মাণ্ডব্য ঋষির মৃত্যু হল না। পরে ঋষির প্রকৃত পরিচয় পেয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে মহারাজ শূল কেটে ফেলার আদেশ দিলেন। কিন্তু শূলের কিছু অংশ, মানে—অণী, ঋষির দেহে থেকে গেল। সেই অবধি তিনি অণীমাণ্ডব্য নামে বিখ্যাত হলেন জগতে। মুক্তি পেয়ে অতঃপর তিনি ধর্মরাজ যমের কাছে গেলেন জানতে যে কি অজ্ঞানকৃত লঘু পাপে এ গুরুদণ্ড! কি কারণে ঋষির এ দুর্ভোগ যাতনা! যমরাজ বললেন—বৎস! তুমি শৈশবে পতঙ্গপুচ্ছে তৃণ প্রবিষ্ট করিয়েছিলে—তাই তোমার এ শাস্তিভোগ।

সবাই শুনছিলেন আগ্রহসহকারে পুরাণের অণীমাণ্ডব্য ঋষির দুর্ভোগের গল্পটি। আজ যদি একটিবার বিধাতাপুরুষের দেখা পেতাম তবে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করতাম—প্রভু, কি অজ্ঞানপ্রসূত লঘুপাপে আমাদের এ গুরুদণ্ড—চড়াই অতিক্রমণের এ দুর্ভোগ! যতদূর মনে পড়ে জ্ঞানত কিংবা অজ্ঞানত কখন কোন পতঙ্গপুচ্ছে কিংবা কোন জীবের কোন অংশে তৃণ কেন সামান্য কোন ক্ষীণতর দ্রব্যটুকুও প্রবিষ্ট করি নাই, তবে আমাদের কেন এ অযথা দুর্ভোগ প্রভু! বেশ ত ছিলাম ঘরের ছেলে ঘরে।

গল্পটি যেন কাঠফাটা দুপুর রোদ্দুরে কোল্ড বিয়ারের এফেক্ট্ এনে দিল সবার মনে। খুসীর মেজাজে বন্ধুবর সবার জন্য আরও এক ভাঁড় করে চায়ের অর্ডার পাশ করে দিলেন নির্বিকার চিত্তে।

নির্বিকার চিত্তে দোকানদার বসে আছে তার ছোট্ট ছাপড়াটায়। পাশে উনুনটাতে টগ বগ করে জল ফুটছে। সব মিলিয়ে শান্ত, সমাহিত, নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশ। কোন তাড়া নেই, প্রতিযোগিতা নেই, কলহ নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই মানুষে মানুষে। এমন সমাহিত অঙ্গীকৃত পরিবেশ শুধু হিমালয়ের বুকেই সম্ভব। এখানে জপের সঙ্গে মিশেছে ধ্যান, ধ্যানের সঙ্গে সমাধি। এক বিমুগ্ধাবস্থায় তন্ময় হয়ে আমার মনে হল এইত আসল আমি—বেদ-এর সন্তান। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বাহক—জ্যোতিষ্মান্ অমৃতস্য পুত্রঃ। নতুন ইতিহাসের স্রষ্টা, নতুন যুগের আলোক-বর্তিকা আমার হাতে। সেই আমি—এই আমি। শুনি ভারতের মর্মবাণী —বেদের অমৃতমন্ত্র। ঐ শুনি বাতাসের তরঙ্গে ভেসে আসে শত শত সামগ কণ্ঠে—অনুষ্টুপ্ ছন্দে সামগান। আমার মনের বীণায় বেজে উঠে ঐকতান, সপ্তসুরের সুরঝংকার। ভৈরব, মালব, সারঙ্গ, হিন্দোল, দীপক, মেঘ—যড়্রাগের বিচিত্রসুরের আলপনা এঁকে দিল আমার মনের গহন অঙ্গনে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার উঠতে হল। রামলাল হাত বাড়িয়ে দেখাল বহুদূরে রূপালী পাতে মোড়া যমুনার সূক্ষ্ম জলধারা। কালো চশমার দৌলতে নজরে এলনা নদীর গতিপথ। রাম-লালের আক্ষেপ উপেক্ষা করেই আবার পথে নামতে হল। সহযাত্রীরা আগেই চলে গেছেন।

এবার শুধু নামার পালা। বেশ নেমে যাচ্ছি তর তর করে, এ পাথর ডিঙিয়ে ও পাথরের পাশ কাটিয়ে। কোন কষ্ট হচ্ছেনা একমাত্র জলকষ্ট ছাড়া। যমুনোত্রীর পথে জলকষ্টই শেষ পর্যন্ত যাত্রীর মনোবল অনেকটা ক্ষুণ্ণ করে দেয়। সারাপথে জল কোথাও

নেই। তাই একসময় না একসময় জলের বোতলের শেষবিন্দুটিও নিঃশেষ হয়ে যায়। শেষ জেনেও তৃষ্ণার্ত যাত্রী একফোঁটা জলবিন্দুর আশায় জলের বোতলটি উপুড় করে মুখের কাছে তুলে ধরেন। তখন আর 'উট চলেছে মুখটি তুলে' পোজে পদব্রজন অসম্ভব। আর উটের মত সুযোগ সুবিধাও যখন ভগবান্ আমাদের দেননি, তখন আর ভাগ্যবান উটের কথা চিন্তা করে লাভটা কি !

মাথা নীচু করে নিজের ভারসাম্য বজায় রেখে পায়ের প্রতি সুদৃষ্টি রেখে নেমে চলেছি নিম্নাভিমুখে—গাংনানির পথে। প্রায় মাইল দশেক হাঁটা হল আজ। তৃষ্ণায় কাতর, অনাহারে ক্লিষ্ট, পথশ্রমে ক্লান্ত যাত্রীদের মনে একমাত্র আশার ঝলকানি— গাংনানি। আশ্রয় মিলবে, খাদ্য মিলবে, বিশ্রামের জন্য ঘরোয়া পরিবেশ মিলবে। অসীম উৎসাহে জোরে জোরে পা ফেলে শেষপর্যন্ত বেলা একটা নাগাদ গাংনানি পৌঁছুলাম।

গাংনানি—হিমালয়ের নিবিড়তর প্রদেশে অবস্থিত ছোট্ট জনপদ। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ী গ্রামটির সমৃদ্ধির দাবী অনস্বীকার্য। ধর্মশালায় স্থান পেতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হল না। এখানে বহু যাত্রীর সমাগম, ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছেন তাঁরা। এখানেই আলাপ হল পাঞ্জাবের দুর্গা বহেনজির সঙ্গে, নেপালের বৃষোধরসিংহ, মহারাষ্ট্রের ডাঃ দাঁতে, গুজরাটের কাঞ্চন বেন ও তাঁর স্বামী বিনায়ক বেন, আসামের প্রফেসর ভূপেন বড়ুয়া। আলাপ ক্রমে ক্রমে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হল স্বল্পকালের একত্রবাসে।

সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বাংলাদল অগ্রণী। এদলে আছি আমি, বেণু, কালীঘাটের মহেশ ভট্যাজ, তার বৃদ্ধা মা, কাশীর বিখ্যাত ছড়িদার দশাশ্বমেধ ঘাটের অবিনাশ সান্যাল আর তার সাঁজোয়া বাহিনী একাদশ রুদ্রাণী। সবাই বিধবা, চলেছেন তীর্থে। একমাত্র চিন্তা —চারধামে চারবার মাথা ঠুকে কোনমতে একবার দেশে ফিরতে

পারলেই হয়, তখন দেখে নেবেন একহাত—মুখরা বাড়ীউলীকে—ওপর থেকে ময়লাজল ফেলার ইয়ারকি বুঝিয়ে দেবেন তখন, কিংবা সময় নেই অসময় নেই বৌর সঙ্গে ছেলের ঘুর ঘুর করে সোহাগ করা!

নিজের কানে শুনেছি গাংনানির ঐ ভুবন-ভোলানো রূপের সামনে দাঁড়িয়ে নকুলের মা অবিনাশবাবুকে বলছেন—আসার আগে নকুলের বৌটাকে পোয়াতি রেখে এসেছি। মনটা ভীষণ অস্থির হয়েছে, আজকেই আমাকে কাশী পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিন নইলে মাথা খুঁড়ে রক্তছিন্নি করবো বলে রাখছি। আমি আর এক পাও নড়ছিনা।

বিচিত্র বাহিনী সঙ্গে এনেছেন আপনভোলা অবিনাশবাবু। তালে বেতাল, বচনে বাচাল। এক একটি বিচিত্ররূপিণী। এক পাগলে রক্ষা নাই, সাত পাগলের মেলা! গাংনানির ধর্মশালার বিচিত্র পরিবেশের স্মৃতি মনে হলে আজও হাসি আসে। আজও মনে পড়ে সেই মা আর মেয়েকে।

মা কাশীর স্বনামখ্যাতা মুখরা নেত্যবালা আর তার সদ্য বিধবা মেয়ে উমা। উমার কাতর মুখখানা আর ছল ছল করা দুটি চোখ আজও যেন চোখ বুজলেই দেখতে পাই। করুণ অশ্রুসিক্ত নীরব চোখদুটির পানে চেয়ে থাকলে পাষাণও বুঝি গলে যায়; কিন্তু নিজের পাষাণী মাকে সে গলাতে পারেনি—এমনি কঠিন মায়ের প্রাণ। স্বামীহারানোর বিয়োগব্যথা নিষ্প্রাণ করে দিয়ে গেছে উমাকে, নীরব করে দিয়েছে তার মনের কথা। তাই বুঝি উমা অমন করে উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে দিগন্তের পানে! অমন রূপও ম্লান হয়ে গেছে ব্যথার কালিমায়। মায়ের শাসনে প্রয়াগে মাথা মুণ্ডন করেছে উমা। মার অবিশ্রান্ত গালাগাল; অভিযোগেও কোনদিন শুনিনি উমাকে জবাব দিতে।

সেদিনও উমা ঠিক অমনি করেই দাঁড়িয়ে ছিল উদাস দৃষ্টি

মেলে। নেত্যবালা স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন দরজায়। শুকনো কাপড়ের কথা একবার কি দুবার হয়ত মেয়েকে বলেছেন, উমা শোনেনি। আর যায় কোথায়! একেই মা মনসা তাতে ধুনোর গন্ধ।

—বলি কিসের দেমাক! কথা কানে ঢোকে না। রূপ! —এই ডুমুরের গরব কর, পাকলে ডুমুর পড়ে মর।

—সত্যি দিদি তোমার ভাগ্যির কথা ভাবলে দুঃখ হয়—ফোড়ন কাটেন সোনারপুরার সোনামুখী। আর যায় কোথা! গরম তেলে নরম বেগুন। তারস্বরে নেত্যবালা সুরু করলেন মেয়ের কেচ্ছা।

কত বল্লাম পই পই করে, অমন হাড়হাভাতে ছোঁড়াটাকে বিয়ে করিস্‌নি করিস্‌নি—তা শুনলি আমার কথা? না—একলা ঘরের গিন্নী হব, চাবি ঝুলিয়ে নাইতে যাব! হল ত? গেল ত দেমাক! কাঙালের কথা বাসি হলে মিঠে লাগে। তা আমার কথা শুনবেন কেন পটের বিবি? অমন ভালবাসার মুখে ঝাঁটা মারি! কত শত গেল রথা, শ্যাওড়াতলার চক্কোত্তি।—বলেই ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে নতুন শক্তি সঞ্চয় করে নিলেন নেত্যবালা।

সোনামুখী তাড়াতাড়ি সমবেদনার সুরে বললেন—খালি পেটে জল খেতে নেই দিদি, দুটো বাতাসাই না হয় মুখে দাও। সন্তানের মার খালি পেটে জল খেতে নেই যে গো।

—সন্তানের নিকুচি করি। অমন সন্তানের আবার মা। কথায় আছে কানা পুতে পোষে, আর পেটের মেয়ে শোষে। তা বছর না যেতেই শাঁখা ভেঙ্গে, সিঁদুর মুছে ত এলি এই নেত্যবালার কাছে! কাঁড়ি কাঁড়ি দুবেলা বসে খাওয়াব—তা কথা শোনাব না! বলি—কড়ি দিয়ে কিনব দই, গোয়ালিনী মোর কিসের সই! সত্যি কথা বলতে নেত্যবামনি ভয় পায় না। তা মেয়েই হোক আর ব্যাটার বৌ হোক—কাউকে ছাড়বনা। খাই দাই ভুলিনি,

তত্ত্বকথা ছাড়িনি। কলিকালে কে শোনে কার কথা দিদি, বকে মরাই সার। কথায় বলে—কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে।

ততক্ষণে আশে পাশে আরও দু চারজন বামুন জড় হয়েছেন। আহা, উহু, প্রভৃতি নানা শব্দে নেত্যবালা কিছুটা ধাতস্থা হলেন। উমা কিন্তু নির্বাক নিশ্চল।

—দেখলে, দেখলে, মেয়ের দেমাক দেখলে! রাগ করেছেন বিদ্যাধরী। একুশ কোড়া গুণে খান, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান।

মেয়ে মূর্ছা গেছেন কিনা দেখিনি কিন্তু মালিকের মূর্ছা যাবার উপক্রম লক্ষ্য করে বেচারী রামলাল বিছানা পেতে দিয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নেবার জন্য আমাকে বার বার কাতর অনুরোধ জানিয়ে গেল। গাংনানি পৌঁছেই যে দৃশ্য দেখলাম তা থেকে একমাত্র নিষ্কৃতির উপায় নিদ্রা কিংবা গোটা কয়েক অ্যাসপ্রোর গুলি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বেশ খানিকটা মৌজ করে দিবানিদ্রা দিয়ে উঠলাম। শরীর ও মন দুটোই বেশ তাজা, আগামী পথযাত্রার জন্য প্রস্তুত। গাংনানির ধর্মশালার বেশ কিছুটা নীচে যমুনা বয়ে চলেছেন কলস্বরে। ছোট গ্রাম গাংনানি, ছোট তার পরিবেশ কিন্তু উদার বিস্তৃত তার পটভূমিকা।

নদীর অপর পারেই রাজতা যাবার সর্পিল বনপথ। কাঠ-চেরাই ও কাঠের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত রাজতা। শুনলাম লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ নাকি এখান থেকে ভাসিয়ে দেওয়া হয় নিম্নভূমির উদ্দেশে। আসল মালিক নদীর জল থেকে আপন আপন মাল সংগ্রহ করে নেন। এ ভাবেই এখানকার কাঠ চেরাই ব্যবসা চলে সারা বছর ব্যাপী।

শান্ত, সমাহিত পরিবেশ। সবুজ বনানী, টিয়ারঙ গুল্মলতার ঝোপ, পাখীর কাকলী আর শ্রবন্তীর এই অবিশ্রান্ত স্রোতধারা মনকে উদাস করে তোলে। নদীর পারে উপলখণ্ডের ওপর

বসেছিলাম আপন মনে। সমস্ত পৃথিবী সমস্ত কলকোলাহল চেতনায় সম্পূর্ণ ঝাপসা হয়ে গেছে, সব-কিছু একাকার হয়ে গেছে দিক্‌চক্রবালে। আঁধার এখনও নেমে আসেনি গাংনানির সীমানাতে। সায়ন্তন সূর্যের অন্তিম আবীর রঙ ছড়িয়ে পড়েছে বনানীর শীর্ষদেশে আর নদীর কালো জলে।

একটি তন্বী যুবতী আপন মনে নদীর শীতল জলে স্নান করছে, আনন্দে হাসিতে আর খুসীতে প্রগল্‌ভা, উচ্ছলা এক মায়াবিনী। প্রায়ান্ধকার ছায়ার আবছা আলোয় চিনলাম স্নানার্থিনীকে—যাযাবরী সরবতিয়া।

একা একা পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম—অনেকক্ষণ। রাজতার বনপথ, নদীর উচ্ছল গতিবেগ, মন্দিরে আরাধনার গম্ভীর মঙ্গল-ধ্বনিতে আস্তে আস্তে আবার মনের উচ্ছৃঙ্খল জোয়ারের গতি পরিবর্তিত হোল।

রাত্রি সমাগমে আস্তানায় ফিরে দেখি ধর্মশালার সামনে বিরাট ভীড় জমায়েত হয়েছে। গ্যাসের বাতি জ্বলছে। সবাই উদ্‌গ্রীব আগ্রহে দেখছে যাযাবরীর নৃত্যচপল চঞ্চল পদসঞ্চার, নিটোল দেহভঙ্গী আর চপল কুটিল কটাক্ষ। সরবতিয়া নাচে, তিলাইয়া হারমোনিয়াম বাজায়, আর শিশুটা চটিওয়ালার বারান্দায় শুয়ে শুয়ে কাঁদে।

পালিয়ে এলাম তাড়াতাড়ি ধর্মশালার ছোট্ট কামরাটিতে। রামলাল ভাত চড়িয়েছে, বেণু শুয়ে শুয়ে পড়ছে হাণ্ট সাহেবের লেখা 'দি এ্যাসেণ্ট অব এভারেস্ট'। কীর্তিদৎ অনুপস্থিত। আমাকে দেখেই দুজনার মুখে হাসি ফুটল।

—হিয়ার কামস্‌ দি ইমিটেটিং ফিলসফার। বলেই ওপাশ ফিরে বন্ধুবর গভীরভাবে বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করলেন।

রামলাল হাসছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম—বাদে কীর্তিদৎ। বাঁশী নিয়ে সে বাইরে চলে গেল, আমরা নিদ্রার আয়োজন করলাম।

॥ ১৪ ॥

পথ, পথ, শুধু পথ। শেষ নেই—শুধু চলেছে আর চলেছে। তবে এ পথ একঘেয়েমির পথ নয়, ভবঘুরেমির নয়। এতে আছে ছায়া—আছে রোমাঞ্চ, আছে পাখীর কলতান। অতি প্রত্যূষে আবার পদব্রজন সুরু হল। গাংনানি পিছনে পড়ে রইল—সামনে খাড়ালী, তিন মাইল দূরে। গভীর পাইন বীথিকার ভিতর দিয়ে গেছে খাড়ালীর পথ। রাস্তা—সমান্তরাল, বেশ চলছিলাম ছায়াপথ দিয়ে। ভোরের কুয়াসা, প্রভাত পাখীর গান আর যমুনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পথ চলা। বেশ লাগছিল মনের এ প্রশান্ত ধ্যানটি।

তিন মাইলের মাথায় এল খাড়ালী—একটি কি দুটি চায়ের দোকান সম্বল। অতি জীর্ণ পরিবেশ। এক টুকরো কাঠকে আরও গোটা কয়েক কাঠের সাহায্যে আড়াআড়ি পেতে করা হয়েছে যাত্রীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা। বেশ কায়দা-কানুন জানেন চা-ওয়ালা। আমাদের চারজনকে আলাদা আলাদা করে তিনবার সেলাম ঠুকলেন। আমরা স্মিতহাস্যে গার্ড অফ অনার গ্রহণ করলাম। কিন্তু, রামলালকে একটু মনঃক্ষুণ্ণ বোধ হল।

চা-ওয়ালা জিজ্ঞেস করল—চা না দুধ ?

বেণু জবাব দিল—দুটোই।

ছোট্ট দোকানটির একপাশে উনান, আরেক পাশে কয়েকটা ঝকঝকে করে মাজা পিতলের থালা বাটি গ্লাস উপুড় করা, আর ঈশান, নৈঋত অগ্নি বায়ু চারকোণে চারটি সিনেমা অভিনেত্রীর ছবি—ব্রুকবণ্ড চায়ের প্রশংসায় সস্মিতা, হাতে চায়ের পাত্র। চা-ওয়ালার রুচিবোধ আছে। পরিবেশের কারণে রুচির কোন তারতম্য ঘটেনি।

সাহারার বুকে মৃগতৃষ্ণার কথা শুনেছি। কিন্তু, এ কোন্ মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছি ? কেন এলাম এ দুর্গম, মার্তণ্ডদগ্ধ, দুস্তর

পাকদণ্ডীর মায়াজালে? কিসের আশায়—আত্মপ্রসাদ না আত্মগর্ব! নানা ভাবনায় মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে বার বার।

কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও পথ চলা ক্ষান্ত হয় না। পথের বাঁকেই দেখি যমুনাচটি—কালো যমুনার কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে কর্মমুখর এক পাহাড়ী বস্তী। কালীকম্বলির ধর্মশালা আছে, দু-পাঁচটা দোকান পসার আছে, চটিতে প্রাণচঞ্চলতার ইঙ্গিত আছে। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে রমণীয় যমুনাচটি। ধর্মশালায় পৌঁছেই বিছানা বিছিয়ে দিয়ে রান্নার কাজে লেগে গেল রামলাল।

সামান্য একটু দিবানিদ্রার পর স্নান সেরে আলুর ঝোল আর ভাত খেয়ে নতুন শক্তি সঞ্চার করে আবার পথচলা—একটানা আট মাইল পথ। যমুনা নদীর পুল পেরিয়ে পথে নেমে এলাম। আজকে সন্ধ্যার আগেই হনুমান চটি পৌঁছানো চাই। সেখানে মিলবে রাত্রিবাসের আশ্রয় ও খাদ্য।

কখন যমুনা বাঁয়ে কখন ডাইনে, তারপর অকস্মাৎ মিলিয়ে গেলেন পাহাড়ের দুর্গম অজানা কন্দরে। চলেছি নতুন উৎসাহে নতুন উদ্দীপনায়, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে চলা স্তিমিত হয়ে আসছে দারুণ জলকষ্টে। মাঝে মাঝে মনে হত এ সব বিছানাপত্র রামলালের কাঁধে না চাপিয়ে যদি বিরাট একটা আলিবাবা টাইপের জলের জালা নিয়ে আসতে পারতাম তবে অনেক সুগম হত এ দুর্গম পথ।

বেশ শীতের আমেজ অনুভব করছি বাতাসে। বেশ ভাল করে মাফলারটা জড়িয়ে নিলাম গলায় আর কানে। কিন্তু কানের আর দোষ কি! যে দৃশ্য দেখলাম সামনে তাতে কান গরমে লাল, চক্ষু ছানাবড়া হয়ে উঠলো এক নিমেষে। সারা আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে এক গগনচুম্বী উদ্ধত চড়াই—মানুষের চলচ্ছক্তির সীমানা লঙ্ঘন করে গেছে এ অমানুষিক, দুর্গম, দুরতিক্রম্য গিরিশৃঙ্গ। মন ভেঙ্গে পড়ে—কত আর পরীক্ষা দেব বারে বারে, এ কৃচ্ছ্রসাধন কি কোনদিন শেষ হবে না?

পাহাড়ের পাদদেশে সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, সবাই স্তম্ভিত। এ যেন আর এক চরম পরীক্ষা। জয় যমুনা মাইয়া কি জয়—বলে প্রথম রামলালই নেমে পড়ল পথে, কাঁধে মণদেড়েক ওজনের দুর্বহ বোঝা। শরীর ভাল লাগছে না—হাত কাঁপছে, পা টলছে, চোখ জলে ভিজে আসছে, গলা শুকিয়ে আসছে। মনে মনে বুঝি সেদিন সত্যই আকুল ভাবে ডেকেছিলাম ঈশ্বরকে।

আকাশে মেঘ জমেছে। রৌদ্রের দারুণ তাপ দাহন নেই। পথ গিয়েছে এঁকে বেঁকে পাইনগাছের বিলম্বিত ছায়ার নীচে নীচে। পথে দেখা হল অবিনাশবাবু ও তাঁর একাদশ রুদ্রাণীর সঙ্গে। অবিনাশবাবু মৌজ করে গয়ার তামাকে ছিলিম ভরেছেন—শুধু টানার অপেক্ষা। কল্কেতে আগুনটা জ্বললেই হয় ঠিকভাবে।

উমা একা দাঁড়িয়ে আছে পথপ্রান্তে উদাস দৃষ্টি মেলে। একাদশী সমস্বরে জুড়ে দিয়েছেন কান্নার ঐকতান, সঙ্গে চলেছে অবিশ্রান্ত গালাগাল। এ সুবাদে কেউ বাদ পড়েননি—কাশীর—রাণাঘাটের মহেশ পাণ্ডা, সান্যাল মশাই থেকে সুরু করে শিব, দুর্গা, কালী, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মীনারায়ণ কেউ বাদ পড়লেন না এ পংক্তি ভোজনে। এমনকি গাংনানির চটিওয়ালাটা পর্যন্ত। আধসেরের ওজনে আধছটাক চাল কম দেওয়া—একি চাট্টিখানি কথা হল! অখণ্ড নরকবাস যে অনিবার্য—দি এণ্ড, সে সম্বন্ধে জুরিরা প্রত্যেকেই একমত।

দারুণ দুঃখেও হাসি এল। তবু থামলে চলবে না—তাই চলেছি। ক্ষণিকের প্রশ্রয়ে মন অধিকতর পঙ্গু হয়ে যাবে—জানি। সামনের চটিতে আবার এদের দেখা মিলবে, অপেক্ষা না করেই সামনে এগিয়ে গেলাম।

ছোট্ট একটি চায়ের দোকান। বেশ আরাম করে এক ভাঁড় চা খেয়ে শরীরটাকে আবার বাগে নিয়ে এলাম। চটির নাম

উঞ্জলি। এক বিচিত্র পরিবেশের মাঝখানে মনের সব দুঃখ দৈন্য, এই সুদীর্ঘ ক্লেশকর পথাতিক্রমণ মনে হল যেন দিবাস্বপ্ন। পিছনের ঐ খাড়া চড়াইএর পিছনেই স্তব্ধ হল মনের যত কান্না, হারিয়ে গেল পথের যত দুঃখ। চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, আর পাইনগাছের ছায়াসুনিবিড় গভীর অরণ্যরাজি। এক নীরন্ধ্র নিথর নিস্তব্ধতা, শুধু কাঠঠোকরার একটানা ঠক্ ঠক্ ঠক্ আওয়াজ যেন আরও গভীর করে তুলেছে এ আরণ্যক আবহাওয়াকে।

এর পরের পথ উৎরাই পথ। মন প্রশান্তিতে কানায় কানায় উপচে উঠল। আবার পথে নেমে এলাম। সারা পথে কত ফুলের বাগিচা আর প্রজাপতির মেলা। কত রং, কত বাহার। সাদা, লাল, নীল, সবুজ, সরষে, হলুদ আর বেগুনী রঙের জাল পেতেছে যেন প্রকৃতি। প্রকৃতির বুকে রঙের আগুন লেগেছে, প্রজাপতির দল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে রঙের নেশায়, কত বিচিত্র রং কত না বিচিত্র আলপনা আঁকা তাদের হাল্কা রঙ্গীন পাখায়। মৌমাছির মধু গুঞ্জন শুনি, পাইনগাছের শাখে শাখে দেখি কত মৌচাক—মধুর ভরে টইটম্বুর।

পথ চলি আর ভাবি। বিস্মৃত অতীতের সব স্মৃতির আলেখ্য যেন আবছা হয়ে এল। মনে হল সব মুছে গেছে। শুধু আমি একা—আর কেউ কোথাও নেই।

শুকনো পাতা বিছান পথ আর বনফুলে ছাওয়া পথিপার্শ্ব—শুনি পাখীর কূজন। সন্ধ্যা সমাগত। আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম নৈশচটির উদ্দেশে।

সারাদিনে দীর্ঘ ষোল মাইল পথ অতিক্রমণের পর এল হনুমান চটি। আশ্রয় মিলল, রাতের খাদ্য মিলল, শীত নিবারণের জন্য কাঠ মিলল, সব মিলল, শুধু মিটল না আমার মনের হতাশা। শুধু কি পথের দুর্গমতার কথাই স্মরণ করব সারাজীবন? শুধু কি চড়াই বিজয়ের গৌরব, পথাতিক্রমণের দুর্বার অভিযানের রোমাঞ্চকর

আনন্দই ছিল আমার বুভুক্ষিত আত্মার কাতর প্রত্যাশা? কোথায় সে বিমুগ্ধ আত্মার পরম প্রশান্তি? কোথায় আমার সে জীবন-জিজ্ঞাসার চরম উত্তর—তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি? একটা অহেতুক অভিমানে বুকটা ভরে রইল।

কিছুতেই ঘুম আসছে না। রাতের প্রহর পার হয়ে যায়। সারাজীবনে একদিনে এতটা পথ হেঁটেছি বলে মনে পড়ে না, কিন্তু এত পথশ্রমের পরও ঘুম এল না পোড়া চোখদুটোয়। দারুণ অবসাদে পায়ের পেশীগুলো যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে একবার এপাশ, একবার ওপাশ করছি। সমস্ত পার্বত্য-ভূমি ঘুমিয়ে পড়েছে, ধর্মশালা নিস্তব্ধ। শুধু একা জেগে প্রহর গুনি আর শুনি ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা একঘেয়ে অশ্রান্ত আওয়াজ। ঘুম আসে না।

বাইরে এলাম। বেশ হাড়-কাঁপানো শীত। গরম চাদরটাই আরও ভাল করে জড়িয়ে নিলাম সারা অঙ্গে। বাইরের আকাশ আলোয় আলোময় চাঁদের জোছনায়। আলোর বন্যায় ইন্দ্রধনুর রঙের ছটা জেগেছে তুহিন পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। কত বিচিত্র রাতজাগা পাখীর ডাক, নদীর কলরোল, সোঁ সোঁ করা পাগলা হাওয়ার গভীর গর্জন। সেই ঐকতানে আমার ছিঁচকাঁদুনে মনের সকল গঞ্জনা নিঃশেষে ডুবে গেল। মুহূর্তকাল পূর্বে যে গভীর আত্মজিজ্ঞাসায় অমন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম, তার যে কোন সন্তোষপ্রদ উত্তর পাওয়া যায়নি সে কথাটাও মনে রইল না।

চটির বারান্দায় আবছা অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে কত যাত্রী। সব ছাপিয়ে ঘরের নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে সুরু হয়েছে সমবেত নাসিকা গর্জন। নানা ঢং নানা সুর—মীড়, গমক ও মূর্ছনার একত্রিত কনসার্ট। নাক ডাকারও যে বিভিন্ন স্বরগ্রাম আছে, নানা ঘরানা আছে—তা সম্যক্ উপলব্ধি করেছি গভীর রাতে ধর্মশালায় একলা জেগে জেগে। দুর্গম এই পদযাত্রার পুণ্যটুকু হয়ত এককালে নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে

কিন্তু এই উপলব্ধি স্মরণে থাকবে চিরকাল। অথচ একটু আগেই চটিতে পৌঁছে এই জনতার যে চেহারা দেখেছিলাম তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। যেন নানা দেশের নানা জাতের মেলা বসেছে চটির অঙ্গনে। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, তামিল, তেলেগু, বাঙ্গালী, আসামী, বিহারী, গাড়োয়ালী, নেপালী, মারাঠী, কাশ্মীরী আর গুজরাটী। নানা ভাষায়, নানা কথায়, বিচিত্র কলহ আর কোলাহলে সরগরম হয়েছে ধর্মশালার আবহাওয়া। একটু সুবিধা একটু সুখের জন্য কত না মনোমালিন্য, বচসা, ঝগড়া। আবার পথচলা সুরু হলেই থেমে যায় দ্বন্দ্ব, ফুরিয়ে যায় বচসা, মিটে যায় মনের যত ভুলবোঝাবুঝি।

জীবনের এই অপরিসর পান্থশালার দ্বারে কত যাত্রী এল, কত মুসাফির চলে গেল! কাউকে ভুলিনি। তোমরাই আমার জীবনে নতুন করে এনে দিয়েছ পথাতিক্রমণের প্রেরণা, জ্বেলে দিয়েছ নতুন আলোর মশাল! সে ক্ষণটুকু হোকনা কেন ক্ষণিকের, তবুও আমি জানি আমাদের এ মিলনের কথা কোনদিন ভুলবে না এ তুহিনাদ্রির অনন্ত হিমগিরিশ্রেণী, এ আকাশ, এ বাতাস, এ ঝরণার কলোচ্ছ্বাস। জীবনে মানুষ চেনার এ পরম লগ্ন কোনদিন ব্যর্থ হবার নয়।

বিনিদ্র রজনীর দূরত্ব থেকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম নিদ্রিত যাত্রীদের মুখচ্ছবি। একটু আগেই না এখানে যেন রথের মেলা বসেছিল, কত সুখ, কত দুঃখের কথা, কত পরনিন্দা কত পরচর্চা! গরম তেলের মার্জনা চলছিল অবসাদগ্রস্ত পদযুগলে আর সঙ্গে সঙ্গে আহা, উহু, গেছিরে, মরলাম রে বাবা—এমনি ধারা কত বিলাপ আলাপ আর প্রলাপে মুখরিত ছিল ধর্মশালার অঙ্গন। এখন আবার সেই আকাঙ্ক্ষিত গভীর নিস্তব্ধতায় নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হল।

তিন চার জন গাড়োয়ালী কুলি কোণের বড় পাইন গাছটার নীচে বসে আগুন পোহাচ্ছিল মৌজ করে। আর ঐ দূরের পাথরটাতে

বসে কষে তামাক টানছেন কাশীর অবিনাশবাবু—বুড়ীদের ছড়িদার। ভুড়ুৎ ভুড়ুৎ তামাক টানছেন আর চোখ বুজে গান ধরেছেন—'ললিতে ও ললিতে, অঙ্গ জ্বলে কৃষ্ণ-পিরীতে'।

বড় ভাল মানুষ আমাদের সান্যালমশাই। কারও কথায় নেই, কারও ভালোয় নেই মন্দে নেই, নির্বিকার নিশ্চিন্ত। আপনমনে তামাক টানেন আর বুড়ীদের নালিশ এক কান দিয়ে শোনেন আর অপরটি ব্যবহার করেন অপরিস্রুত কথার স্রোত নিষ্ক্রামণে। দেখা হলেই বলবেন—তামাক ইচ্ছা করেন? বড় ভাল তামাক দাদা, একেবারে খাস লক্ষ্ণৌর গোলাপ জলে ভেজান গয়ার অম্বুরী তামাক। আমাদের রাণামহলের পরেশবাবুর বেয়াই থাকেন গয়ায়—তাঁকে দিয়েই আনানো মশাই। একবার টেনেই দেখুন না। আসার সময় গায়ের গরম কোটটা ভুলে ফেলে এসেছি মশাই, কিন্তু ঠিক ম্যানেজ করে এনেছি গয়ার অম্বুরী তামাকের পুঁটুলিটি।

যতটা জেনেছি, যতটা বুঝেছি, তাতে আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, জীবনের চলার পথে আসল জায়গাতেই অবিনাশবাবু ঠিক ম্যানেজ করতে পারেননি। দুনিয়াতে কেউ নেই সান্যালমশাইর, একমাত্র সাধের ভোটকম্বলটি ছাড়া। আপনভোলা মানুষ আপন খেয়াল-খুসী আর গানের মাঝেই ভুলিয়ে রাখেন নিজেকে।

রাতের প্রহর এগিয়ে চলে সমাপ্তির সীমানায়। নিজের শয্যায় ফিরে এলাম। সবাই অঘোরে নিদ্রিত, হঠাৎ নজর পড়ল যে কীর্তির শয্যা শূন্য। কীর্তিদৎ নেই। কোথায় গেল এত রাত্রিতে! অনির্দেশ্য ভাবে সামান্য উদ্বেগ বোধ করলাম। হঠাৎ শুনলাম নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দূরে নূপুরের ঝংকার বঙ্কিম বিস্তারে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। রাতের অভিসারিকার দ্রুত সন্ত্রস্ত পদসঞ্চার। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরান্তরে। মনটা সন্দেহে বিষিয়ে উঠল।

ঘরের কোণে টিম্ টিমে আলোটাও একসময়ে নিভে গেল। অন্ধকার—গভীর অন্ধকারে কারারুদ্ধ মনে হল নিজেকে, কপালে

দেখা দিল ফোঁটা ফোঁটা স্বেদবিন্দু। কম্বলটা পায়ের কাছে সরিয়ে রাখলাম। কুৎসিত ভাবনায় আর সন্দেহে অসহ্য লাগছিল প্রতিটি মুহূর্ত।

ভাবতে ভাবতে খানিকটা তন্দ্রা এসেছিল ক্লান্ত চোখে। খুট করে সামান্য একটু শব্দ হল বারান্দায়। তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। ধীরে ধীরে চোরের মত চুপি চুপি আসছে কীর্তিদৎ।

বাইরে তখনও চলেছে শীতের হাওয়ার ক্রুদ্ধ ফোঁসফোঁসানি। রাত শেষ হতে তখনও প্রহর খানেক বাকী! অনিদ্রায় যে কী বিশ্বগ্রাসী হতাশা, কী অবিশ্বাস্য যন্ত্রণা তা সেদিন আমি প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করেছিলাম চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, দেহের শিরা উপশিরায়!

ভোর হবার অনেক আগেই হনুমান চটির নিদ্রিত ধর্মশালায় প্রাণবন্যা ফিরে এল, যেন যুগপৎ সবাইএর ঘুম ভেঙ্গে গেছে। মুহূর্তেই পড়ে গেল সাজ সাজ রব। হৈ হল্লা। নতুন করে আবার নিজেকে গুছিয়ে নিলাম নিজের বিবেকের কাছে। ভুল দেখেছি, ভুল শুনেছি আমি। সব মিথ্যা, মায়াবিনী রজনীর প্রহেলিকা। এ সত্যের অপহ্নুতি—মিথ্যার কুয়াসায় ঢাকা!

ভোর হোয়ে এল। মৌচাকে যেন ঢিল পড়েছে। সবাই কর্ম-চঞ্চল—নতুন আশার দীপ্তিতে ভাস্বর তাদের চোখ, উজ্জ্বল তাদের মুখমণ্ডল। প্রথম অঙ্কের আজই হবে পরিসমাপ্তি; আজকের যাত্রাশেষেই—যমুনোত্রী।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাতহাজার ফিটের উপরে এসেছি। বেশ কনকনে শীত। চোখের নিমেষে বিছানাপত্র সব বাঁধা হয়ে গেছে, এক ভাঁড় করে গরম চা নামক পানীয়ও ঢক ঢক করে গলাধঃকরণ করা হয়ে গেল। বাইরে তখনও ঘন কুয়াসার আস্তরণ। শীতে সবাই ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। পথে নেমে এলাম। যম্‌না মাইয়ার জয়ধ্বনি করা হল বার তিনেক, কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শীতের চোটে কিছুই বের হল না পোড়া কণ্ঠনালী থেকে—খানিকটা বিকৃত অবোধ্য আওয়াজ ছাড়া।

পথ চলছি। ভোরের শুকতারা তখনও পূব আকাশে জ্বল্ জ্বল্ করছে। কঠিন প্রাচীরের গায়ে দীপ্ত কুয়াসার শুভ্র উত্তরীয়। সংমূঢ়ের মত বিভোর হয়ে চলছিলাম। মনে হল দূর বহুদূর থেকে যেন ভেসে আসছে মেঘের মৃদঙ্গ মন্দ্র—এক অপূর্ব মঙ্গলগীতি, ঋত্বিক্ কণ্ঠে বেদের অমৃত গান। ক্ষয়িষ্ণু মানবের বক্ষপঞ্জর ভেদ করে মনের অবচেতনায় যেন পশেছে রবির কর, এসেছে নতুন আলোর বন্যা।

চার মাইলের মাথায় খড়শালী—যমুনোত্রীর পথে শেষ উপনিবেশ। খড়শালীর পথে যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখেছিলাম, সে আনন্দের ইংগিতে দুর্গম পথও অতিক্রম করে গেছি অনায়াসে। তার তুলনা কোথাও নেই এ সংসারে। কাঠগোলাপ আর কিংশুক, রডডেনড্রোন আর রঙণফুলে ছাওয়া বনভূমি। কত রং কত বাহার! সবুজ বনের বিলম্বিত ছায়া আর নদীর ঐ ঘুম-পাড়ানি গান পথক্লান্ত পথিককে ভুলিয়ে দেয় পথাতিক্রমণের দুঃসহ কষ্ট, নিরাময় করে দেয় চেতনার সব দুঃখের ক্ষত। প্রভাত আলোর স্নিগ্ধ পরশে মনের সব অন্ধকার দূর হয়ে গেল। দীর্ঘ রোগযন্ত্রণার পর যেন অকস্মাৎ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। মনের অচলায়তনের দ্বার আজ উন্মুক্ত। এত আলো, এমন আলোর ছটা, এমন আলোয় ভরা ভুবন—কই আগে ত কখনও দেখিনি! আলোর ঝরণাধারা নেমে এসেছে আকাশ থেকে, নেমে এসেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। এ আলোর ধারা উদ্ধত নয়—শান্ত, উচ্ছৃঙ্খল নয়—তবুও মুক্ত, চোখ-ধাঁধাঁনো নয়—আনন্দময়। যেন চিরতরে অন্ধকারের বন্ধন মোচন করে দিয়ে এসেছে এ মুক্তধারা—আলোর বন্যা!

নতুন হোমাগ্নির আলোয় মৃত মন যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। এইতো সেই চিদাত্মা হিমালয়—জগৎ পারাপারের মাঝখানে ঋজু ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে বলিষ্ঠ অনিন্দ্যসুন্দর, যেন যুগপৎ বিধৃত সত্য, শিব ও সুন্দর।

সূর্যস্নাত প্রভাতবেলায় তোমাকে সত্তা পূর্ণ করে দেখি, অশ্রুর

অঞ্জলি নিয়ে তোমারই বন্দনা করি। মন্ত্র জানি না, তন্ত্র জানি না, আবাহন জানি না, বিসর্জন জানি না, কিন্তু মন বলছে বার বার— উজাড় করে দে নিজেকে, বিলিয়ে দে আপনাকে, ভুলে যা নিজের আত্মঅহঙ্কার—মিথ্যা শিক্ষার অভিমান।

এমন ডাক শুনবার যে আদৌ অধিকার আছে, এতকাল তা জানা ছিল না, এমন ডাকে যে কোনকালে কণামাত্র উদ্বেলিত হতে পারি কিছুকাল আগে পর্যন্তও তা পরিহাস মাত্র ছিল। কিন্তু হিমালয়ের প্রভাতে যাদু আছে,—বাস্তবধর্মীকে সে অনায়াসেই ভাবুক করে তোলে, চোখের নিমেষে সংশয়ীকে সাধক করে দেয়!

নতুন প্রভাতের নতুন আলোয় অবগাহন করে যেন জীবন ধন্য হল। এমন সংকীর্ণ চেতনায় অমন উচ্ছ্বাসের পরিসর কোথায়? বার বার চক্ষু কেবলই বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগলো। ইচ্ছে হল চীৎকার করে কাঁদি, চীৎকার করে ডেকে বলি—আমাকে কলুষমুক্ত কর, মনের অন্ধকার ঘুচিয়ে দাও!

সবাইর জোড়া জোড়া চোখ আজ নিশ্চিত প্রতিশ্রুতিতে সমুজ্জ্বল, আশার আলোয় দীপ্ত—কারণ লক্ষ্য নিকটবর্তী, আর একটু পথ বাকি। রাতের কুয়াসা ভোরের আলোয় ফিকে হয়ে আসছে। উজ্জ্বল উত্তরীয়ের আড়ালে অভ্রংলিহ তুষারমণ্ডিত গিরিমালা প্রবুদ্ধ আত্মার একমাত্র জপমালা—একমাত্র জীমূতমন্দ্র গম্ভীর ওঙ্কার ধ্বনি!

সবারই চোখে জল—পথকষ্টে নয়, অসীমের সান্নিধ্যে আসার আনন্দে! আর পারছে না তবু সবাই হাসিমুখে কঠিন চড়াই অস্বীকার করে চলেছে যমুনোত্রীর দুর্গম পথ বেয়ে। কারও পায়ে দগদগে ঘা, কারও পা ফুলেছে, কারও পা পাথরের ঘায়ে ঘায়ে শতবিদীর্ণ—তবুও সবাই আনন্দে আত্মহারা। ঐ দেখা যায় দূরে যমুনোত্রীর তুষারধবল গিরিশ্রেণী। বিচ্ছিন্নভাবে শত শত কণ্ঠের আকুল বন্দনাধ্বনি শোনা যায়, পাহাড়ের কন্দর থেকে ভেসে আসে— শাশ্বত চেতনার চিরন্তন প্রতিধ্বনি!

নতুন সূর্যের আলোয় গিরিশৃঙ্গ ঝলমল করে উঠেছে। আকাশে নব আশার মেঘদূত। সম্পূর্ণ বিমুগ্ধ অবস্থায় পথ বেয়ে চলেছি। কেউ কোথাও নেই, শুধু একা আমি, আর শুধু পথ—দিগন্তের হাতছানিতে চলেছে এঁকে বেঁকে—সীমাহীন, অন্তহীন, অসীমের উদ্দেশে। শুধু ধৈর্য আর স্থৈর্য, শুধু বৈরাগ্য আর তিতিক্ষাই এ পথের একমাত্র পাথেয়। এ দুর্গম পথই একমাত্র সত্যের পথ, জ্ঞানের পথ, মুক্তির পথ!

স্বপ্নের ভেতর দিয়েই পূর্ণ হতে চলেছে এতকালের সব আকৃতি সব কাকুতি। আর দেরী নেই, আর একমাইল বাদে খড়শালী—তারপর জানকীমাই চটি, তারপরেই দীর্ঘ পথযাত্রার সমাপ্তি—পথ-কষ্টের পূর্ণ পুরস্কার যমুনোত্রী!

এলাম খড়শালী। এল যমুনা। নদীর দুই পারে দুটি জনপদ—খড়শালী আর বিপগাঁও। খড়শালী হল যমুনোত্রীর পাণ্ডাদের শীতকালীন আবাসভূমি। অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন এবং ততোধিক কর্মচঞ্চল। বিপগাঁওর প্রাচীন নাম তীর্থ মার্কণ্ডেয়। এখানকার উষ্ণ প্রস্রবণটি ক্লান্ত যাত্রীদের অবসাদগ্রস্ত শরীরে এনে দেয় নতুন আশার ইংগিত। এখানে যমুনার গতি ভীষণা, রুদ্রা, ভয়ঙ্করা। চণ্ডালিকা রুদ্রাণীর বেশ যমুনার, যৌবনমদে মত্তা, প্রাণবেগে উদ্বেল।

দূরে দেখা যায় তুষারমণ্ডিত শুভ্র বন্দরপুঞ্চ গিরিশৃঙ্গ। যমুনোত্রীর আর মাত্র চার মাইল বাকি। সব কিছুই যেন অবিশ্বাস্য মনে হ'ল। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যমুনোত্রী এত কাছে। এই অধমের থেকে আর মাত্র চার মাইল দূরে। এই সমাহিত অবস্থায় কিন্তু গর্ব করে বলবার কিছু নেই, অমন পরিবেশে বৈষয়িক বুদ্ধিটুকু অটুট রাখাই হয়ত চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিজ্ঞাপক হত, কিন্তু সেই দৃঢ়তা এই মরজীবনে কোথায়?

যমুনার তীর ঘেঁসে চলে গেছে পায়ে হাঁটা পথরেখা। সম্পূর্ণ

বিমুগ্ধাবস্থায় পথ চলছি। তবে এই মরজীবনে অমন ভাববিমুগ্ধ বিলাসিতার অবকাশও সামান্য।

অকস্মাৎ দেখি, চোখের প্রসারিত দৃষ্টি প্রতিরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে অনাদি অনন্তকালের সাক্ষী প্রাগৈতিহাসিক এক বিরাট প্রস্তর প্রাচীর। অলঙ্ঘনীয় দুরারোহ চড়াই। সারা দেহ কেঁপে উঠল দারুণ হতাশায়, দারুণতর বিতৃষ্ণায়। খুসীর ফানুস এক নিমেষেই চুপসে এতটুকু হয়ে গেল! সমস্ত শক্তি এক লহমায় নিঃশেষিত হয়ে গেল! আর শক্তি নেই, আর সাহস নেই, বুকে বল নেই, কিছু নেই। দারুণ হতাশায় রুক্ষ পথের শুকনো পাতার উপর বসে পড়লাম, হাত থেকে দূরে ছিটকে পড়ল লাঠিটি।

এত ধৈর্য এত অর্থব্যয় সবই বুঝি ব্যর্থ হল! এরপর হতাশার বোঝা বয়ে বেড়াব চিরকাল। নিছক পণ্ডশ্রম—একমাত্র পুরস্কার হবে চূড়ান্ত ব্যর্থতা। অবশ পা দুটোকে দুহাত দিয়ে সজোরে পেষণ করি, প্রাণে সাহস সঞ্চয়ের প্রয়াস পাই, কিন্তু কোথায় সেই যৌবনের দম্ভ, বিজয়ীর অঙ্গীকার! পা কেটে রক্ত পড়ছে। রোজ সকাল দশটায় টুকটুক পদক্ষেপে অফিস যাবার অভ্যাস। নিজের পায়ের অবস্থা দেখে এরপর নিজেই আর হাসি সম্বরণ করতে পারলাম না।

ইতিমধ্যে সবাই এগিয়ে গেছে। কীর্তিদৎ, রামলাল, তিলাইয়া, সরবতিয়া, অবিনাশবাবুর দল, বেণু, সবাই যে যার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। আমি তখনও হতোদ্যম হয়ে বসে আছি। সবাই উৎসাহ দিয়ে যায় আমাকে। অশীতিপর বৃদ্ধ পণ্ডিত দত্তাত্রেয়জী ও তাঁর সহধর্মিণী এক সময় হাসতে হাসতে লাঠি ভর করে এগিয়ে গেলেন সামনে। বলে গেলেন—বেটা ইধার কিঁউ বৈঠা! সোয়ার্গ সে সুন্দর দেশ ত সামনে।

অবশেষে আবার উঠে দাঁড়াতে হল। অবসাদগ্রস্ত মন আমার তখন নানা পরস্পর-বিরোধী ভাবনায় আচ্ছন্ন—তন্দ্রাভিভূত। দূরের

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সোনালী গমের ক্ষেতে দোল দিয়ে যায় উদাস হাওয়া। পথের ধূলা থেকে কুড়িয়ে নিলাম আমার চলার যষ্টি, আবার মুখ তুলে তাকালাম ঐ গিরিশ্রেণীর পানে। যেতেই ত হবে,—ভীরু লুব্ধ চেতনা নতুন আশায় যেন ঋজু হয়ে উঠল।

এ চড়াইয়ের দুর্গমতা পূর্ব পূর্ব সব চড়াইয়ের অগ্রণী। দশ কদম একসঙ্গে চললেই দম ফুরিয়ে আসে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। একমাত্র সান্ত্বনা চিড়গাছের বিলম্বিত ছায়ায় ঢাকা পথ। কিন্তু চড়াইয়ের দুর্গমতায় সত্যকারের এই সান্ত্বনাটুকুও একটা গ্রাম্য রসিকতা বলে মনে হয়। পিপাসা—দারুণ পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে আসছে, চোখে অসহ্য একটা জ্বালা অনুভূত হল। সমস্ত শিরা উপশিরা যেন শিথিল হয়ে এল। বুক ফেটে কান্না আসছে কিন্তু চোখের সব জলও যেন বাষ্প হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে। অবরুদ্ধ ক্রন্দনে, অক্ষম হতাশায় কেমন অথর্ব বোধ করলাম!

সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে চড়াইয়ের পথ উঠে গেছে উর্ধ্বমুখে—দুরারোহ, আদিম, বর্বর। প্রাগৈতিহাসিক রহস্য নিয়ে নির্মম দাঁড়িয়ে আছে পার্বত্য পথ। বহুশ্রুত, বহুনিন্দিত এ চড়াই ধৈর্য ও তিতিক্ষার এক ক্ষমাহীন পরীক্ষা। মানুষের ক্ষুদ্রতা আর সেই মানুষেরই মহত্ত্ব যেন সুদীর্ঘ চড়াইয়ের প্রতিটি প্রস্তরে প্রতিটি বালুকণায় অক্ষরে অক্ষরে স্পষ্ট লেখা রয়েছে। একটি সঙ্কীর্ণ পথরেখা দূরে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে পাহাড়ের গহন দুর্গমতায়।

নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে জর্জরিত গৃহহারা যাত্রীদল পরাজয়ের গ্লানিতে বিশীর্ণ। পাশে গভীর খাদ, পথ সঙ্কীর্ণ, আবার তাও মাঝে মাঝে নিশ্চিহ্ন। এক ফালি কাঠের তক্তা পাতা, খাদের এপাশে আর ওপাশে। সংশয়াচ্ছন্ন নড়বড়ে একটা সেতুর অজুহাত যে কোন মুহূর্তে মানুষের ইহলীলার পাট সাঙ্গ করে দিতে পারে অনায়াসে আর বিধাতাঠাকুরও বুঝি সেই চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় নিয়ত নির্নিমেষ বসে আছেন।

ধ্বনি দিতে দিতে বিপৎসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে চলেছে নামহারা অভিযাত্রীদল। দারুণ শীতেও কপোল বেয়ে অজস্রধারে ঘাম পড়ছে, হাত কাঁপছে, জিহ্বা যেন একখণ্ড ব্লটিং পেপার। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করে—চাইনা, চাইনা কারও করুণাঘন অকৃপণ আশীর্বাদ। চাইনা যমুনোত্রীর দর্শনের সৌভাগ্য। মুহূর্তের জন্য মনে হল যে পুণ্যার্জনের সমস্ত পুঁজি যেন সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু মানুষের সত্যকারের মূলধন কতটুকু সে সম্বন্ধে মানুষ নিজেই সম্ভবতঃ সবচাইতে অজ্ঞ। পরাজয়ের গ্লানিতে যখন প্রতিমুহূর্তে হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছিলাম তখনও কিন্তু আস্তে আস্তে পথ অতিক্রমণ ঠিক চলছিল। অতি সন্তর্পণে, অতি ধীর পদে এক পা এক পা করে অগ্রসর হওয়া। সামান্য একটু ভুল পদক্ষেপ, সামান্য পা ফসকানো মানে নিশ্চিত মৃত্যুর নির্মম আলিঙ্গন।

মাঝে মাঝে দু-একজন যাত্রীর সঙ্গে পথে দেখা হয়। কেউ বা কাঁদছেন হাউ হাউ করে, কেউ বা পথের মাঝখানেই পড়ে আছেন নির্জীব ভাবে, কেউ বা কাটা পায়ের রক্ত মুছে ফেলছেন শুকনো পাতায়। সেই মানসিক অবস্থা, সেই আত্মগ্লানির কথা কখনও কাউকে বোঝান যায় না। থামলে চলবে না—তাই চলেছি, বসে থাকলে মৃত্যু—তাই চলেছি, অসতর্ক হলে বিপদ অনিবার্য, তাই সতর্কভাবে পদক্ষেপ করেছি। ধীরে ধীরে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে সম্পূর্ণ পরাজিত জেনেও কখন যেন জয়-পরাজয়ের গণ্ডির বাইরে এসে গেছি।

এমনি করে মাইল তিনেক পথ অতিক্রম করে যে কখন পাহাড়ের শীর্ষদেশে পৌঁছে গেছি নিজেই বুঝতে পারি নি। আকাশের গায়ে রামধনুর সপ্তরঙের বর্ণচ্ছটা। ভৈরোঁনাথের জীর্ণ-প্রাচীন নিরাভরণ মন্দির—কৃচ্ছ্রসাধনের শেষস্তর। দারুণ পথ-শ্রমের শেষে এখন সবাইএর চোখে জল, সবাইএর চোখেই আবার আনন্দের স্ফুলিঙ্গ।

আবার সব সহযাত্রীর দেখা পেলাম ভৈরোঁনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে। বিগ্রহ দর্শন করলাম। মনটাকে দারুণ পথকষ্টের জ্বালা ভুলিয়ে রাখার প্রয়াসে ভগবানের নামোচ্চারণ করতে লাগলাম ক্ষণে ক্ষণে বার বার। জিহ্বা রইল ব্যস্ত কিন্তু মন রইল শূন্য। পা অবশ হয়ে আসছে, দেহ ক্লান্ত। সম্পূর্ণ নির্জীব হয়ে বসে রইলাম মন্দিরের চত্বরে। এক লজ্জাহীন অশ্লীল অবসাদে চেতনা তখন নির্জীব। চোখ তুলে তাকালাম। আবার যে যার পোঁটলা পুঁটলি বেঁধেছেঁদে কাঁধে ফেলে পথে নেমে গেছে।

পিঁপড়ের সার চলেছে মধুর সন্ধানে আঁকাবাঁকা তুলির টানে লেখা অশ্মর পার্বত্য পথে। শ্বাসরোধকারী ভৈরবঘাটির চড়াই রইল পিছনে। ততক্ষণে যেন পৃথিবীর সেই রুক্ষতা সেই নির্দয়তার কথা সব আবছা হয়ে গেছে, আমিও যেন মিলিয়ে গেছি মহাশূন্যে। সমস্ত জগৎ অদৃশ্য—এক গভীর অন্তঃসমুদ্র মন্থনে নিবিষ্ট। কী উঠেছিল সে মন্থনে—জানি না।

প্রশ্নের জবাব মেলে না তবু পথ অতিক্রম করি। এমনি সময়ে পাহাড়ের একটা বাঁকে ঘুরতেই চোখের সামনে দেখা দিল শত কুবেরের ধনভাণ্ডার। ঘন গভীর বিষাক্ত মেঘের আবরণ ভেদ করে জ্বলে উঠল লক্ষ প্রদীপের দীপাবলী। অন্ধকার অমানিশা মুহূর্তমধ্যে রাহুমুক্ত হল। জেগেছে মঙ্গলধ্বনি, বেজেছে সানাইয়ের সুর—পূরবীতে মহাকালের আরতি। পূর্ণতার পদরেণু ছড়ানো মাটির বুকে। প্রভঞ্জনোন্মত্ত পৃথ্বীতে আবার জ্বলে উঠল শত শত মণিমাণিক্যের আলোক-বিদ্যুচ্ছটা।

দূরে দেখা যায় যমুনোত্রীর হিমবাহ, তুষারশুভ্র অনন্ত হিমমণ্ডল। আর দেখা যায় তুষারের বক্ষ ভেদ করে নেমে আসছে পৃথিবীর কোলে ক্ষীণ এক রূপালী রেখা, অনন্ত, অচ্ছোদ জলধারা—যমুনা।

চিরনীহার, চিরনিদ্রিত, চিরসৌন্দর্যময় পৃথিবীর সে রূপ। এক পরম রমণীয় প্রাকৃতিক বিস্ময়। এক অন্তহীন ছন্দোময় সুরের

পরশে ঘুমিয়ে আছে দিগন্ত-প্রসারিত রহস্যময় এক যাতুকরের দেশে—মায়াকাঠির পরশে রূপার পালঙ্কে অনন্যা রূপবতী কলিন্দ-কন্যা সূর্যজা।

উদ্‌ভ্রান্ত পথিক আমি শুধু পরাণ ভরে দেখি প্রকৃতির এ রূপ। পিছনে ফেলে আসা দুঃখের ইতিহাস আবার যেন বিস্মৃতির কোলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। কান পেতে শুনলাম পাখীর কূজন, বনমর্মর, ঝরনার গান আর প্রাণের স্পন্দন। সত্তা যেন সব ভুলে গেল, ভুলে গেল নির্বীর্য মনের কাতর আর্তনাদ, ভুলে গেল মনের সব অনুশোচনা। সে অবস্থায় চোখের জল মানায় না, সেটুকু মুছে ফেলতে হল।

আবার এ পাথর ডিঙিয়ে ও পাথর এড়িয়ে উঁচু নীচু উৎরাই পথ বেয়ে তর তর করে নেমে এলাম আরও মাইলখানেক। অন্ধকার নেমে এসেছে পথে, আকাশে নীহারিকাপুঞ্জের কুজ্মটিকার শোভাযাত্রা আর লক্ষ তারার ভীড়। ছোট ছোট মেঘের হাল্কা ভেলা যেন চলেছে ভেসে অগাধ নীল আকাশে পাড়ি দিয়ে। দূরে দেখা গেল জোনাকির আলোর মত যমুনোত্রী চটির প্রদীপমালা মিট্ মিট্ করে জ্বলছে।

অবশেষে যমুনোত্রী। আশ্রয় কালীকম্বলির ধর্মশালা। কী ভীষণ শীত! কী সাঙ্ঘাতিক হিমেল হাওয়া! হাত পা সব যেন অবশ হয়ে আসছে, রক্ত জমে আসছে উলঙ্গ শীতের আলিঙ্গনে।

ঘরের কোণে দাউ দাউ করে আগুন জ্বালান হল। সবাই জড় হলাম আগুনের পাশে। বুড়ীদের আহা উহু থেমে গেছে অনেকক্ষণ। সবাই তিনটে চারটে কম্বল জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে ইষ্টনাম জপ করছেন।

কিন্তু রামলাল ঠিক লেগে গেছে তার কাজে। উনান ধরানো সারা, চাল ডাল ধোয়া শেষ, একমনে নিবিষ্ট চিত্তে আলু কাটছে রামলাল। আনন্দে আপনমনে আবার গানও ধরেছে। আজ নাকি রামলাল আমাদের একটা নতুন ধরনের ব্যঞ্জন রেঁধে পরিবেশন

করবে। সে অনন্য খাদ্যের কথা চিন্তা করেই সম্ভবতঃ বেণু ঘুমিয়ে পড়েছে, কীর্তিদৎ চিন্তাকুল, আমি ভাবাবেগে সমাহিত আর রামলাল আপন আনন্দে আত্মহারা।

ধর্মশালার আলো নিভে গেছে, খাওয়া-দাওয়ার পাটও সাঙ্গ হয়েছে। সবাই প্রায় নিদ্রামগ্ন। বাইরে তখন চলেছে তুষার বৃষ্টি, আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে অজস্রধারে তুষারচূর্ণী, যেন ওপর থেকে পেঁজা তুলোর ডালাটা কেউ উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে পৃথিবীর বুকে। জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা—ভুবনকে নতুন করে দেখা নতুন চোখ দিয়ে।

শীতে কাঁপছি থর্ থর্ করে। গরম কোট, গরম ট্রাউজারস্, গরম জামা, গরম কম্বলেও শীত মানছে না। বাইরে বারান্দায় আগুন জ্বেলে ছোট্ট কল্কেতে এক ফালি ন্যাকড়া জড়িয়ে হাতের তালুতে চেপে দ্বিনয়ন ঊর্ধ্বে তুলেছেন গঞ্জিকাসেবী। নানা হাত ঘুরছে গঞ্জিকার কল্কেটি একের পর এক। সে পরম রমণীয় ধোঁয়া নিষ্ক্রমণে আনন্দ নেই—তাই রক্তচক্ষু করে সে পরম ধূম্রজালকে অতি সযত্নে কণ্ঠনালী দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকিয়ে দিয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন তূষ্ণীম্ভূত নির্বিকার বায়ুভুকের দল। প্রায় সবাই গাড়োয়ালী কুলি, দু-একজন যাত্রীও জুটেছেন এ মহামিলনের চত্বরে। কী অগাধ প্রশান্তি! ভ্রূতে কুঞ্চন নেই, কপাল বলিরেখা-মুক্ত। সম্পূর্ণ অবয়বে এক গভীর সমাধির নিবিষ্টতা।

বাইরে তখন শীত আরও জাঁকিয়ে বসেছে। গভীর অন্ধকার রাত্রি। মৃদু মৃদু তুষারপাতের শব্দ কানে আসছে, মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় চোখে মুখেও তার ছাট এসে লাগছে, কিন্তু পশমী বস্ত্রের নিবিড় আলিঙ্গনে সুন্দর উপভোগ্য উষ্ণতা। এমন শীতবিলাসের সুযোগ এর আগে জীবনে বড় একটা ঘটেনি। চটির অভ্যন্তরে উষ্ণতর শয্যার কথা চিন্তা করেও বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

কাশীর অবিনাশবাবু তখনও জেগে। ভোটকম্বলে সারা দেহ

ঢাকা। বাঁদুরে টুপির আড়ালে সারাটি মুখমণ্ডল প্রায় ঢেকে শুধু চোখ দুটো আর মুখটাকে খোলা রেখেছেন, তাও নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে—শুধু কলকেতে ফুঁ দেবার জন্য। গয়ার তামাকের দরবারী গন্ধের আমেজে মৌ মৌ করে উঠেছে সারাটা ধর্মশালার পরিবেশ। আপন মনে তামাক টানছেন সান্যাল মশাই। বুড়ি ঘুমোল, পাড়া জুড়োল—তাই অবিনাশবাবুও নিশ্চিন্ত মনে গুন গুন করে গান ধরেছেন—'দিব না দিব না গোষ্ঠে বিদায় আমার নীলমণি ধনে।'

বারান্দার একটা কাঠের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম একা। গাছ-পালা পথঘাট সবকিছু বরফে ঢেকে গেছে। সান্নিধ্য সত্ত্বেও সব কিছু যেন কেমন দূরের হয়ে গেছে, সবকিছু নাগালের মধ্যে থাকলেও সবকিছুই যেন আয়ত্তের বাইরে। প্রাণচঞ্চল ধর্মশালার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু অমন নিঃসঙ্গতা আগে কখনও এমন করে অনুভব করিনি। হিমালয়ের সমস্ত বিস্তারটুকু ব্যেপে যে কথাটি সাধারণভাবে জড়িয়ে আছে, এই তন্দ্রাচ্ছন্ন শীতজর্জর তুষার প্রান্তরে সেই কথাটাই যেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উদ্‌গীত। সেই কথাটি মানুষের নিঃসঙ্গতার কথা, একক যাত্রার কথা, মানুষের নিয়তির কথা।

এমনি করে কখন প্রহর কেটে গেছে, হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। কানে এল বিলুলিত চরণের পদসঞ্চার—শঙ্কিত ত্রস্ত নূপুরের অতি মৃদু নিক্কণ। নাগিনী এসেছে অভিসারে, গৃধিনী এসেছে নরমাংস লোভে। কামনার উদগ্র বহ্নিতে জ্বলছে অভিসারিকার লালায়িত নেত্রযুগল। আলোছায়ার আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে যাযাবরী সরবতিয়া। চোখে তার মায়াকাজল, দৃষ্টিতে জড়ান কুহকের ইন্দ্রজাল। সরবতিয়া—সে কামনার ঊর্ণনাভ। জালনিপুণা সরবতিয়া। অপূর্ব হিল্লোলিত তার দেহভঙ্গী, সুললিত দেহকান্তি, কটাক্ষে মোহময়ীর সর্বনাশা কুটিল মদিরাবেশ। মরালের মত গর্বিত গ্রীবাভঙ্গি, হরিণীর মত দৃপ্ত পদক্ষেপ। পরিধানে ঘন রক্তিম লেহেঙ্গা আর কুমকুম রঙে রাঙা চোলি।

কোটবীর মন্ত্রজালে আবদ্ধ কুরঙ্গ—তরুণ যুবক কীর্তিদৎ। কৃষ্ণপক্ষের আগমনে নিশ্চিহ্ন হল চন্দ্রের ষোলকলার দ্যুতি। কালবৈশাখীর মদমত্ত প্রলয় গর্জনে স্ফীত হিরণ্যদ—অন্তরে জেগেছে তার শত শত বৃংহিত। রাহুস্পর্শে মৃত্যু হল চন্দ্রের আর উচ্ছ্বসিত হল সাগরাম্বু।

চটির ঘনায়মান অন্ধকার থেকে নিশীথ তস্করের ভীত সন্ত্রস্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে এল কীর্তিদৎ। যেন একটি উচ্চকিত সাপ বারান্দার স্বল্পালোকে মুহূর্তের জন্য চিক্‌চিক্ করে মুহূর্তপরেই বাইরের অন্ধকারে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

ঠিক কতটা সময় সঠিক স্মরণ নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন অনন্তকাল অতিবাহিত হয়ে গেল। কী কারণে কতক্ষণ হতচেতন ছিলাম খেয়াল ছিল না। একটা দমকা হাওয়ায় চেতনা ফিরে আসতে দেখি তখনও টিপ টিপ তুষার ঝরছে, যমুনোত্রী কুণ্ডলী পাকিয়ে নিদ্রামগ্ন। যমুনোত্রীর সুখনিদ্রা কণামাত্র ব্যাহত হয়নি। আজ এই কথাটা ভেবে সবচেয়ে বেশী বিস্ময় লাগে যে সেদিন সেই মুহূর্তে আর কণামাত্র সঁরবতিয়ার কথা মনে থাকেনি। কীর্তিদৎ যেন বহুকাল বিস্মৃত একটি নাম। একবারও মনে হয়নি যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র আগে একসঙ্গে বসে নৈশাহার সমাপন করেছি, আবার কয়েকঘণ্টা পরে একই সঙ্গে প্রাতরাশে বসব।

সেই রাত্রির সেই চেতনা আজ আর পুনরায়ত্ত করতে পারিনে, কিন্তু বহুলাংশে স্মরণ করতে পারি। নিছক নিঃসঙ্গতা নয়, নির্বিকল্পতা নয়—কেবল যেন সবকিছু থেকে সহস্র যোজন দূরে সরে গেছি। অভ্যস্ত চেতনার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই। পরিচিত অনুষঙ্গগুলোও যেন নতুন দ্যোতনায় দ্যুতিময়। দূর আকাশের নিঃসঙ্গ তারাগুলোর মতই অপরিচিত কিন্তু ঘনিষ্ঠ। জন্মান্তরের দূরত্ব থেকে আজন্ম জীবনটাই যেন প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খতায়, সকল ঘাত-প্রতিঘাত সমেত নির্বাক চলচ্চিত্রের

মত পুনর্বার উদ্ঘাটিত হল। এতদিন যার নায়ক ছিলাম, আজ আমি তার দর্শকমাত্র। আঘাতগুলি আর সরাসরি এসে আহত করে না। সমবেদনার তারে তারে কেবল বিচিত্র সব সুরের মীড়। সত্যের ব্যঞ্জনা।

চটির দরজায় খুট্ করে একটা আওয়াজ হল। চমকে উঠে অবিনাশবাবু বললেন—কে? কোন উত্তর সোনা গেল না। অবিনাশবাবু আবার একটা বিলম্বিত হাই তুলে সম্ভবত পাশ ফিরে শুলেন।

ঘরে ফিরে এসে দেখি কীর্তিদৎ তার জায়গায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

পরদিন সকালে কীর্তিদৎকে ধর্মশালায় না দেখে কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করলেন। আমি কিন্তু আদৌ বিস্মিত হইনি।

॥ ১৫ ॥

যমুনোত্রী—প্রকৃতির উদার প্রশান্ত পরিসরে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট এই জনপদ। কলনাদিনী যমুনার প্রলয়ঙ্কর ভীষণ রুদ্র রূপ। লক্ষ লক্ষ অভ্রকুচির চূর্ণী মাখানো প্রতিটি জলবুদ্বুদের ফেনিল শুভ্র কিরীট—আলোর বন্যায় প্রগল্ভ, যৌবনরাগে দীপ্ত, অনুরাগে রঞ্জিত। স্রোতস্বিনীর গান শুনি কান পেতে, সমস্ত সত্তা সমস্ত অনুভূতি যেন আপনা থেকেই শিথিল হয়ে আসে।

এলাম যমুনাদেবীর মন্দিরে। নিরাভরণ, নিরলঙ্কার, ভাস্কর্যহীন মন্দির। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯৯০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত যমুনার মন্দিরটি অতি দীন, অতি সাধারণ। মন্দিরের গাত্রে শিল্পীর কিছুমাত্র গুণপনার ঔদ্ধত্য নেই, কিছুমাত্র স্থাপত্যসৌন্দর্যের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না সমগ্র মন্দিরে। নিতান্ত নগ্ন, নিতান্ত সাধারণ পরিবেশ। দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যের সূক্ষ্ম রসসৃষ্টি দূরে থাক, সামান্য শিল্পবোধটুকু পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না যমুনোত্রীর মন্দিরে। প্রত্যাশী মন কিছুটা দমে গেল। এই সেই যমুনার মন্দির—যার দর্শন অভিলাষে যাত্রীদের অনন্তকাল ধরে অক্লান্ত পথপরিক্রমণ, তিতিক্ষার প্রাণান্তকর পরীক্ষা। কী আছে এ মন্দিরে, কী অমূল্য ধনরত্ন লুক্কায়িত এ মন্দিরের গর্ভগৃহে—যার জন্য দূরদিগন্ত থেকে এমন দিশেহারা হয়ে ছুটে আসা! খেয়ালীর দুরন্ত অভিলাষ ছাড়া আর কিছু নেই এ দুর্গম পথযাত্রায়। আছে চড়াই অতিক্রমণের উদ্দাম বড়াই, দাম্ভিকের আত্মপ্রশস্তি আর বিজয়ীর ক্লীব আত্মশ্লাঘার নিঃস্ব অট্টহাসি। সন্ত্রস্ত মনে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। যাব কি যাব না!

পাশ্চাত্য যুক্তিবাদে শিক্ষিত বলে দম্ভ আমার। সেই অজুহাতে নিগূঢ় সংশয়টা নিজের পথ করে নিল। কত বিরুদ্ধ যুক্তি একই সঙ্গে ভীড় করে এসে দাঁড়াল তখন। একদিকে সংস্কারাশ্রয়ী আমার চেতনা,

অপরদিকে মিল-বেন্থামের অস্খলনীয় জড় যুক্তিবাদের শিক্ষা। নিরীহ মন বেচারা দোটানায় ক্ষণে ক্ষণে বিচূর্ণিত হতে লাগল।

মন্দিরের দ্বার তখনও রুদ্ধ। কিন্তু প্রণামীর দৌলতে এখানেও চলে মানুষের খবরদারী, চলে শেঠজিদের হুমকি। বিত্তবান যারা, ধর্মারোহণের চাইতে পাপ ক্ষালনই যাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তারা একে একে ঠিকই মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে গেলেন এবং যথাকালে চতুর্বর্গ লাভ করে 'পরকালের হিসাব নিকাশ মিলিয়ে বেরিয়ে এলেন। বাইরের যাত্রীরা বাইরেই শীতে কাঁপছে।

সৌন্দর্যহীন, সুষমাবিহীন, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, নগণ্য এ মন্দির। আর তারই দর্শন অভিলাষে যুগযুগান্ত ধরে চলেছে কিনা অগণিত যাত্রীর এ মৃত্যু-আলিঙ্গন—দীর্ঘ দুর্গম গিরিপথ অতিক্রমণ। কী পুরস্কার পাওয়া গেল এ অভিযানের শেষে! শুধু কি লক্ষ কোটি অযুত প্রস্তর পেরিয়ে যাবার ভয়াবহ হিসাবটুকুই মনে রেখে ফিরে যাব আবার নাগরিক জীবনের আবর্তে?

কিছুতেই বুঝতে পারলাম না যে প্রবঞ্চিত হলাম না পুরস্কৃত হলাম এ কঠিন সংযমের পরীক্ষায়। মন ভেঙ্গে পড়ল। বুঝলাম না যে এই আধ্যাত্মিক মোহভঙ্গের রূঢ়তায়ই আচ্ছন্ন আমি, না আধিভৌতিক শীতের রুক্ষতায় মৃতপ্রায়।

তাড়াতাড়ি চায়ের দোকানটায় পালিয়ে এলাম। উনানের গন্‌গনে আগুন ঘিরে বসেছে কুলি ও যাত্রীর দল। সুরু হয়েছে নানা ভাষায় নানা গুঞ্জন। দোকানীর মুখে দেখা দিয়েছে আশার ঝিলিক। এক সঙ্গে এত যাত্রী। একে চা, ওকে দুধ, একে পাকোড়া, ওকে আলুর ঘুগনি, নানা পণ্যের ঝাঁপি খুলে বসেছেন দোকানী ভাই। আশে পাশের দোকানগুলির ঝাঁপও খোলা হয়েছে, কুলিদের বরফ পরিষ্কার করাও প্রায় সমাধা হয়ে এল।

নতুন যাত্রীদল আসছেন, পুরানোরা ঘরে ফিরে চলেছেন। সবার দেহই ক্লান্ত, মন পরিশ্রান্ত, হাঁটুতে ব্যথা, কোমরে অসহ্য

যন্ত্রণা, পা ফোলা, পায়ে ঘা—তাতে মাছির ভ্যানভ্যানানি—তবুও যমুনোত্রীর কোলে এসে জেগেছে ম্লানমুখে উজ্জ্বল হাসির ছটা, ক্লান্ত দেহে এসেছে দীপ্ত জীবনের হিল্লোল—জেগেছে বিজয়ীর গর্বোন্নত বক্ষঃস্ফীতি।

নতুন দলটিকে দেখে খুব হাসি পেল আমার। আমার মতই প্রবঞ্চিত, আমার মতই প্রতারিত। 'একদা ছিলনা জুতা চরণযুগলে'—কবিতাটি বহুকাল পরে মনে পড়ে গেল। অপরের পদহীনতার ব্যথায় মনটা সত্যি খুসীর আমেজে চন চন করে উঠল। সবাইকে ঠেলেঠুলে আগুনের পাশে জায়গা করে নিলাম সযত্নে।

গরম চায়ের আদেশ দিয়ে দ্বিতীয়বার আরাম করে বসা গেল। আঃ। মনের উত্তাপ কমলো, দেহের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেল। হায়রে, মানুষের যত স্বষ্টিছাড়া একগুঁয়েমি! শুধু আত্মশ্লাঘা, শুধু আত্মবঞ্চনা আর শুধু মূঢ় বিশ্বাসে আলেয়ার পিছে পিছে ছুটে মরা। কোথায় যোগ্য পুরস্কার, কোথায় যোগ্য অভিনন্দন!

বাইরের আকাশ বাতাস শীতে হি হি করে কাঁপছে, পাহাড়-গুলো বরফের আস্তরণে নিথর, নিশ্চল। বৃষ্টির জল জমেছে পথের পাশে—তাতে বরফের অচ্ছোদ হাল্কা আস্তরণ। ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়ায় জমে যাবার উপক্রম। গরম কম্বল থেকে স্থরু করে পুলওভার অলেষ্টার গরম টুপিটা পর্যন্ত চড়িয়ে দিব্যি ধারিওয়াল উল কোম্পানীর মেষ শাবকটির মত কৃত্রিম উষ্ণতা উপভোগ করছিলাম গরম চা নামক তপ্ত পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে। আহা, উহু, হি-হির কৃত্রিম সুর সংযোগে শীতের মৌজ উপভোগ করার যে কী আনন্দ, কী অপার তৃপ্তি—তা অপরকে ভাষায় উপলব্ধি করান অসম্ভব। গরম জামাকাপড়ের আড়ালে দিব্যি এতটুকু হয়ে বসে ছিলাম শুধু চোখদুটো খোলা রেখে। এর ওর চেহারার জৌলষ দেখছি আর মনে মনে হাসছি। নানা বিচিত্র সাজে সজ্জিত এক একটি ক্ষুদে এস্কিমোর বাচ্চা।

চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না ভাস্কো ডা গামা, কলম্বাস কিংবা ক্যাপ্টেন স্কটের সঙ্গে। কী বিচিত্র সাজ, কী বিচিত্র পরিচ্ছদ! তাসখন্দের যোদ্ধা কিংবা সমরখন্দের সওদাগর, আরব বেদুইন কিংবা বেলুচি দস্যু—এরা কি আমাদের চেয়েও বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত! তাই ভাবি আর হাসি। বেশ লাগছিল গরম গরম চা আর নানা রংবেরংএর বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত মানুষগুলোকে। খুসীর মৌজে আরও এক ভাঁড় চায়ের আদেশ দিয়ে দিলাম।

কী অবিস্মরণীয় স্মৃতির আলেখ্য! আবার আস্তে আস্তে চেতনার দৃশ্যপট পরিবর্তিত হতে লাগল। সব কিছু ভুলে গেলাম, মিল-বেন্থাম স্মরণ রইল না। বিমনা পাগলা মনটা আমার আবার সব ভুলে তাঁরই পায়ের কাছে প্রণতি জানায়, ভিক্ষা মাগে যুক্তকরপুটে তাঁরই করুণাঘন আশীর্বাদ। বিক্ষোভের যত স্ফুলিঙ্গ সব উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল নীল অসীম আকাশের কোলে। আমি বিমূঢ়, হতবাক্। চিরবিশুদ্ধ কী প্রশান্ত সৌন্দর্য! হিমাচ্ছন্ন হিমাদ্রি নিরুত্তর, নিরুক্ত। পৃথিবীর গতি অকস্মাৎ যেন থেমে গেল। অচঞ্চল হল সূর্য পরিক্রমা, কিন্তু দেবতাত্মা নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিত, উৎকণ্ঠা-বিহীন। আমার সমস্ত অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠল, ধিক্কার দিয়ে উঠল আমার পাশ্চাত্যগর্বিত অবোধ মনকে। আত্মকেন্দ্রিক জীব, শুধু নিজের ভাবনা ভেবেই কলুর বলদের মত ঘুরে মরিস রাত্রিদিন! খুলে ফেল্ চোখের ঠুলি, ভেঙ্গে ফেল্ ঘরের আগল। দেখবি প্রকৃতির এ অনন্ত রূপের ছোঁয়ায় সব অন্ধকার ঘুচে যাবে, সব জালজুয়াচুরি ধরা পড়ে যাবে তাঁর নিশ্চিত আশ্বাসে, সব জিজ্ঞাসা সব অবিশ্বাসের সমাধান মিলবে এই হিমালয়েরই দুর্গমতায়। সে আসে নীহারিকার কক্ষপথ বেয়ে, দুর্গম পাহাড়ের কোলে পদচিহ্ন এঁকে এঁকে। সে আসবে সত্তার অন্ধকার অচলায়তনের আঙ্গিনায় দীপাবলীর আলো জ্বালাতে।

আকাশে নবীন সূর্য, নতুন করসম্পাতে দিক্ উদ্ভাসিত, মেঘমুক্ত আকাশ। আনমনে পথ চলতে চলতে আবার এসে দাঁড়ালাম

যমুনোত্রীর মন্দিরে। আমার ছেঁড়া জপের মালার রুদ্রাক্ষ আবার একে একে সযত্নে তুলে নিলাম পথের ধূলা থেকে। আবার নতুন করে গেঁথে নিলাম আমার ধ্যানের মালা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম!

নিরাভরণ মন্দির। এ রূপেই যেন মানিয়েছে ভাল, দেখায় ভাল! এ মহান্ পরিবেশে এই-ত আসল তাপসী রূপ। শান্ত সুন্দর—সত্যের প্রতিচ্ছবি।

প্রদীপের শিখায় অন্ধকার গর্ভগৃহে সামান্য একটু আলোর প্রকাশ। চোখে পড়ল গঙ্গাযমুনার মূর্তি। প্রণামীর থালাটাকে আলোয় সম্পূর্ণ প্রকাশমান রেখে পূজারীজি নিজেকে রেখেছেন অন্ধকারে। স্পষ্ট গাড়োয়ালি উচ্চারণ করে একই বিকৃত সংস্কৃত মন্ত্র পড়াচ্ছিলেন বার বার ভক্তজনে—ধৈর্যশীল নিষ্ঠাবান পূজারী। আর পিতলের থালাটায় টুং টাং করে বেজে চলে অবিরাম রৌপ্য মুদ্রার ছন্দিত সুর-নিক্কণ।

অন্ধকার কোণটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। ফিস ফিস আওয়াজ, গম্ভীর স্তবস্তুতি, মন্ত্রোচ্চারণ সব কিছুই শুনছিলাম কান পেতে। দারুণ উত্তেজনায় আমার মন, আমার দেহ, সব কিছু যেন কাঁপছিল থর থর করে। যমুনার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই, প্রণাম জানাই ভক্তির অঞ্জলিতে। সত্তার অন্তঃপুর থেকে অনুচ্চারিত প্রার্থনায় গম গম করে ওঠে সমগ্র চেতনাটুকু। আমাকে তুমি পবিত্র কর। পাবয় মাম্! পাবয় মাম্!! পাবয় মাম্!!!

"কলরব-নূপুর-হেমময়ার্চিত পাদ-সরোরুহ সারুনিকে,
ধিমিধিমি ধিমিধিমি তালবিনোদিতমানসমঞ্জুলপাদগতে।
তব পদপঙ্কজমাশ্রিতমানবচিত্তসদাখিলতাপহরে,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥

তোমার অরুণিত চরণসরোজে শোভিত স্বর্ণনূপুর। তোমার চলার ছন্দ ধিমি ধিমি ধিমি সুর-ঝংকার জনগণচিত্তমোহিনী। তোমার পদপঙ্কজ-আশ্রিত জনগণের সর্বতাপহারিণি তুমি। তুমিই প্রধানা। আমার মনের সব ভয় ভাবনা সঙ্কট তুমি দূর কর মাগো। আমাকে পবিত্র কর।

আজকের নাগরিক জীবনে সেদিনের সেই আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ আয়ত্তাতীত হয়ে গেছে। তবে একটি আশ্বাস অম্লান আছে যে আজকে আবারও তা সম্ভব।

যমুনোত্রীর মন্দিরের পাশেই বিখ্যাত তপ্তকুণ্ড আর ওপাশে প্রাচীন একটি গুহা। তপ্তকুণ্ডটি যাত্রীদের ক্লান্তি অপনোদন করে, মন অপূর্ব আনন্দে ভরিয়ে তোলে। চাল, ডাল, আটা এমন কি আলুও কাপড়ের পুঁটলি করে তপ্তকুণ্ডের জলে ছুঁড়ে দিলে কিছুক্ষণ পরেই চমৎকার সেদ্ধ অবস্থায় ফেরৎ পাওয়া যায়। এখানকার তপ্তকুণ্ডের ভেলকিবাজি ভানুমতীর খেল্‌কেও হার মানায়।

সন্ধ্যার বহু পূর্ব হতেই সুরু হয়েছে অশ্রান্ত বর্ষণ। বৃষ্টি! বৃষ্টি!! বৃষ্টি!!! কেবল বৃষ্টি!!!! চলেছে অবিরাম অক্লান্ত ধারায়। ধর্মশালার ছোট্ট ঘরখানাতেই আবদ্ধ ছিলাম সেদিন, অন্য কোন উপায়ও ছিল না। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম কত শত অসংলগ্ন কথা, আর শুনছিলাম বৃষ্টিধারার রিমি ঝিমি ঝিমি সুরের ঝংকার। কীর্তিদৎ চলে গেছে, চিরকালের জন্য আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে সে চলে গেছে। আর আসবে না, ভাইয়াজি বলে আর কোনদিন আমাকে সে ডাকবে না। বড় একা একা লাগছে। সন্ধ্যার শেষে এলো রাত্রি—এলো অন্ধকার।

আগামীকাল ভোর না হতেই আবার সুরু হবে আমাদের পথচলা—এবার ভাটার টানে। পাণ্ডার কাছ থেকে তীর্থের সুফল চেয়ে নিয়েছি। আসা, আসা, আসা—হয়ে গেল যমুনোত্রী আসা। প্রথম অঙ্কের পূর্ণচ্ছেদ। কত চড়াই ভেঙ্গে, কত উৎরাই ডিঙ্গিয়ে, কত বন্ধুর পথ পেরিয়ে, কত না আশার আনন্দে যমুনোত্রী আসা। কিন্তু দুদিন পরেই আবার ফিরে যেতে হয়। একটি মহাতীর্থ পরিক্রমণ শেষ হয়ে যায় অকস্মাৎ। এবার ফেরার পালা।

ভোরের আলো তখনও জাগেনি আকাশে, ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভীষণ শীতে জড়সড় সবাই, হি হি করে কাঁপছি। এমন সময় রামলাল হাতের সামনে এনে দিল এক গেলাস গরম চা। কী আরাম! বেঁচে থাক বাবা রামলাল দীর্ঘজীবী হয়ে।

একটু প্রশংসা পেলেই রামলাল সব ভুলে যায়। হাসিমুখে আবার এক এক ভাঁড় চা ও গরম পরোটা দিয়ে গেল চোখের সামনে। তপ্ত পরোটা। এ যে অবিশ্বাস্য যোগাযোগ। গরম পরোটা পেল কোথায় হতভাগাটা? আলু খাওয়া জিহ্বায় এদ্দিন পরে পরোটা সইলে হয়! তড়াক করে বিছানায় উঠে বসলেন বন্ধুবর, আমি বিস্ফারিত মুগ্ধ নয়নে লালায়িত রসনায় শুধু দেখছি পরোটার স্বর্ণকান্তি রূপের বৈভব। চোখ জুড়িয়ে গেল। রামলালকে আর পায় কে! অনর্গল আপন ভাষায় বকে গেল খানিকটা। পরিমার্জন শেষে বোঝা গেল সারমর্ম।—জানতাম অনেক কিছুই, কিন্তু অবস্থার বিপাকে পড়ে আর অস্থানে এসে সবই ভুলতে বসেছি।

আমরা নেমে এলাম পথে। পথঘাট তখনও ঘন কুয়াসায় আচ্ছন্ন। আমরা ছিলাম চার—এখন তিন।

আমাদের আগে আরও দু চার দল চলে গেছেন গাংনানির পথে। ঘন কুয়াসার অন্ধকারে তাঁদের দোদুল্যমান লণ্ঠনের আলো ইসারা জানায়। তাঁরা চলেছেন আমাদের আগে আগে। দারুন শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছি, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে হুহু করে। তবু পথ না হেঁটে উপায় ছিল না।

আস্তে আস্তে কুয়াসার আস্তরণ সরে গেল, পূর্ব গগনে দেখা দিল নতুন আলোর ইঙ্গিত। তারপর আবার সেই ভাঙ্গা ভৈরোঁনাথের মন্দির। এবারে ভাটার টান। তাই চড়াই হয়েছে উৎরাই, আর উৎরাই চড়াই। শীতের আমেজে পথে কষ্ট হচ্ছেনা, কিন্তু তাতে যে চলার গতি অনেক বেড়েছে তা নয়। সমস্ত অতীতটা যেন পিছন থেকে আকর্ষণ করছিল।

পিছনে তাকাই। বন্দরপুঞ্চের অভ্রআবীর মাখানো গিরিশৃঙ্গ, যমুনার ঐ অদৃশ্য ক্ষীণ রূপালী রেখার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকি বিমুগ্ধাবস্থায়।

ঐ ত যমুনোত্রী! জীবনের শেষবারের মত বারে বারে পিছন ফিরে তাকাই। দেখি—পরাণভরে দেখি। আর ত কোনদিন দেখব না।

॥ ১৬ ॥

বীপগাঁও চটিতে এসে গেলাম সকালবেলাতেই। খানিকটা বিশ্রাম ও সঙ্গে সঙ্গে প্রাতর্ভোজনটাও সাঙ্গ করে নিলাম এইখানে। তারপর যমুনার পুল পেরিয়ে—খড়শালী ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। শস্যশ্যামল মাঠ, সোনালী গমের ক্ষেত, পাইনের সবুজ বনবীথি মনকে দোলা দিয়ে যায়। রাখাল ছেলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, গাঁয়ের মেয়ে ভুলে যায় জল আনার কথা। গাড়োয়ালী কৃষাণ হাত তুলে নমস্কার জানায়। একপাল ভেড়া গাছের ছায়ায় জাবর কাটে মনের সুখে। ছায়াসুনিবিড় গ্রামখানির পঞ্জরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জড়ানো এক শান্ত জীবনের সুপ্তি, এক গভীর নিদালির ছন্দ।

খড়শালীর পর ছয় মাইলের মাথায় এল হনুমানচটি। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। ধর্মশালায় আশ্রয় খুঁজে নিলাম—শীতের কাঁপুনি তখনও থামেনি। একেই ত এমন হাড়কাঁপানে শীত, তার উপর যমুনার এই স্রোত। স্নানের চিন্তা মনে রেখে একটা পাথরের উপর বসে দেখতে লাগলাম ঈর্ষামিশ্রিত দৃষ্টিতে স্নানার্থীদের পুণ্যার্জন। কত যাত্রী আসছে যাচ্ছে, ঝপাৎ করে ঝাঁপ দিয়ে তড়াক করে উঠে আসছে তড়িৎ গতিতে। খানিকটা বিড় বিড় করে সূর্যস্তব আওড়িয়ে কিংবা নমঃ বিষ্ণু নমঃ বিষ্ণু করে এক ঘটি ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলে হাসি মুখে প্রশান্ত চিত্তে ধর্মশালায় ফিরে আসছে!

অবাক্ হয়ে দেখি। সব মানুষ আজ শুধু মানুষই। লজ্জা নেই, ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই, কপট বিনয় নেই। স্ত্রী-পুরুষে ভেদাভেদ নেই। যাত্রীরা আপন মনে স্নান করে চলেছে। সকলের বস্ত্রও সুবিন্যস্ত নেই, কিন্তু কারও প্রতি কারও অহেতুক কৌতূহল নেই। সবাই শুধু আজ যাত্রী—দুর্গম পথের সঙ্গী।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেছে, বাসন মাজার ঘস্ ঘস্ আওয়াজ থেমে গেছে অনেকক্ষণ। ধর্মশালা নিস্তব্ধ হয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে গাড়োয়ালী কুলিগুলো মনের আনন্দে গল্প সুরু করেছে। আকাশে সুন্দর আধখানা চাঁদ, নির্মল আকাশ। কাউকে কিছু না বলে ধীরে ধীরে এসে বসলাম নদীর পারে। লোকজনের সাড়াশব্দ থেমে গেছে অনেকক্ষণ। নদীর বুকে শত শত তারার প্রতিবিম্ব, যেন নীলাভ এক অচ্ছোদ মায়াজাল। তুষারদিগন্তের পানে তাকিয়ে রইলাম—মনের যত ক্ষোভ, যত জিজ্ঞাসা, যত সংশয় সব কিছুই আজ স্তব্ধ, নির্বাক। নদীর অশ্রান্ত প্রবাহগীতি শুনি কান পেতে, অন্তরের অন্তঃপুর থেকে ভেসে আসে দুয়ারখোলার কাতর করাঘাত। তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদী, ঢেউ উঠছে নামছে আবার উঠছে আবার নামছে, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই—অক্লান্ত অশ্রান্ত যতিহীন! রাত ক্রমেই বাড়তে লাগল, কাকজ্যোৎস্নায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল পাইনের বনবীথি, পর্বত প্রদেশ আর নীল আকাশ। উত্থান নেই, পতন নেই, গতি নেই, বিরতি নেই—এক অনন্ত জিজ্ঞাসা যেন। রাতের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রালোকও গভীরতর হল, রহস্যময় হল, উজ্জ্বলতর হল। সেদিনকার সে উদার স্বীকৃতি আমার নাগরিক জীবনের সব কোলাহল, সব ভুলভ্রান্তি, সব মিলন-বিরহের সুখ-দুঃখের গাথাকে নির্বাক করে দিয়ে গেল। মূক হয়ে গেল আমার মুখর ভাষা, আমার প্রাণের সব স্বীকৃতি আর অস্বীকৃতির পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ রাশি রাশি। বিস্মৃতির অতল তলে অনন্তকালের জন্য তলিয়ে গেলাম।

নিঝুম পার্বত্যভূমির নিস্তব্ধতাকে ম্লান করে দিয়ে দূর থেকে ভেসে আসে অপূর্ব এক সুর—গুপ-গুপা-গুপ, গুপা-গুপ, গুপ-গুপা-গুপ—গোপীযন্ত্রের মিষ্টি সুর। সুদূর বাংলাদেশের দরদী একতারায় প্রাণের কথা বেজে চলেছে। বাউল গান গায় আর একতারা তার মনের কথা কয়।

ও গুরু জগত উদ্ধারো, আমি বুঝিতে পারিনা গুরু মহিমা অপার
সর্প হইয়া দংশ গুরু, ওঝা হইয়া ঝাড়ো
বুঝিতে পারিনা গুরু মহিমা অপার
(গুরু) কাঙাল জানিয়া আমায় পার কর।
আকাশেতে থাক গুরু পাতালেতে ফের
রমনীর রূপ ধইরা গুরু পুরুষের মন হর
সকলেরে তরাইলে গুরু আমারে উদ্ধারো।

বাউলের গানে অপূর্ব সুরের উন্মাদনা। বাংলার নিজস্ব প্রাণের কথা। ক্ষুধায় কাতর কিন্তু প্রাণবন্যায় চঞ্চল, তৃষ্ণায় পিপাসিত কিন্তু প্রাণের রসধারায় সঞ্জীবিত। গানের অপূর্ব কথায় আর সুরের ইন্দ্রজালে ধীরে ধীরে নিজের উপল আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। কস্তুরীর গন্ধে আকুল আমার প্রাণ। ছোটবড় পাথর ডিঙিয়ে বাউলের পাশে এসে দাঁড়ালাম। ঠিক যেন পটুয়ার নিখুঁত হাতে আঁকা বাউল ছবিটি। চাঁদের আলোয় দিগন্ত উদ্ভাসিত, উচ্ছ্বসিত নদীর ধারা, আবছা ছায়ার অন্ধকারে বাউল আপনমনে গেয়ে চলেছে—

"কৃষ্ণ প্রেমের ঢেউ লেগেছে যার পরাণে
তারে কি কেউ রাখতে পারে, কাম কাঞ্চনের বন্ধনে
সে কি আর ঘরে রইতে পারে,
সে নদীতে দিলে ঘোঁটা
ওঠে পঞ্চরসের ছটা
পান করিলে দু এক্ ফোঁটা ভয় কি রে তার মরণে।
সেই নদীতে সাঁতার কাটা রসিক বিনে কে জানে
পার হওয়া কঠিন জেনো, কঠিন জেনো ঝড় তুফানে
কৃষ্ণ প্রেমের ঢেউ লেগেছে যার পরাণে॥"

বাউল নিজের মনে গান গায়, হঠাৎ আমাকে দেখে তার সম্বিৎ ফিরে আসে। গান থেমে গেল। নিজের গামছাখানা পেতে দিল

বসার জন্য। মিষ্টি হাসি, সুন্দর বিনয় বাউলের। উদাস করা চোখের ভাষা, উদাসী বাউল বেশ। বালকের মত সরল মুখের প্রকাশ, কিন্তু গালের দক্ষিণ দিকটা সম্পূর্ণ অগ্নিদগ্ধ, বিকৃত। সব সুন্দরের মাঝখানে হঠাৎ যেন অসুন্দরের দগ্ধস্পর্শ। বিড়ি বাড়িয়ে দিল হাসিমুখে বাউল।

—আপনি আমার দেশের লোক বাবা। কতকাল দেশ ছেড়েছি, তা আজও মনটা পোড়ে। আপনাকে দেখে মনটা আমার জুড়িয়ে গেল, গোঁসাই।

—গোঁসাই!

—হ্যাঁ বাবা, গোঁসাই। আমাদের নতুন গোঁসাই, নওল গোঁসাই তুমি।

বাউলের নাম ও ধামের কথা জিজ্ঞাসা করি। কথার জবাব না দিয়েই একতারাটি তুলে নিল বুকের কাছে। গানের ভাষায় আমার প্রশ্নের জবাব আমি পেয়ে গেলাম।

জিলা নদীয়া, রাণাঘাট থানার অধীন
ইছামতী নদীর পারে, থাকেন পাড়া চণ্ডীপুরে
দত্ত বলিয়া গেরামে পরিচয় নিরঞ্জন নামে

—তা আমি কর্তাভজা নেড়া-নেড়ীর দলের লোক নই বাবা। সে আউলচাঁদও নেই, সে সম্প্রদায়ও নেই। তাই মুখ ফুটে মনের কথা বললাম। পরনিন্দা ভেব না গোঁসাই। যে সম্প্রদায়ের সবচেয়ে কঠিন ধর্মানুশাসন ছিল ইন্দ্রিয় সংযম, লোকে বলত—'মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্তাভজা'—আর সেই ধর্মকে নিয়েই লোকে এখন ঠাট্টা করে। জান গোঁসাই, যে ভালবাসতে জানে না সে ধর্ম জানে না—ভক্তি বোঝে না। ভালবাসাই আসল কথা। আসল চাবিকাঠি ত সেইখানে। বলেই আবার গান ধরে বাউল নিরঞ্জন।

কামকে নাচাও, কামেতে নেচোনা।
মেয়ে না হয়ে যেজন মেয়ে সঙ্গে করে রমন
একান্ত হবে পতন—তাই কিরে মন জান না।
রামকৃষ্ণ কয় বারে বারে, নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝবে কেরে
গুরু যারে কৃপা করে সে ভিন্ন কেউ জানে না রে
বিষ অমৃত একসঙ্গে রয়, দেখ যেন বিষ খেওনা।
কামকে নাচাও কামেতে নেচনা॥

—ভালবাসা কি যে-সে কথা গোঁসাই? ভালবাসতে জানে কয় জনা? ভালবাসাই হোল গুরুর আসল মন্ত্র, ভালবাসা বিনে তার শ্রীচরণ পাওয়া যায় না। ভালবেসে যে সুখী সেই সুখী, আর ভালবাসা পেয়ে যে সুখী হতে চায় তার দুঃখ যে কোনদিন ঘোচেনা গোঁসাই। দ্বিজ চণ্ডীদাসের রজকিনী তারাই প্রেমের শিরোমণি। নিজেকে যে বিলিয়ে দিয়ে ভালবাসতে জানে সেইত আমার আসল গুরু। ভালবাসার মন্ত্র পেয়েছি গুরুর কাছ থেকে—আর ত কিছু জানি না গোঁসাই। কতকাল হল দেশ ছেড়েছি, পথই আমার ঘর, আমার বৃন্দাবন। পথের ধূলায় আমার প্রভু নিত্যানন্দের চরণধূলির স্পর্শ। —বলেই গান ধরে বাউল নিরঞ্জন।

প্রভু নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ দয়া করে আমায় করিবেন প্রদান
আমি অতি দীনহীন না জানি ভজন
নিজ গুণে দিবেন দাসে শ্রীচরণ।
একচাঁকা গেরামে এলে ভাগ্যক্রমে
তরাও এ অধীনে দিয়ে প্রেমধনে।
ও যার মাতা পদ্মাবতী—অতি ভাগ্যবতী
তাঁর গর্ভে জন্মায় অতি সুমতি,
সে যে অগতির গতি, ওহে লক্ষ্মীপতি
তোমার চরণ যেন আমার না হয় বিস্মরণ॥

কী অপূর্ব বালক-সুলভ মিষ্টি গলা! কী মন-মাতানো ভুবন-ভোলান

সুরের মায়া লুকিয়ে আছে বাউলের কণ্ঠস্বরে! বাউল তার আপন কথা বলে যায়। অর্থ নেই, একদিনের মত খাদ্যের যার সংস্থান নেই সে রিক্ত বাউল এসেছে তীর্থ পরিক্রমণে। আজ পাঁচ বছর তারা গৃহছাড়া, দেশছাড়া,—সে আর তার তুলসীমঞ্জরী। শুধু গুরুর নাম ভরসা করেই তাদের পথ চলা—তাদের তীর্থদর্শন। তারা গান গায় আর পথ চলে। বাউল বাজায় একতারা আর বৈষ্ণবী বাজায় খঞ্জনি।

পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেয়, তখনও কৃষ্ণনাম তাদের কণ্ঠে। কৃষ্ণনাম গান গেয়ে ভিক্ষা মাগে, কৃষ্ণনাম গান গেয়েই ঘুম ভাঙ্গায় পথিকের প্রভাত বেলায়। কৃষ্ণনাম তাদের গলার কণ্ঠী, অঙ্গের নামাবলী, জপের জপমালা।

হেঁটে হেঁটে সারা তীর্থ পরিভ্রমণ করে এখন চলেছে গঙ্গোত্রী। যমুনোত্রী দর্শন সাঙ্গ করে এখানে এসে কিছুদিন যাবৎ বিশ্রাম করছে ওরা। হরিদ্বার থেকেই পদব্রজে এসেছে, দিনের পর দিন—কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু হাসিটি তাদের অম্লান।

বাউল নিরঞ্জনও একদিন অতি আপনার হয়ে গিয়েছিল পথ চলতে চলতে—একান্ত আপনজনা। আমাদের পথ চলার শ্রান্তি তারা দুজনে মুছিয়ে দিয়েছিল কৃষ্ণনাম গান গেয়ে। ভালবাসার কথা শোনাত গানের কলিতে আর চোখের জলেতে।

স্বার্থশূন্য ভালবাসায় বাস করে সেই কৃষ্ণধন
তাকে ধরতে গেলে আগে করতে হবে ভালবাসার আয়োজন।
আমিত্ব থাকতে পারে না কেউ ধরতে
সহজ হয়ে জন্মের মত আগে হবে মরতে,
তবে হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে—দেখবিরে নবীন মদন।
ভাবুক যারা তাঁর প্রেমে আত্মহারা
হরি বলতে দুই নয়নে বহে অশ্রুধারা
ঠিক রেখে দুই নয়ন, তারা দেহ করে সমর্পণ
তবে চিরশান্তি লাভ করিবি, বাস হবে মধুর বৃন্দাবন।

পরিচয়ের প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ে। রাত্রির প্রহরগুলো পার হয়ে যায়, কিন্তু কারও খেয়াল নেই। বাউল গান গায়, আমি অবাক হয়ে শুনি। কিছুতেই বুঝতে পারি না নিরক্ষর উদাসী বাউল কী করে শিখল ভালবাসার এ পরম তত্ত্বকথা, জীবনের অমৃত মন্ত্র এমন করে কে শেখাল অজ্ঞ বাউলকে। দুঃখকে দুঃখ বলে স্বীকার করেনি তারা, অনাহারকে পরাভব বলে মানে না তারা। তারা দুজনার মাঝেই দুজনে পূর্ণ—ভালবাসাকে তারা জীবনের মূলধন বলে জানে, দুঃখকে তারা জয় করেছে হাসিমুখে, বরণ করেছে সাদর আহ্বানে। কৃষ্ণনাম গানে বিভোর তারা। কৃষ্ণনাম একমাত্র মূলমন্ত্র তাদের পথ চলার।

প্রথম যেদিন দেখলাম তুলসীমঞ্জরীকে,—সারাটা বুক আমার ব্যথায় ভরে গিয়েছিল। অবাক হয়ে চেয়ে ছিলাম তার নিটোল অপূর্ব দেহ-লাবণ্যের পানে। কৃষ্ণ তার দেহের ছটা, কৃষ্ণ তার মেঘকজ্জল কেশরাশি, কৃষ্ণ তার আঁখিপল্লব, কৃষ্ণ তার ভুরুরেখা। কিন্তু কৃষ্ণ তার আঁখিযুগল ভাষাহীন, দৃষ্টিহীন—তুলসীমঞ্জরী অন্ধ।

আমার পায়ের আওয়াজ পেয়েই হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল বৈষ্ণবী।—কে? কে এসেছে গো? আমাদের নতুন গোঁসাই? আমাকে তোমার পায়ের ধূলা দাও গোঁসাই। আমি যে অন্ধ, কিছু যে দেখতে পাইনা গোঁসাই।

বাউল নিরঞ্জন আমায় আসন পেতে দিল তুলসীর পাশে। কী আনন্দ দুজনার সেদিন! আমি চুপ করে বসে ছিলাম আর দেখছিলাম দুজনার ভালবাসার লেনদেন। কিছুমাত্র দূরত্ব সৃষ্টি করেনি তাদের দুজনার বয়সের ব্যবধান।

—কতকাল আপন মানুষ দেখি না। প্রাণটা যেন কেমন করে ওঠে মাঝে মাঝে। ঠাঁই নেই, চাল নেই, চুলো নেই, কিন্তু তবুও প্রাণটা কাঁদে দেশের কথা ভাবলে। সেই ইছামতী নদী, সেই প্রেমদাস বাবাজির আখড়া, সেই গোপালের দোলমঞ্চ, সেই তারকদাস বাবাজির কীর্তন গান, আজও সব যেন চোখে ভাসে।

নিষ্প্রাণ চোখের কোলে দেখা যায় অশ্রুধারা। তুলসীমঞ্জরী কাঁদে, বাউল নিরঞ্জন চোখ মেলে তাকায় নীল আকাশের পানে। মন ভোলাতে আবার সে একতারাটি তুলে নেয় বুকের কাছে। বাউল একতারা বাজিয়ে গান গায়, চোখের জল মুছে তুলসী খঞ্জনিতে দোহার ধরে—

সকালে কর মোরে পার
বেলা ডুবিলে মন হবে অন্ধকার।
ওরে অবোধ মনরে !
কিনারায় চাপিয়ে নাও, নাও-এর বাদাম তুলিয়া দাও
পার করে দাও দয়াল গুরু
সময় বয়ে যায়॥

অন্ধ তুলসীমঞ্জরীকে যতবার দেখেছি ততবারই শুধু একটি পরম সত্য অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছি—তুমি অন্ধ নও, তুমি দৃষ্টিহীনা নও। তোমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে কিন্তু ভিতর দুয়ার খোলা, আর সে অর্গলমুক্ত খোলা দরজার উন্মুক্ত কপাট দিয়েই পশেছে আলোর বন্যা। দুজনকে দেখেছি আর বিস্মিত হয়েছি, লক্ষ্য করেছি আর মুগ্ধ হয়েছি বার বার।

অন্ধ পথ চলে আর পথ দেখায় পথভোলা এক পথিক বাউল। হাতের একতারাটির অবিরাম ছন্দ তাদের পথশ্রম ভুলিয়ে দেয়, শক্তি জোগায়। কখন দেখেছি অন্ধ প্রিয়াকে কাঁধে করে চলেছে বাউল, কখনও বা বুকের মাঝে জড়িয়ে, কখনও বা হাত দুটিকে পরম নিশ্চিন্ত-তায় ধরে গান গেয়ে গেয়ে চলেছে জাহ্নবীর উৎস সন্ধানে। পথশ্রান্ত বাউল দম্পতীকে কখনও দেখিনি আমার মত অনুতপ্ত হতে, কখনও আমার মত প্রতারিত হবার অনুশোচনায় দগ্ধ হতে, শুনিনি আমার মত অকারণ করুণ বিলাপ করতে! ক্ষত-বিক্ষত পদযুগলের রক্ত মুছেচে হাসিমুখে, আবার পথ চলেছে আনন্দে।

আজও সব কথা আমার মনে পড়ে—প্রতিটি খুঁটিনাটি কথা।

আজও চোখে ভাসে—ঘন পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রৌদ্রের ঝিলিমিলি আলো এসে পড়েছে শুকনো পাতায় ছাওয়া বনপথে। কত নাম-না-জানা পাখীর মেলা, কত দুষ্টু কাঠবেড়ালী আর গিরগিটির লুকোচুরি খেলা।

মনে পড়ে সূর্যের নিষ্করুণ তাপদাহ, ভয়াবহ জলকষ্ট, পাগলা ঝড়ো হাওয়ার উন্মত্ত অভিযান, তুষারবৃষ্টি আর চাঁদের হাসির বাঁধভাঙ্গা জোয়ার। মনে পড়ে প্রস্তরাকীর্ণ, উপলসর্বস্ব, সঙ্কীর্ণ সর্পিল পার্বত্য পথরেখা আর পাশেই মৃত্যুর হাতছানি—অতল ভয়ঙ্কর গহ্বর। কত ভয়াবহ চড়াই, কত পিচ্ছিল উৎরাই।

সব ভুলে গেছি আমি। সেই অসহ্য পথপরিক্রমণ, সেই দুর্বহ দৈহিক ভারসাম্য রক্ষা, ভুলে গেছি ক্ষতবিক্ষত পায়ের কথা, দেহের ক্লান্তি, মনের অবসাদ। আজ শুধু একা আমি স্মৃতির রোমন্থন করি চোখের জলে আর আজও চোখের পাতায় ভেসে ওঠে সম্মুখে প্রসারিত সুদীর্ঘ শুধু একটি পথ আর ভুবনজোড়া আলোয় ঘেরা তুষারকিরীট মাথায়—হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

॥ ১৮ ॥

ভোর না হতেই সুরু হল সাজ সাজ রব—বাসা ভাঙ্গার হট্টগোল। কুড়ি পঁচিশজনের দলটির সবারই নিদ্রাভঙ্গ হল একসঙ্গে আর সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হল লণ্ঠন নিয়ে নানাদিকে ছোটাছুটি তাড়াহুড়ো হুটোপুটি। গরম জামাকাপড় পরে, মাথায় ফেটা বেঁধে, কোমরে কাপড় কষে, লাঠি হাতে সবাই প্রস্তুত। বোঁচ্‌কাবুঁচ্‌কি বেঁধে রাতের বাসা ভেঙ্গে সবাই পথে এসে দাঁড়াল। যাত্রার ক্ষণ উপস্থিত। গঙ্গা মাইয়া কি জয়—শুভ জয়ধ্বনি করে সুরু হল শুভযাত্রা।

মাইলখানেক পরেই পথের মাঝখানে পড়ল ছোট্ট একটি চায়ের দোকান। গরম চায়ের অলৌকিক প্রতিক্রিয়ায় সবাই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। সামনেই সিঙ্গুটের চড়াই। প্রথম দর্শনে মনটা কিছুটা দমে যেত সন্দেহ নেই, কিন্তু আজকাল আর চড়াইয়ের রুদ্রভীম দর্শনে মুসড়ে পড়তাম না আগের মতন, কারণ মনের বল ভরসা বিশ্বাস অনেক বেড়েছে আমাদের। নিজের পা দুটোর উপর আস্থা জন্মেছে, নির্ভরশীল হয়েছি নিজের বদ্ধমুষ্টিতে ধরা লাঠির উপর। এখনও বুঝতে পারি না কী করে পার হয়েছি ভৈরোঁঘাটির চড়াই, সিলকিয়ারা পথ। যমুনোত্রীর কান্তার কী করে অতিক্রম করেছি জানি না। যমুনোত্রী আমি দর্শন করেছি। কোন বাধা কোন বিপত্তিই চিরকালের মত যাত্রীর পথ আগলে ধরতে পারে না। যাত্রীর একমাত্র সম্বল জ্যোতিরাত্মা ভট্টারকের তেজোময় আশীর্বাদ।

সিঙ্গুটের চড়াই। কোন লালিত্য নেই অঙ্গে, কোন ঔদার্য নেই ভ্রুকুটিতে। সোজা উত্তুঙ্গ পাহাড়। গা বেয়ে তার চলে গেছে এঁকে বেঁকে এক সর্পিল সরণি। পাইনবন হাল্কা হয়েছে অনেক, থেমে গেছে পাখীর কূজন। রৌদ্রকরতাপদাহে পরিশ্রান্ত

পথিকদল পথ চলে আর থমকে দাঁড়ায়। নিশ্বাস বুঝি বন্ধ হয়ে আসে, চলার গতি হয়ে আসে শ্লথ।

রুক্ষ পাথরের বুকে ঠক্ ঠক্ লাঠির আওয়াজে শুনি অনামী পথিকের পদধ্বনি, শুনি তার আগমন বার্তা। দেখি বাউল নিরঞ্জন চলেছে তার অন্ধ প্রিয়াকে পথ দেখিয়ে, বৃদ্ধ দত্তাত্রেয়জি চলেছেন আগে আগে বুক ফুলিয়ে, বৃদ্ধা চলেছেন ছায়া অনুসরণ করে। ওদের দেখে যেন লুপ্ত মনোবল ফিরে পেলাম। আবার পথ চলি দ্বিগুণ উৎসাহে আর আনন্দে।

সিঙ্গুটের চড়াই অতিক্রম করে যখন পাহাড়ের শীর্ষদেশে উপস্থিত হলাম, বেলা তখন দশটা। ছোট্ট একটি চায়ের দোকান যেন উষ্ণ মরুর বুকে খর্জুর বনবীথিকার ছায়াঘেরা অঞ্চল। আরাম করে চক্ষু বুজে হাত পা ছড়িয়ে এক ভাঁড় গরম চা টেনে নিলাম। আঃ!

সমস্ত দিক্‌চক্রবালরেখা তুষার মেখলায় ঢাকা, গিরিশ্রেণীর অন্তহীন শোভাযাত্রা। ধূ ধূ করে দিগন্ত, দৃষ্টি আবছা হয়ে আসে ধীরে ধীরে। চোখ মেলে চাই—চিরনীহার, চিরসুন্দর, চিরশাশ্বত, চিরনির্ভর। ঐ যে দেখা যায় কত গিরিশৃঙ্গ, কত পর্বতমালা, কত হিমবাহের শুভ্র অভ্রম জগৎ আর ঐ দেখা যায় আমার বাঞ্ছিত গঙ্গোত্রীর বিজয়োন্নত তোরণ। নদীর ক্ষীণ বাঁকা রেখা আর সবুজ বনের দিগন্ত-প্রসারিণী ছায়ায় আমার আঁখিপল্লবে নেমে এল রঙের নেশা। সম্মুখে হিমালয়ের শাশ্বতিক অবিনশ্বর চিরতুহিন শৈলরাজি।

অবাক হয়ে দেখি। দূরে দেখা যায় বিন্দুর মত ছোট ছোট ঘর, ছোট ছোট মন্দির—উত্তর কাশীর প্রথম ইঙ্গিত। আদিগন্ত বিশাল হিমালয়ের বুকে আঁকা মানুষের আবাসভূমি, যেন পুতুলের খেলাঘর। সিঙ্গুট পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে এলাম। একঘেয়ে উৎরাই পথ। পিচ্ছিল পথ, একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। অতি সাবধানে পা ফেলে ফেলে এ গাছের গুঁড়ি ধরে,

ও গাছের শাখাপ্রশাখার শেষপ্রান্তটুকু ধরে কোনমতে সাবধানে পা ফেলে চলেছি। চোখ তুলে দেখবার কিংবা ভাববার সময় কোথায়! তাই বুঝি বা পথ চলতে চলতে পিছনের মধুর স্মৃতিচিত্র ম্লান হয়ে এল, আলপনাটুকু মুছে গেল মনের আঙ্গিনা হতে।

দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন, আশাহত অবশ প্রাণ মুহূর্তের জন্য এ পাষাণ কারার বন্ধন হতে মুক্তিকামনায় আকুল হয়ে ওঠে। কাকে শোনাব আমার মনের ক্রন্দন, কে শুনবে! কার অবসর আছে! নিরুক্ত ক্রন্দনবিলাপ বুকে চেপেই নিঃশব্দে সিঙ্গুটে এলাম।

তারপর আবার সিঙ্গুটের ধর্মশালাকে পিছনে রেখে মাইল তিনেক পথ অতিক্রম করে এলাম ছোট্ট একটি গাঁয়ে, নাম নাকুরী।

ভাগীরথী-বিধৌতা নাকুরীর তাপসীগৈরিক মূর্তি, শান্ত বৈরাগ্যের উত্তরীয় তার অঙ্গে। পুণ্য অবগাহন সেরে যখন আস্তানায় ফিরে এলাম তখন মুক্তিস্নানের আনন্দে প্রফুল্লিত আমি। অশান্ত মন আমার শান্ত হয়েছে, শীতল হয়েছে ভাগীরথীর স্নিগ্ধ শীতল সলিল পরশে। ভাবালু মন আমার উদাসী দার্শনিক হয়ে ওঠে, ভৌগোলিক সীমা পেরিয়ে মন ছুটে চলে হাওয়ায় সওয়ার হয়ে। লক্ষ্মণের গণ্ডিরেখা যায় হারিয়ে, সোনার হরিণ ডাকে, আয়, আয়—সুদূর দিগন্তের ওপার থেকে।

হিমালয়ের আবহাওয়ার মতই চঞ্চল মানুষের মন। এই আলো এই অন্ধকার, এই ঝড় এই শান্ত আকাশ, কখনও বা তুষারঝঞ্ঝায় পথ অবরুদ্ধ, কখনও বা নবীন আলোয় রঞ্জিত সূর্যতোরণ যাত্রীর কানে পৌঁছে দেয় অমরত্বের নিশানা, তেমনি প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল মন—এই আশা, এই নিরাশা, এই আনন্দ, এই বিষাদ। কখনও বা হতাশার অন্ধকার মনের আকাশ ছেয়ে ফেলে আবার কখনও বা হঠাৎ আলোর ইংগিতে আলোকময়। আবার নতুন আশায় বুক বেঁধে পথ চলে হিমালয়ের যাত্রীদল।

নাকুরীতে পুরাণের সেই বিখ্যাত রেণুকাদেবীর মন্দির। এখানেই ঋষিপুত্র পরশুরাম পিতৃআজ্ঞায় মাতৃবধ করেছিলেন। এখানেই আবার পরশুরাম ফিরে পেয়েছিলেন মাতা রেণুকার জীবন, পিতা জমদগ্নি ঋষির আশীর্বাদে।

ধর্মশালায় শুয়ে শুয়ে লিখছিলাম আমার আপন কথা। খাওয়ার পাট চুকে গেছে অনেক আগেই, অন্ধকার নেমে এসেছে অনেকক্ষণ। পাহাড়ের ছায়ায় অন্ধকার হয়েছে নাকুরী, কালো হয়েছে নদীর জল। ধর্মশালার বুকেও নেমে এল রাত্রির নিঃশ্বাস। গভীর হল রাত্রি, নিথর হল স্পন্দন, স্তব্ধ হল লোকজনের কথাবার্তা। আমার দেহেও নেমে এল অবসাদ, ঘুম নেমে এল দুচোখ ঝেঁপে। চোখের পাতা ঘুমের ছোঁয়ায় জড়িয়ে আসে ধীরে ধীরে, তখনও শুনি মধুর সুরে গুণ গুণ করে গেয়ে চলেছে বাউল নিরঞ্জন ও বাউলপ্রিয়া তুলসীমঞ্জরী—'শোন গো মা নন্দরাণী, কানু ছেড়ে কেমন করে গোঠে যাই মা বল'।

॥ ১৯ ॥

ভোর হল। এবার উত্তরকাশীর পথ—ছ' মাইলের একটানা রাস্তা। নয়নভোলান, শান্ত নিরুদ্বিগ্ন, শুধু পাখীর গান আর শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি। ছোট ছোট সোনালী গমের ক্ষেত, কৃষকের ছোট ছোট কুঁড়েঘর। আপ্রাণ প্রয়াস চলেছে মানুষের কঠিন পাথরের বুকে সোনা ফলানোর। সাড়া পেয়ে পাহাড়ী গরুগুলো মুখ তুলে চায়, কাজ ফেলে অবাক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে চাষী, চেয়ে থাকে গাড়োয়ালের কৃষক-বধূরা। পথ চলি। চোখে পড়ে মুনি-ঋষিদের ছোট ছোট কুটির, গেরুয়া রঙে ছোপান কাপড় আর কৌপিন—রোদ্দুরে মেলা। চলেছে তাঁদের বৈরাগ্যের সাধনা, ত্যাগের তপস্যা।

এলাম উত্তরকাশী। ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে স্নাতা উত্তরকাশীর পবিত্র মাটি, মুনি-ঋষির কঠোর তপস্যায় রচিত উত্তরকাশীর বুনিয়াদ, মুখরিত আকাশ-বাতাস ঋত্বিকের পবিত্র সামগানে। বরুণা ও অসি নদীর সঙ্গমে উত্তর বারাণসী, উত্তরাখণ্ডের প্রসিদ্ধ জনপদ উত্তরকাশী।

পাণ্ডা দুর্গাজি বললেন—কলিযুগে পৃথিবীতে যখন নেমে আসবে শুধু অবিশ্বাস আর প্রলোভন, কাশীর বিশ্বনাথের প্রসিদ্ধি যখন আর থাকবে না, তখন বিশ্বনাথ আবার এখানে এসেই প্রতিষ্ঠা করবেন আপন বৈভব—এই উত্তরকাশীতে।

মহাভারতের প্রসিদ্ধ কিরাতার্জুন যুদ্ধ এখানেই সংঘটিত হয়েছিল—এই এখানে। তখন ছিল না মানুষের বসতি, ছিল না মানুষের কলকোলাহল, ছিল না পদধ্বনির মৃদু আলোড়ন, ছিল শুধু তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গের কোলে সবুজ শ্যামল গহন গম্ভীর এক অরণ্যানী।

শিবের তপস্যায় গভীর ধ্যানে মগ্ন বীর অর্জুন। একদিন—অর্জুন তখন শিবের পূজায় আত্মনিমগ্ন—সমস্ত অরণ্যভূমি কেঁপে উঠল কিরাতের জয়োল্লাসে। 'ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে'। মৃগয়ায় এসেছেন সদলে কিরাতীর সমভিব্যাহারে এক দীর্ঘ বলিষ্ঠকায় কিরাত। তাড়া খেয়ে এক বন্যশূকর ছুটতে ছুটতে এল অর্জুনের আশ্রয়ে। পরিশ্রান্ত ভীত বরাহকে অর্জুন আশ্রয় দিলেন ও অনুসরণকারী কিরাতের পথ আগলে দাঁড়ালেন। সুরু হল কিরাত আর অর্জুনে যুদ্ধ। মহাপ্রলয় সুরু হল যেন।

কিন্তু একি! সব্যসাচীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হল বার বার, তীক্ষ্ণবাণ কিরাতের দেহ স্পর্শ করেই অদৃশ্য হয়ে যায়—যেন মায়ার খেলা চলেছে। ধনুর্বাণ ছেড়ে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করলেন কিরাতরাজকে। কিন্তু তাঁর তুষারশীতল দেহ স্পর্শমাত্র অর্জুন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। একটু পরেই সংজ্ঞা লাভ করে অনুরোধ জানালেন কিরাতকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করার জন্য। নিজের আরাধ্য শিবের পূজা সাঙ্গ করেই আবার প্রবৃত্ত হবেন যুদ্ধে। পূজায় বসলেন মহারথী শিবভক্ত অর্জুন। শিবমূর্তির গলায় বনফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। কিন্তু কোথায় অদৃশ্য হল মালা! কিরাতের গলায় দুলছে সেই শ্বেতপুষ্পমাল্য। কিরাতবেশী ভোলা শংকর দেখা দিলেন ভক্তকে। ধন্য হলেন পাণ্ডব বীর, ধন্য হল উত্তরকাশীর মাটি দেবাদিদেব মহেশ্বরের পবিত্র চরণস্পর্শে।

আমি সেই উত্তরকাশী এসেছি, স্পর্শ করেছি তার মহাপবিত্র ধূলিকণা, শুনেছি অহর্নিশি উপলাহত কলস্বনা জলধিগা জাহ্নবীর সুরমূর্ছনা। সেই স্থাবর আকাশ, সেই নিশ্চল হিমালয়, শুধু জঙ্গম বাতাস আর অশ্রান্ত নদীর সচল নিরন্তর স্রোতোভিযান। সেই ধ্যানের উত্তরকাশীর মৃত্তিকা আমি প্রণাম করেছি।

এই উত্তরকাশীতেই সিপাহী-বিদ্রোহের নায়ক নানা ফড়নবিশ আত্মগোপন করেছিলেন এক পাহাড়ী কুটিরে। কতকাল হয়ে

গেল, কতদিন চলে গেছে—আজও মানুষ স্মরণ করে সেই মানুষটির কথা। বুকের পাঁজরে আগুনের আখরে লেখা আছে বীর শহীদের আত্মোৎসর্গের অমর কাহিনী।

ছোট্ট পাহাড়িয়া জনপদ কিন্তু যথেষ্ট হাঁকডাক। সরকারী হাসপাতাল, বিদ্যালয়, এস্‌-ডি-ও সাহেবের বাংলো, থানা, বন-বিভাগের দপ্তর—সবকিছুই আছে এখানে। ধরাসু থেকে মোটরে আসার পথ হয়েছে, তাই লোকজনের কর্মচঞ্চলতায় মুখর উত্তরকাশী।

এখানকার রাজঘাট, মণিকর্ণিকাঘাট, কেদারঘাট প্রভৃতি ঘাটের নামগুলি শুনে কাশীর কথা বড় বেশী করে মনে পড়ে গেল। কত দেবদেবীর মন্দির সেখানে, ভক্তি আর ভক্তের অভাব নেই! বিশ্বনাথের মন্দির, শক্তিমাতার মন্দির, কালীবাড়ী, পরশুরামের মন্দির ও একাদশ রুদ্রের মন্দির প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমি অবাক হয়ে ভাবি, অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। মোহিনী মায়া জানে যাদুকর, মায়াকাঠির ইন্দ্রজালে ঘুম পাড়িয়ে দেয় মানুষকে। উত্তরকাশীর আকর্ষণ অচ্ছেদ্য। এই প্রথম দেখলাম উত্তরকাশী, কিন্তু একটি বারের জন্যও কখনও আমার মনে হল না এই প্রথম দেখছি। যেন আমার কতকালের চেনা, কতকালের জানা! যেন যুগযুগান্ত ধরে চলেছে আমার আনাগোনা তোমার আশে পাশে। এইত সেই সঙ্কটসঙ্কুল পিছল পথ, এইত সেই বিস্তৃত অরণ্যলোক, বনরাজি লতাবিতান ছায়াপথ। নদীর অশ্রান্ত কলধ্বনি শুনি কান পেতে, শুনি পাখীর কলকূজন, ঝরণার গান, স্পর্শ করি তুহিন ভাগীরথীর পুণ্যসলিল। কেবলই যেন বার বার মনে হতে লাগল—তুমি আমার চিরকালের জানা, চিরকালের চেনা। ক্ষ্যাপা মন খুঁজে মরে পরশপাথর। পূজার গম্ভীর মধুর ঘণ্টাধ্বনি বেজে চলে প্রহরে প্রহরে, আরতির মঙ্গলস্তবগান শুনি ভেসে আসে বাতাসে।

হিন্দু দর্শনের মর্মকথা আমি বুঝি না, কিন্তু তবুও যেন বার বার আমার মনে হয়েছে হিমালয়ের অসীম উদাত্ত ছায়ায় আর গঙ্গার কলতানের মাঝখানেই বেজে চলেছে হিন্দু দর্শনের আসল কথাটি। ভেসে আসে দেবলোক হতে আশীর্বাদের মঙ্গল সুর। আমার চোখের পাতা জড়িয়ে আসে আবেশে। বুঝতে পারি কিন্তু বোঝাতে পারি না সেই দুর্বোধ্য মনের আকুলতা। শুনি কলস্বনা নদীর মনের কথা, উপলব্ধি করি আকুল প্রাণে হিমালয়ের প্রাণের ব্যঞ্জনা, কিন্তু প্রকাশের পথ খুঁজে পায় না অন্ধ মন। আমার কেবলই মনে হয়েছে হিমালয়ের এ দিগন্তজোড়া অসীম প্রকাশ, এর মাঝেই ত সেই স্রষ্টার উপলব্ধি। এইত জীবনের মহাকাব্য, মৃত্যুর মাঝে চিরসুন্দরের প্রকাশ। কাঙাল আমি, সংশয়বাদী, কৌতূহলী আমি, মুখোশে আমার আসল প্রকাশ, কিন্তু তবুও দেখার শেষে পাওয়ার আশায় আকুল হয়ে বার বার কাঁদি। ভয় হয় পাছে আমার ঝুলি শূন্য না থেকে যায় চিরকাল।

রাজঘাটে পাথরের সিঁড়িতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। সারা জীবনের সমস্ত ঘুম যেন নেমে এল চোখে। বাতাসে ভেসে আসে মন্দিরের ঘণ্টার আকুল-করা মিষ্টি সুর।

চারিদিকে নিজ্‌ঝুম নির্জনতা, শুধু জলপ্রবাহের আওয়াজ। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল বৃদ্ধার মিষ্টি ভাষণে—বেটা, আভিতক শোয়ে রহগে। কুছ খা লেও মেরা বেটা। —চোখ মেলে চেয়ে দেখি দত্তাত্রেয়জির বৃদ্ধা পত্নী এসে দাঁড়িয়েছেন একেবারে আমার পাশে। হাতে ছোট একটা রেকাবিতে ঘি-মাখানো আটার রুটি, কিছু ভাজাভুজি আর আমের আচার। আনন্দে আমার চোখ দুটো জলে ভরে গেল। কাছেই ঘাটের পৈঠায় দত্তাত্রেয়জি জপে বসেছেন।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, বিশ্বনাথের আরতি সুরু হয়েছে, আকাশে পূর্ণ চাঁদের মায়া। পাইন, দেওদার, চিড় গাছের

ফাঁকে ফাঁকে পাতায় পাতায় পল্লবে পল্লবে আলোর লুকোচুরি। ঐ পাহাড়ী পথ, ঐ তুষারমৌলি গিরিশৃঙ্গ, নীলাভনয়না পাহাড়ী ঝরণা, বনানীর শ্যামল শোভা, ঐ ভেসেচলা মেঘের পানে চেয়ে চেয়ে আমার মনে হল ওরা আমাকে যেন আপন করে জড়াতে চায়। আমি যেন আবার নতুন করে জন্ম নিয়ে এসেছি ওদের কানে কানে নতুন গান শোনাতে। আমার পায়ের ধ্বনি ওরা চেনে, তাই বুঝি সাড়া পেয়েই ওরা অমন করে আমাকে কাছে কাছে পেতে চায়।

ক্ষণায়ু আমি, কিন্তু তোমরা চিরকালের। আমি ত আর থাকব না চিরদিন, কিন্তু তোমরা অনন্তকালের সাক্ষী। আমাকে তোমরা আপন করে পেতে চাও তাইত আমি একা এসেছি চুপি চুপি তোমাদের ঘুম ভাঙ্গাতে।

চিরকাল তোমার পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন কত সংসার ত্যাগী সাধু সন্ন্যাসী, কত পথভোলা বাউল বৈরাগী, কত জ্ঞানপিপাসু, কত সত্যসন্ধ্যানী পর্যটক, কত পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীদল। তোমাকে জানা আজও ত শেষ হল না কারও, আজও ত পূর্ণ হলনা আমার দিদৃক্ষা ?

হে তুষারধবল মহাহিমবন্ত। তুমি অপরাজেয়, অপরাজিত। তোমার গিরিমালার দুর্গম পথে পথে সত্যের সন্ধানে এসেছেন কত আর্য ঋষি, কত আত্মবিশ্বাসী পরিব্রাজক। এসেছেন গৌতম বুদ্ধ, এসেছেন মহাবীর জৈন, রাজর্ষি অশোক, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য, এসেছেন প্রজ্ঞান শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর, মহাকবি কালিদাস, ভক্ত কবীর, গুরু নানক, অধিনায়ক গোবিন্দসিং ও আরও কত মহাপুরুষ, কত মহাজ্ঞানী।

বুকে আমার কাঁপন লাগে, ঝড়ের হাওয়ার দোলা লাগে মনে, শিহরণ জাগে রক্তের অণুতে অণুতে বিন্দুতে বিন্দুতে। সমস্ত সত্তা হারিয়ে গেল রাতের নিজঝুম স্তব্ধতায়। বিস্ময়ে মূঢ়, আনন্দে

হতবাক, দিগন্তে দিশাহারা। শুনি প্রাণের কথা, বুঝিনা ভাষা, শুধু অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করি এক নতুন আনন্দধারা। আনন্দের মেঘমন্দ্রস্বরে আমার মনের ময়ূর ইন্দ্রধনু রং পাখা মেলে নেচে ওঠে সপ্তসুরের তালে তালে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর মুঠো মুঠো তারা ছড়ানো ঐ আকাশের প্রান্তরে।

রাজঘাটের লাগোয়া কালীকম্বলির ধর্মশালায় আমরা আশ্রয় নিয়েছি। বিরাট ধর্মশালা। চমৎকার স্নানের ঘাটটি। ধর্মশালার অন্দর মহল থেকেই পাকা বাঁধান সিঁড়ি নেমে এসেছে গঙ্গার জল অবধি, তাতে মোটা মোটা লোহার শিকল বাঁধা। কোটিপতি বিড়লার প্রাসাদোপম ধর্মশালাটিও সুন্দর ও সুরুচির পরিচায়ক। ধর্মশালায় এসে দেখি বেণু রামলাল সবাই আমার চিন্তায় অস্থির। আমাকে পেয়ে তাদের শুকনো মুখে আবার হাসি ফুটল।

খাওয়াদাওয়ার পাট সাঙ্গ করে যে যার মত শুয়ে পড়লাম। আরামে আর নিশ্চিন্তে, অবসাদে আর আনন্দে নিশ্চল হয়ে রইলাম। দূর থেকে ভেসে আসে বাউল নিরঞ্জনের দরদী কণ্ঠে

মোরে কর দয়া, দেহ পদছায়া
শুন শুন পরাণ-কানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে
না জীয়ব তুয়া বিনু॥

সব অস্পষ্ট হয়ে আসে আস্তে আস্তে, পদাবলীর শেষের পদগুলি মিলিয়ে গেল বাতাসে, ঘুম নেমে এল অবশ নয়নে।

ভোর না হতেই সবাই ছুটলেন সাধু অন্বেষণে। ছুটলেন উজলীর দিকে। উত্তরকাশী জনপদের বাইরে—পৌরশাসন এলাকা ছাড়িয়ে গঙ্গার পারে নির্জন পরিবেশে বিরাট এক এলাহি কারবার, সাধুসন্তদের উপনিবেশ। নতুন নতুন আধুনিক ঘরবাড়ী, নতুন নতুন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেছে সাধুদের বৈরাগ্যসাধন।

ফিটফাট, পরিষ্কার, মুণ্ডিত মস্তক ও পরিচ্ছন্ন করে ক্ষৌর-কৃত গণ্ডদেশ আর ধোপদুরস্ত গৈরিক বসন পরনে। মনটা ঠিক প্রস্তুত ছিল না তাই বোধকরি বিষণ্ণ হল।

অধিকাংশ তীর্থযাত্রীর মনে বদ্ধমূল ধারণা ভগবৎকৃপায় হিমালয় ভ্রমণে নিশ্চয় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধু দর্শন মিলবেই। যদি ভাগ্যক্রমে কোন সাধুসন্ত কিংবা ভৈরবীর কৃপাদৃষ্টিতে কিছু মন্ত্র তন্ত্র করায়ত্ত করা যায় কিংবা নিদেনপক্ষে কিছু জড়িবুটি গাছ-গাছড়া কিংবা ভৈষজ্য যোগাড় হয়ে যায়—ব্যাস্! আর কী চাই! ঐ মন্ত্রশক্তিতেই ডাকিনী, যোগিনী, হাকিনী, দেব দানব যক্ষ রক্ষকে একবার নিজের বশে এনে ফেলতে পারলেই হয়, তখন আর পায় কে! হিমালয় থেকে আপন গাঁয়ে ফিরে মহা নিশ্চিন্তে দারা পুত্র পরিজন, ধন দৌলত আর জমিজমা নেড়ে চেড়েই বাকি কটা দিন মার নাম নিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। এই ত অসার সংসারের সারতত্ত্ব।

পথে পথে ঘুরি আর দুচোখ মেলে দেখি উত্তরকাশী, মন ভরেছে নিস্তব্ধতায় আর চোখ মেতেছে রূপের মায়ায়। এলাম বিশ্বনাথের মন্দিরে। ভাস্কর্যহীন, নিরাভরণ পাষাণ মন্দির। আসা যাওয়ার শুধু একটি মাত্র পথ।

বিশ্বনাথ মন্দিরে দেখলাম ত্রিকালজয়ী ত্রিলোকেশের ঐতিহাসিক অষ্টধাতুর ত্রিশূলটি। নিজের ভাবে নিজের সুষুপ্তিতে মগ্ন সবাই—নাটমন্দিরের প্রায়ান্ধকার চত্বরে বিভোর হয়ে ধ্যানে মগ্ন ভক্ত তীর্থযাত্রী দল। বিশ্বচরাচর স্তব্ধপ্রায়, শুধু মন্দিরে আরতির মঙ্গলঘণ্টাধ্বনি বাজে অপূর্ব সুরেলা ছন্দে।

পরদিন। আজ কোন তাড়া নেই, কোন তাগাদা নেই পথ চলার—তাই অনেকক্ষণ অলসভাবে বিছানায় শুয়ে ছিলাম আর উদাসদৃষ্টি মেলে দেখছিলাম দূরের অশ্বত্থ গাছটার ডালপালাগুলো কেমন মাথা নেড়ে হেলেদুলে ঢলে পড়ছে—একবার এদিক্ একবার ওদিক্।

ভোরের আকাশ জমাট মেঘে অন্ধকার। মেঘের পর মেঘ জমেছে হিমালয়ের আকাশ জুড়ে। মনে হল রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে প্রভাতবেলাতেই। মেঘের গর্জন আর চিক্কুর হানাহানি মনকে যেন আরও আকুল আরও উদাস করে দিয়ে গেল। নদীর একটানা অবিরাম শব্দতরঙ্গ ভেসে আসে বাতাসে। আমি কান পেতে শুনি।

আমার আগে আমার মতই এমনি করেই শুনেছেন সংখ্যাহীন কত মানুষ। আজ আমি শুনেছি, কাল আবার শুনবেন আমারই মত কত নতুন মানুষ। বিরামহীন, অনলস, কালজয়ী মূর্তি তোমার, যুগ-যুগান্তর ধরে এমনি করেই চলেছে তোমার যাত্রা, শব্দময়ী প্রবাহিণীর অনাহত ধ্বনির দুর্জ্ঞেয় সুরের আভাস। মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি—অমৃতের সুর তোমার কলনাদে, অমরত্বের মূর্ছনা তোমার চলার ছন্দে। তোমার শীতল পরশে আজ আমি ধন্য, সার্থক আমার পর্যটন, শ্লাঘ্য আমার পথশ্রম।

প্রবল হাওয়া উঠল পশ্চিম আকাশ থেকে। ঐ ঘোর ঘনঘটা আবার আকাশের কোণেই মিলিয়ে গেল এক নিমিষে। আবার আকাশ নীল হল, পশ্চিম গগনে ধীরে ধীরে জাগল নানা বিচিত্র রংএর আলপনা। সিঁদুর মাখা অস্তগামী সূর্যদেব দেখা দিলেন দিনের শেষে। হাজিরা দিয়েই উধাও হলেন। নীলাভ ধূসর গিরিমালার পশ্চাতে কত রংএর খেলা চলেছে আকাশ জুড়ে। মেঘের আঁচলে সোনালা রং-এর পাড়—অপরূপ রং-এর খেলা। বেগুনী, লাল, নাল, হলুদ, সবুজ, ধূসর, সিঁদুর কত না রং-এর ছোঁয়াছুঁয়ি। ধীরে ধীরে আবার অন্ধকার হয়ে এল আকাশ, ম্লান হল রং-এর রোশনাই। নদীর বাঁকে ঐ দূর পাহাড়ের গা ঘেঁসে আকাশে উদিত হল পূর্ণচন্দ্র।

একা বসে ছিলাম ঘাটের কিনারায়। আলোয় আলোয় ছেয়ে গেছে পার্বত্যভূমি, নদীর জলে দুলছে চাঁদের প্রতিবিম্ব। সারাটা

আকাশ জুড়ে এক রূপালী আলোর চাঁদোয়া—তাতে লক্ষ তারার বুটি। আমার মনের দিগন্ত অপরূপ হয়ে উঠল, আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

—গোঁসাই, ও-গোঁসাই।—বাউল মিষ্টি সুরে ডাক দিল।

মুখ ফিরিয়ে দেখি অতি সন্তর্পণে সে আমার পাশে এসে বসেছে, হাতে তার একতারাটি।

—আচ্ছা বলত গোঁসাই, এ জন্মের সাধ, আহ্লাদ, ভালবাসা, সবকিছুই কি এজন্মেই শেষ হয়ে যায়?

এ কী কঠিন প্রশ্ন বাউলের! আমি নিজেই জানি না, বুঝি না জন্মান্তরবাদ। সারাজীবন ভরে শুধু এড়িয়ে গেছি প্রশ্ন, এড়িয়ে গেছি সমস্যা, আমি কি করে সমাধান করব বাউলের জটিল জীবন-জিজ্ঞাসা?

—হঠাৎ কী হল তোমার?

—তুলসীর কথা ভাবছিলাম গোঁসাই। কতকাল হল দুজনে পথে বেরিয়েছি। আগেই হোক আর পরেই হোক একজনকে ত ছুটি নিতেই হবে, তখন একলা একজন থাকব কেমন করে! তুলসীকে ছাড়া বাঁচবো কী করে গোঁসাই! তবুও ভাবি—না, তুলসী আমার কোলেই মাথা রেখে আগে যাক, নইলে ওকে দেখার যে কেউ নেই দুনিয়ায়। ও যে অন্ধ—পথ দেখতে পায় না। তুলসী আমার জন্ম-অন্ধ নয় গোঁসাই। দেখছ না আমার গালের এই শুকনো পোড়া দাগটা, তুলসীও অন্ধ হয়েছে সেই আগুনে। কতকাল হোল, কতদিন চলে গেল, আজও সবকিছু চোখে ভাসে।

সেই তুলসীমঞ্জরী। কী রূপ ছিল যৌবনে, কী লাবণ্য মাখানো ছিল অঙ্গে অঙ্গে, কী চুল—যেন মনে হত যমুনার কালো জলে ঢেউ লেগেছে। উঁচু করে চূড়ো বাঁধা তাতে বনফুলের মালা, ললাটে চন্দনের টিপ, রসকলি আঁকা, আর কালোচোখে হাসির বিজুরী।

সারাদিন পথে পথে কৃষ্ণনাম করি, ভিক্ষা করি গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে। আমরা শুকশারী কৃষ্ণ নাম গান করি। শুক বলে—কৃষ্ণ কৃষ্ণ, শারী বলে—রাধে জয় রাধে। সেই ইছামতীর পারে প্রেমদাস বাবাজির আখড়া, সেই কদমতলায় রাধামাধবের দোলমঞ্চ। আনন্দের হাট বসত বাবাজির আখড়ায় নিত্য দুবেলা। তারকদাস বোষ্টম কীর্তন করতেন, আমি দোহার ধরতাম, তুলসী আমার পঞ্চপ্রদীপে আরতি করত রাধামাধবের, প্রেমদাস বাবাজি অশ্রুভরা নয়নে শুনতেন।

কত লোক আসত সেই কীর্তনের আসরে—আজও যেন চোখ বুজলেই সব দেখতে পাই। তুলসীমঞ্চের গোড়ায় সন্ধ্যামালতী আর টগরের গাছটাতে ঝেঁপে ফুল ফুটেছে, পাতা আর দেখা যায় না। কাঁঠালি চাঁপার মিষ্টি গন্ধে আখড়ার বাতাস যেন মাতাল হয়েছে।

মনে পড়ে তার ফেলে আসা দিনগুলির কথা। নিজের মাঝেই নিজে আজ হারিয়ে গেছে স্মৃতির ঘূর্ণিতে।

—তারপর। কণ্ঠীবদল হয়ে গেছে আমার আর তুলসীর, প্রেমদাস বাবাজি তখন গত হয়েছেন। আমিই তখন আখড়ার মোহন্ত।—বলেই কি যেন গম্ভীর হয়ে ভাবে বাউল।

—জান, প্রেমের জ্বালা বড় ভীষণ জ্বালা গোঁসাই। কালীয়ের দংশনেও অত বিষ নেই যত আছে প্রেমের জ্বালায়। তুলসীকে পেয়েও পেলাম না গোঁসাই, সে আমার হোল না। সে ভালবাসে রূপ, সে চায় রস, তাই প্রথম যেদিন সে কলমীহাটার চরণদাসকে দেখল, দুজনই ভালবেসে ফেলল দুজনকে। আমি সইতে পারতাম না গোঁসাই, বুকটা আমার জ্বলে যেত। আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গোপনে তাদের চলত ভালবাসা। গোপনে চরণদাস আসত আখড়ায়। সবই বুঝতাম আর হিংসার জ্বালায় জ্বলে মরতাম রাত্রিদিন। কত বোঝাতাম, তুলসী বোঝেনা, বুঝবে না, বুঝতে চায় না।

মিথ্যা সন্দেহ বলে হেসেই উড়িয়ে দিত আমার কথা, কিন্তু আমার মন ত মানে না গোঁসাই।

আমারি বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া।—বুকটা আমারি পুড়ে যায় গোঁসাই।

সেদিন ছিল ঠাকুরের হিন্দোল যাত্রা, তারকদাস বোষ্টম চলেছেন রাণাঘাট—কীর্তনের বায়না নিয়ে, আমাকেও যেতে হবে তাঁর সঙ্গে। কত বললাম বৈষ্ণবীকে—চল্, চল্, কিন্তু কিছুতেই গেল না আমাদের সঙ্গে। নানা অজুহাত দেখিয়ে তুলসী আখড়ায় রয়ে গেল। আমরা চলে গেলাম রাণাঘাট কীর্তন গাইতে।

তারপর তুদিন পর, রাত্রি শেষে গ্রামে ফিরে এলাম। কিন্তু দূর থেকে দেখলাম আগুনের আলোয় সারা আকাশ লালে লাল। আখড়ায় আগুন লেগেছে। ছুটে গেলাম—আগুনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নিজের জীবনের কথা একটি বারের জন্যও ভাবিনি, তুলসীকে বাঁচাতে নিজের প্রাণকেও উপেক্ষা করেছিলাম সেদিন।

আগুন নিভল কিন্তু নিজে দগ্ধ হলাম আর তুলসীমঞ্জরী চিরদিনের জন্য হারাল তার চোখের জ্যোতি। তাই বৈষ্ণবী আজ অন্ধ, আর আমার গালে এই পোড়াদাগ। সব পুড়ে গেল—আখড়া, মন্দির, এমনকি ঠাকুরের দারুময় মূর্তিটি পর্যন্ত। কিছুই রইল না, শুধু ভিক্ষার ঝুলি আর হরিনামের মালাই রইল একমাত্র সম্বল।

অন্ধ তুলসীমঞ্জরীকে সেদিন থেকেই আপন করে পেলাম, সেদিন থেকেই সুরু হয়েছে আমাদের পথচলা।—বলেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, একটা বিড়ি জ্বালিয়ে চুপ করে ভাবে বাউল। বিড়ির আগুনেই দেখলাম তুটো চোখ তার ভেজা—অশ্রুসিক্ত। আমিও চুপ, বাউলও চুপ, সারা পৃথিবী চুপ, নিস্তব্ধ নিস্পন্দ—শুধু ভাগীরথী কলস্বনা।

—স্বার্থপরের মত মাঝে মাঝে ভাবি, ভালই হয়েছে। আমার দিকে চেয়েই হয়ত রাধামাধব ওর চোখ দুটো দৃষ্টিহীন করে দিয়েছেন। চোখ থাকলে কি কখন তুলসীমঞ্জরী তাকাত আমার দিকে—আমার পোড়া কুৎসিত গালটার দিকে। কখনো না···কখনো না। ও যে রূপ ভালবাসে গোঁসাই। তুলসীর চোখ গেছে কিন্তু আমিই ত রয়েছি পাশে, আমার চোখ দিয়েই ওর জগৎ আলো করে দেব আমি। তুলসীই আমার হরিনামের ঝোলা, বৈষ্ণবের গলার কণ্ঠি।

আমি ভাবি কে শেখাল বাউলকে এমনি করে সেবা করতে, এমনি করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ভালবাসতে, কে তাকে এমন করে শোনাল ফল্গুধারার মধুরাস্ফুট সঙ্গীত।

॥ ২০ ॥

ভোর হল, আবার চলা সুরু হল। পথ চলতে চলতে কত রকম গাছই না নজরে পড়েছে, কত তরুলতা, গুল্ম বনৌষধি, কত বনস্পতি—ওক, দেওদার, কেলু, সিডার, চির পাইন ইত্যাদি। যাঁরা চক্ষুষ্মান তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন মহীরুহের নানা বিচিত্র সম্ভারে আর আমি মুগ্ধ হয়েছি রূপে। চক্ষু থেকেও অন্ধ আমি, উদ্ভিদ্‌বেত্তা আমি নই, জ্ঞান আমার অতি পরিমিত, তাই বার বার শুধু নিজের অজ্ঞতাকে ধিক্কার দিয়েছি আর পথ চলেছি। পিছনে রইল উত্তরকাশী, রইল পড়ে মাত্র তিনটি দিনের স্মৃতির মালিকা, শান্তি ও পবিত্রতার স্নিগ্ধ নিকুঞ্জ, শান্ত চারু-উপবন—ধ্যানের উত্তরকাশী।

উত্তরকাশীর আড়াই মাইল দূরে এসে অসিকে দেখলাম, ঠিক তেমনি উত্তরকাশী প্রবেশের মাইল দুয়েক আগেই ত্রিবেণীতে বরুণা মিশেছেন ভাগীরথীর সঙ্গমে। বরুণা ও অসির মিলনেই বারাণসী নামের সার্থকতা।

বেশ চলেছি আপনমনে। সহজ সুন্দর পথ। ক্লান্তি নেই, আছে শান্তি; অবসাদ নেই, আছে মাদকতা; মনে অহেতুক প্রশ্ন নেই, আছে সমাধানের আত্মপ্রসন্নতা। গঙ্গাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে আমাদের পথ। পাইনগাছের সারি হাল্কা হয়েছে অনেক, পথের নীচে ভাঙের ঝোপ আর শটীর জঙ্গল নজরে পড়ছে।

মনোড়ী এসে গেলাম বেলা থাকতে থাকতেই। ধর্মশালায় পৌঁছেই বিছানা পেতে দিয়ে গেছে রামলাল। সে এখন ব্যস্ত রান্নার কাজে। চুপি চুপি বলে গেছে আমাকে এক নতুন পথের সন্ধান। মনোড়ী থেকে মাত্র মাইল আঠার দূরে ডোরিতাল হ্রদ—যেখানে জন্ম নিয়েছেন অসিনদী। ডোরিতাল হ্রদ দেখবার

প্রবল বাসনা থাকা সত্ত্বেও সম্ভব হোলনা সেখানে যাওয়া। ঐ দূরের পাহাড়ের কোন্‌খানে লুকিয়ে আছে ডোরিতাল হ্রদ—কে জানে। কত অজানা সম্পদ, কত অজানা আনন্দের খনি লুকান আছে ঐ পাহাড়ের কন্দরে—সব খবর কি আর মানুষ জানে! সংখ্যাতীত কত পাহাড়, কত পাহাড়ী ঝরণা, কত বনরাজি, কত অরণ্যবিহীন পর্বতের অশ্মর গাত্রদেশ, তাতে কালো কালো ধারাচিহ্ন, যেন বসুধারা।

মনোড়ী এসে মনে হোল পৃথিবীতে কোন কোলাহল নেই, কোন হাহাকার নেই, শুধু পাখীর গান আর হাওয়ার সোঁ সোঁ করা আকুল কলগীতি। কাঠঠোকরা অবিরাম ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌ আওয়াজ করে চলেছে আবিষ্কারের নেশায়। কী পেয়েছে, কী পেল আর কী পাবে, সে খবর সেও জানেনা। আমি শুধু কান পেতে শুনি।

রাতের অন্ধকার তখনও কাটেনি—পূর্ব গগনে দেখা দিয়েছে ঊষার জ্যোতি। আকাশের গায়ে জ্বলছে উজ্জ্বল তারাগুলি। ঘুম ভেঙ্গে গেল। বন্ধঘরের আগল ভেঙ্গে বন্দী বিহঙ্গ অন্তরের জ্বালা জুড়াতে চায়—প্রভাত বায়ুর শীতল পরশে। বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ভোর হয়ে এল।

দিক্‌চক্রবাল তখনও এক নীলাভ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। আস্তে আস্তে ধোঁয়ার জাল ছিন্ন হল, দেখা দিল পূর্ব গগনে অপূর্ব রক্তিম বর্ণচ্ছটা—আমার জীবনে এনে দিল নব জীবনের আনন্দ। সর্বাঙ্গ আমার জুড়িয়ে গেল প্রভাতের স্নিগ্ধ শীতল হাওয়ায়। সুরের পরশে মন্ত্রমুগ্ধ আমি, পলাতক আমি নগরের মুমূর্ষু জীবন হতে।

মনোড়ীর পর মাল্লা—তারপর ভাটোয়ারী। মাল্লা একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, মাত্র কয়েকঘর লোকের বাস। সাড়া নেই, শব্দ নেই, জীবনের স্পন্দন নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে সিঁথিরেখার

মত চলে গেছে কেদারনাথের পথ, পাওয়ালীর চড়াই পেরিয়ে ত্রিযুগীনারায়ণে গিয়ে একেবারে মিশেছে; গঙ্গোত্রী দর্শন করে কেদারবদরীর যাত্রীরা আর উত্তরকাশী ফিরে আসে না, তারা এই মাল্লার পথ ধরেই এগিয়ে চলেন তুষারতীর্থ কেদারনাথের অভিমুখে।

চলতে চলতে অবাক হয়ে দেখি,—এক রহস্যময় পথের আকুল হাতছানি ঘরছাড়া পথিকের মনে রোমান্স-এর রসদ যোগায়। মাল্লার পর আরও মাইলখানেক পথ ছাড়িয়ে মানে মনোড়ী থেকে মাইল সাতেকের মাথায় পেলাম ভাটোয়ারী। ভাস্কর প্রয়াগ বলেও ভাটোয়ারীর অন্য একটা পরিচয় আছে।

ভাটোয়ারী পৌঁছে গেলাম বিকেলের অনেক আগেই। খাবার খুব একটা তাগাদা ছিল না, কারণ মাল্লাতেই আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে এসেছি। খুব সুন্দর লাগল ভাটোয়ারীকে। দুটি ধর্মশালা, অল্প কিছু লোকজনও আছে কিন্তু চেঁচামেচি নেই, প্রতিযোগিতা নেই পড়োশীতে পড়োশীতে।

ছোট্ট ধর্মশালা,—অশ্বত্থগাছের ছায়ায় গঙ্গার পারে নিশ্চল নিথর। পাহাড়ী দমকা হাওয়ায় দোলা লাগে অশ্বত্থগাছটার ডালপালায় আর আমার মনে। একটা খাটিয়া পেতে গাছের নীচে শুয়ে পড়ি, চোখের সামনেই দেখছি ভাগীরথীর স্বচ্ছধারাকে, শুনি প্রবাহিণীর কলগান। আমি অনড় অচল হয়ে শুয়ে শুয়ে দেখি মেঘেরা চলেছে দল বেঁধে উত্তর গগনে। আকাশে আলোর ঝরণা—বাতাসে মুক্তির গান। দমকা হাওয়ায় বৈশাখীর শুকনো ঝরাপাতায় ঘূর্ণি ওঠে! পাতার সরসরানি, যাত্রীদের অস্ফুট আলোচনা সব শুনছিলাম আনমনে। বুড়ীদের খেদোক্তি সমানে চলেছে, বুড়োদের তামাক খাওয়া, কুলিদের গঞ্জিকা সেবন, আবার কেউ কেউ বা তৈল সহযোগে অবসরমত পা-দুটোর পরিচর্যা করে নিচ্ছিলেন আরাম করে।

রামলাল বেচারী কিছুতেই আর উনান ধরাতে পারে না,

সমানে ফুঁ দিয়েই চলেছে। বেচারীর অবস্থা সঙ্গীন, নাকের জলে আর চোখের জলে একাকার, বেণু গেছে ওকে সাহায্য করতে। ওদের যৌথ কার্যকলাপ দেখে শুনে যা বুঝলাম তাতে আদৌ রাত্রির আহার মিলবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রইল মনে। চক্ষু বুজে ঘুমের আরাধনা করি, কিন্তু ছাই পোড়া চোখদুটোয় কি সহজে ঘুম আসে! ঘুম আর আসেনা। এত রূপের মেলা—এখানে এসে কি কারও ইচ্ছা করে চোখ বুজে থাকতে! চোখ মেলে শুধু দেখি।

কুল কুল করে বয়ে চলেছেন জাহ্নবী আপন মনের আনন্দে। নদীর উপরে বালুর চর, তারপর আবার পাহাড়ের পর পাহাড়ের অন্তহীন শোভাযাত্রা আর আকাশের একূল ওকূল আলোর বন্যায় প্লাবিত। চাঁদের আলোয় এক স্বপ্নালু মায়ার জাল বোনা—উছলে পড়ে আলোর জোয়ার। মাঝে মাঝে রাতের নাম-না-জানা পাখী ডাক দিয়ে যায় আপন কুলায়ের সন্ধানে। অশ্বত্থগাছটার ডালপালাগুলি কাঁপছে বাতাসে। বেশ শীতের আমেজ লাগছে আর তাতে যেন জড়িয়ে আছে এক অলস সন্ধ্যার মৌতাত।

সকাল হতেই আবার সুরু হল পথ চলা। ভাটোয়ারী থেকে গাংনানি পুরা ন' মাইলের ধাক্কা। উত্তরকাশী থেকে ভাটোয়ারী পর্যন্ত বেশ আসছিলাম, এবার থেকে সুরু হল বন্ধুর অসমান পথ। ভাগীরথীর ধারাতেও দেখা দিল পরিবর্তন। তাপসীর শান্ত রূপে দেখা দিল চণ্ডিকার রুদ্র রূপ, প্রবাহে দেখা দিল বেগ, দেখা দিল ক্রুদ্ধ আক্রোশ।

অজানা আনন্দের প্রতিধ্বনি জাগে মনে, সমস্ত দেহমন শিহরিত হোল বার বার। মহাতীর্থের দূরত্ব অনেক কমে এসেছে। গঙ্গোত্রী তুষারতীর্থ, আর মাত্র আটত্রিশ মাইল। ধ্যানের মাঝখান দিয়েই চলেছে পথ চলা। নির্জন বন্ধুর পথ। বিজন পর্বতমালা

—যুগযুগান্তরের অতন্দ্র সাক্ষী, নদীর কলরোল আর শান্ত প্রকৃতির ধ্যানমগ্ন রূপ।

পথ চলি আর দেখি নিত্যকালের মানুষের মেলা। বিচিত্র জনতার মাঝখানেই খুঁজে পাই আমাকে, চলমান মানব প্রকৃতির একটি পূর্ণ প্রতিচ্ছবি, রূপে রসে ভাবে ব্যঞ্জনায় অপরূপ, আবার তেমনি লোভ আর লালসায়, হতাশা আর বেদনায় রঞ্জিত এক একটি পুঞ্জীভূত ব্যথার ইতিহাস।

পৃথিবীর বুকে মানুষ এল—হাসল, কাঁদল, আবার চলে গেল। খণ্ডকালের এই মিছিলেই কান পেতে শুনি মানুষের অন্তহীন যাওয়া-আসার পদধ্বনি, চোখ মেলে দেখি মানুষের হাসিকান্নার বিচিত্র চলচ্ছবি। তাই বুঝি বার বার কেবলই মনে হয়েছে, এদের যেন কোথায় দেখেছি আগে, যেন কতকালের চেনা মানুষ এরা আমার। তাই এরা ক্ষণকালের অঙ্গনেই চিরকালের চেনা হয়ে রইল। ঐ পরমনিষ্ঠ মারাঠী পরিবারটিকে যে কোথায় দেখেছি আগে, দেখেছি আমার পাঞ্জাবী বহেনজিকে, দেখেছি বংশগরিমায় গর্বিত প্রৌঢ়টিকে, কোথায় যেন দেখেছি বহুবার পথ চলতে চলতে ঐ পথিক বাউল দম্পতীকে। চলমান জীবনের প্রতিভূ এরা, বন্ধঘরের রংমশাল। জীবনের স্ফুলিঙ্গ এরাই। এ পথ, এ ঘাট, এ পাহাড়, এ নদী—সবই যেন আমার বহুকালের চেনা, বহু কালের জানা।

মোহাবিষ্টের মত পথ চলেছি। সূর্যের উত্তাপ একেবারে নেই, মেঘলা আকাশ, বেশ শীত শীত করছে। পথ চলতে কিছুমাত্র কষ্ট হচ্ছে না—বেশ চলছি। চোখের সামনে দেখা দিল গাংনানির ঝুলন্ত তারের পুল—নীচে গঙ্গার উদ্দাম গতিবেগ। সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্য! এল নতুন গাংনানি।

যমুনোত্রীর পথেও গাংনানি নামে অপর একটি জনপদের দেখা পেয়েছিলাম—আবার গঙ্গোত্রীর পথেও নতুন করে পেলাম

গাংনানির সন্ধান। এখানকার বিখ্যাত ঋষিকুণ্ড শ্রান্ত দেহমনে অপূর্ব সঞ্জীবনীর পুলক এনে দেয়। একটি গহ্বরকে কেন্দ্র করেই তপ্তকুণ্ডটি—হিমের দেশে উষ্ণ জলের প্রবাহ।

ঝোলাঝুলি নামিয়ে প্রাণের আনন্দে স্নান সেরে নিলাম তপ্তকুণ্ডের জলে! মুমূর্ষুপ্রায় জীবনে নতুন শক্তি এল, এল নতুন বল, নতুন বিশ্বাস।

গাংনানিতে দোকানপাট ধর্মশালা চটি সবকিছুই আছে। অধিকাংশ যাত্রীই এখানে রয়ে গেলেন রাত্রিবাসের অপেক্ষায়। আমার মন যেন চাইল না বিরতি, মন আমার চঞ্চল, শরীর সুস্থ। কানের কাছে চুপি চুপি বাউল বলে গেল—গোঁসাই! চলনা গয়ে। রামলাল তার সরল হাসিতে চোখের ইসারা দিয়ে গেল—চল না বাবুজি, আর ত মোটে ন' মাইল স্থকি। তাকিয়ে দেখি বেণু লাঠিসোঁটা হাতে প্রস্তুত।

রামলাল রান্নার কাজে লেগে গেল, আমি পথে পথে ঘুরি আর মানুষ খুঁজি। বাউল নিরঞ্জন তার একতারাতে গান ধরেছে আকুল প্রাণে আর তুলসীমঞ্জরী তার খঞ্জনিতে দোহার ধরেছে চোখের জলে—

—এ ভব সংসারে রে মন না মজিল রে
চল চল দেশে যাই।
অখুটা শিমিলার নাও
টলমল করে গাও
বত্রিশ বাঁধা খসিয়া পড়েরে জোড়া।
মন কাষ্ঠের নৌকাখানি
পবন কাষ্ঠের বৈঠাখানি
সেও ঠেকিল বালুচরে॥
এ ভব সংসারে রে মন না মজিল রে
চল, চল দেশে যাই॥—

॥ ২১ ॥

আবার ভোর হল । আবার চলা স্থরু হল আমাদের। পিছনে রইল পড়ে ধর্মশালা আর একটি রাত্রের ইতিহাস। মাইল দুয়েক পরেই এল ঝালা—অতি নগণ্য ক্ষুদ্র নির্জন জনপদ। ঝালা এসেই গঙ্গার বিচিত্র পরিবর্তন। ঝালা থেকে জংলা প্রায় বারো মাইল। বিস্তীর্ণ গঙ্গার ধূ ধূ বালু বেলাভূমি—বালি আর বালি। নদীশয্যা প্রায় দুই ফার্লং পর্যন্ত চওড়া হয়ে গেছে মাঝে মাঝে। পাহাড় থেকে নেমে এসেছে প্রচণ্ড এক বেগবতী ধারা—উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম উল্লোলিত তার গতিভঙ্গি। বহুধা বিভক্ত হয়ে ধারাটি গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে, গভীরতা বেশি নেই, হেঁটেই পার হতে হয়, কিন্তু যা স্রোত। বিরাট্ বিরাট্ পাথরের খণ্ড ভেসে চলেছে স্রোতের মুখে। যাত্রীদের মুখে নেমে এল ভয়ের ছায়া, শঙ্কায় দুরু দুরু মন। পায়ের জুতো জোড়া কাঁধে নিয়ে নেমে পড়লাম বালুবিস্তীর্ণ নদীশয্যায়। কী অসম্ভব কনকনে ঠাণ্ডা জল, পা ছোঁয়াতেই মনে হল পা-দুটোকে যেন করাত দিয়ে কেটে বিচ্ছিন্ন করে দিল দেহ থেকে। সমস্ত শরীর যেন জমে আসছে। অতি সাবধানে ধীরে-ধীরে পা ফেলে ইষ্টনাম স্মরণ করতে করতে এগুতে লাগলাম।

কী ভীষণ প্রচণ্ড দুর্বার গতি! মাঝে মাঝে ছোট বড় পাথরের চাঁই ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে নিম্নভূমির দিকে। নিজেকে নিয়েই এত বিব্রত যে, কে কোথায় আছে তা চোখ মেলে দেখার পর্যন্ত ফুরসৎ নেই কারও। এমনি করেই একটা একটা ধারা ও খানিকটা বালুশয্যা পার হয়ে যখন সত্যি সত্যি ওপারে এলাম তখন আমি সম্পূর্ণ বিবশ, বিহ্বল—অচেতন-প্রায়।

এ দারুণ বিস্তীর্ণ বালুর প্রহেলিকার শেষেই পেলাম ছোট্ট একটি চায়ের দোকান। হাত-পাগুলোকে আগুনে খানিকটা সেঁকে

গরম মোজায় পা ঢুকিয়ে ক্যানভাসের জুতোজোড়া পরে নিলাম, গরম মাফলারে কানদুটোকে আরও ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে চায়ের দোকানটায় গ্যাঁট হয়ে বসলাম।

দেড় মণ ওজনের মাল কাঁধে নিয়ে রামলালটা এল কী করে! বেণুটা আবার গেল কোথায়? বাউল কি আমার আগেই বৈষ্ণবীকে নিয়ে এসে পৌঁছেছে? নানা চিন্তায় নানা ভাবনায় ফাঁকা মনটা এক নিমেষেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তাই ত! এতক্ষণ ত কোন চিন্তাই ছিল না মনে, নিজেকে সামলাতেই ত বিব্রত ছিলাম আমি। কী করে এলাম, কোথায় পেলাম এমন সাহস ও শক্তি! বিস্তের ভাবনায় মনটা জুড়ে বসেছে। চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম প্রকৃতির আপনভোলা রূপ আর ভাবছিলাম তাঁর অসীম করুণাঘন আশীর্বাদের কথা। ধন্য আমি, ধন্য আমার পথযাত্রা।

হারশিলা এল। এখানকার লক্ষ্মীনারায়ণজির মন্দির যাত্রীদের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু। চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশে হারশিলা গ্রামটি। লোকজন আছে, কর্মচাঞ্চল্য আছে। হারশিলার পর ধরালী, ধরালীর পর জংলা। এ পথটুকুর যে অপরূপ নৈসর্গিক রূপ দেখেছি—তা সারাজীবনের এক অক্ষয় পুঁজি হয়ে রইল। অসামান্য, অনির্বচনীয় সে সৌন্দর্য। অনিন্দ্যাঙ্গী প্রকৃতি উজাড় করে দিয়েছে তার রূপের ডালি।

অবশ্য তেমনি হারশিলায় এসে মনটা অত্যন্ত দমে যায় জনপদের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায়। চারিদিকে ছড়ান নিক্ষিপ্ত আবর্জনা। ভীষণ নোংরা হারশিলা, তদুপরি তিব্বতীদের আদি ও অকৃত্রিম গায়ের বোটকা গন্ধ। এখানকার পথে ঘাটে তিব্বতীদের আনাগোনা। নেলাং পাশ হয়ে তারা আসে—নানা পণ্য বয়ে নিয়ে—থুলমা, গুদ্‌মা নামক কম্বল, ভেড়ার লোম, চমরীর লেজ, ঝব্বুর চামড়া, নানা রকম গাছ গাছড়া, জড়ি বুটি। ব্যবসার শেষে আবার তারা দেশে ফিরে যায় এদেশের পণ্যে ঝাঁপি পূর্ণ

করে। পাউডার, সেন্ট, চুলের ফিতা, কাঁটা—রমণীর মনোলোভা নানা প্রকার প্রসাধন সামগ্রী, ওষুধ, উল, চাল, ডাল, মনিহারি মাল মশল্লা, পুরোনো জামা কাপড় জুতো ইত্যাদি হরেক রকম জিনিস।

হারশিলার আপেলের সুখ্যাতি কেবল শুনেই গেলাম। হারশিলার অপর নাম হরিপ্রয়াগ। হারশিলা ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম আঁকা বাঁকা পথ ধরে। দূরে দেখা যায় শ্রীকণ্ঠ পর্বতের উচ্চ তুষারধবল গিরিশৃঙ্গ—উচ্চতা জেনে নিলাম ২০,১২০ ফুট।

পর্বতের সানুদেশে ছোট্ট গ্রাম ধরালী। ধরালীর প্রাচীন নাম বিশ্বনাথপুরী। এখানকার বিশ্বনাথের মন্দিরটি অতি প্রাচীন। শ্যাম-প্রয়াগ বলেও ধরালীর খ্যাতি আছে। সুন্দর অপরূপ পরিবেশে গ্রামখানা। হিমালয়ের অপার ব্যাপ্তি আর বালুবিস্তীর্ণ নদীশয্যার হাতছানি, অসীম আকাশের নিঃসীম স্তব্ধতা আর সবুজ বনানীর ছায়া-পথ—জীবনের সবকিছুতেই যেন আবর্তন এনে দিল।

গঙ্গার পারেই কালীকম্বলির ধর্মশালা। আজকের রাত্রি যাপনার পান্থশালা। ছোট্ট গাঁয়ের গা ঘেঁসেই চলেছে একটি ছোট্ট নদী—নাম তার হত্যাকারিণী। এটি ছাড়াও অনেকগুলো ধারা এসে মিশেছে গঙ্গায়। ধরালীর পর থেকেই ধারার রূপও বদলে গেল গঙ্গার। বালুশয্যা মিলিয়ে গেল, গঙ্গার কেন্দ্রীভূত ধারা নেমে আসছে। শান্ত যেন মায়ের স্নিগ্ধ রূপ। নদীর ওপারেই মুখবা গ্রাম। গঙ্গোত্রীর পাণ্ডাদের শীতকালীন আবাস। গঙ্গোত্রীর জনপদ যখন তুষারে ঢেকে যায়, তখন এখানেই নেমে আসেন পাণ্ডারা।

মে মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত খোলা থাকে গঙ্গোত্রীর মন্দির, তারপর বছরের বাকি সময়টা তুষারাবৃত থাকে এ হিমতীর্থ গঙ্গোত্রী। ছোট্ট গ্রাম মুখবা। কথিত আছে মঙ্গৎঋষি নাকি এখানেই কঠিন তপস্যা করেছিলেন। তাঁর পবিত্র নাম থেকেই মুখবা নামের উৎপত্তি। সুন্দর জনপদ, সুন্দর আবহাওয়া আর অতি সুন্দর এর মানুষগুলো।

ধর্মশালায় শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবছিলাম। অল্পকিছুক্ষণের

মধ্যেই ধরালী খালি হয়ে গেল। সবাই চলেছেন এগিয়ে, কারণ আজকেই গঙ্গোত্রী পৌঁছন চাই। গঙ্গোত্রী আর দূরে নেই, গোমুখও নিকটবর্তী। জীবনের এত সাধ, এত কামনা আজকেই পূর্ণ হতে চলেছে, নতুন আলোর ইঙ্গিত ঐ সামনে—আর মাত্র বার মাইল বাকি গঙ্গোত্রীর স্বপ্নতোরণ। দেখা দেবে আলোয় রাঙা স্বপ্নে ঘেরা কল্পনার রামধনু—গোমুখের পথ। জীবনের একটি মহান্ সাধ, একটি মহান্ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে। কিছু ভাবতে পারছি না যেন, বুক দুরু দুরু করে কাঁপছে, চোখে জল আসছে, দেহমন রোমাঞ্চিত হচ্ছে বার বার।

দূর—বহুদূর থেকে ভেসে আসছে যেন মন্দিরের আরতির কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ, ভেসে আসছে চন্দনের গন্ধ, ভেসে আসছে মধুর সুরে মহর্ষি বাল্মীকি রচিত গঙ্গা-স্তোত্র গান—মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধা-শৃঙ্গার-হারাবলি, স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি! ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে। ত্বত্তীরেবসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিমুৎপ্রেক্ষতস্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ।

মাগো! গিরিজাসপত্নি গঙ্গে, তুমি পৃথিবীর কণ্ঠমালা, তুমিই স্বর্গারোহণের সোপান-স্বরূপা, তুমি ভগীরথ কর্তৃক আনীতা। মাগো, তোমার কাছে শুধু আমার এই প্রার্থনা, আমি যেন তোমার তীরে বসতি করে, তোমার পবিত্র জল পান করে, তোমার তরঙ্গমালার অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আর তোমার নাম স্মরণ করতে করতে আমার এ শরীর পরিত্যাগ করতে পারি।

লক্ষ্যভূমি গঙ্গোত্রী পৌঁছবার এ দারুণ উত্তেজনা বুকে চেপে রাখা অসম্ভব। তাই কালক্ষয় না করে পথের বিশ্রামটুকু পর্যন্ত পরিত্যাগ করে উল্কার মত ছুটে চলেছেন যাত্রীদল। সবাই যেন অদৃশ্য এক মায়ার জালে আবদ্ধ, আনন্দে পাগলপারা। তাঁর অমোঘ দড়ির টানে আমরা হাসি আর কাঁদি। পুতুলনাচওয়ালার সুতোয় বাঁধা এক একটি কাঠপুতলি।

সবাই চলে গেলেন, ধরালী রইল পিছনে। আমরা ধরালীতে

রইলাম দারুণ উত্তেজনা বুকে নিয়ে। বৈষ্ণবী তুলসামঞ্জরী পড়ে গিয়ে পায়ে খুব চোট পেয়েছে, কিন্তু হাসিটুকু তার অম্লান।

সে বলে—আমি ত পথ দেখতে পাই না, এমনি একটু আধটু ত' লাগবেই—তাতে কি থামলে চলে গোঁসাই ?

তুলসী থামতে চায় না। বাউল আমাদের মতামতের অপেক্ষায় মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বাউলের মনের কথা ভেবেই ধরালীতে থাকা মনস্থির করলাম।

বাউল গান ধরেছে—
পাগলা মনরে—আনন্দে হরিগুণ গাও।
চৌদ্দপোয়া নৌকার দাঁড়া, লোহা ছাড়া তক্তায় গড়া।
এবার অনুরাগের বাদাম দিয়ে ধীরে ধীরে যাও।
আনন্দে হরিগুণ গাও॥

পাশের কামরায় ভীষণ জ্বরে ধুঁকছেন দুর্গা বহেনজি। শরীরের উত্তাপে আর জ্বরে অচেতন হয়ে পড়ে আছেন সারাদিন। কেউ কাছে নেই, শুধু একটা কুলি ছাড়া।

আমার এ ভ্রমণ-কথায় দুর্গা বহেনজির কথা কিছুই বলা হয়নি—তাঁর কথা ব্যতিরেকে যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আমার এ পথের আলেখ্য। তাঁর স্নেহের ঋণ কোনদিন পরিশোধ করতে পারব না।

প্রথম যেদিন ধরাসুতে দেখলাম, আমার বার বার মনে হল কোথায় যেন দেখেছি, বড় বেশী আপন মনে হয়েছিল তাঁকে। মোটাসোটা প্রৌঢ়া মহিলাটি, সুন্দর দেহের বর্ণ, সুন্দর দুটি চোখ, কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর বহেনজির মিষ্টি স্বভাবটি। পায়ে সাদা ক্যানভাসের জুতো, হাতে একটা মোটা লাঠি, পরণে খদ্দরের থান ধুতি, কপালে সাদা চন্দনের টিপ। কী বলিষ্ঠ ভঙ্গি! প্রায় ছ' সাত জনে মিলে চলেছেন একটি ছড়িদারকে ভরসা করে। ভীড়ের মাঝখানেও একা তিনি।

মাঝে মাঝেই আমাকে প্রশ্ন করতেন—ইস কঠিন রাস্তেমে তুম কিঁউ আয়া বেটা ?

বহেনজিকে সেদিন কোন জবাব দিতে পারিনি, কিন্তু একটি পরম সত্য অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছি যে, গোপন দুঃখের ঝুলি তাঁর পায়ের কাছে উজাড় করে দিতেই যাত্রীরা এসেছে এ দুর্গম পথপ্রান্তে। দুঃখকে দুঃখ বলে মানে না তারা, নিজেকে বিলিয়ে দেবার মাঝখানেই উপলব্ধি করেছে জয়ের আনন্দ।

বহেনজিকে দেখতাম, অবাক হতাম মনে মনে। কারও কোন কথায় নেই, আলোচনায় নেই, কোন কিছুতে প্রতিবাদ নেই—আপন মনে অবসর সময়ে জপ করছেন আর গুন গুন করে রামনাম করছেন।

মাঝে মাঝে পাশে পাশে চলতেন আর আস্তে আস্তে কত কথাই না জিজ্ঞাসা করতেন—আমার মা কেন একলা আমাকে এ-পথে ছেড়ে দিয়েছেন। এজন্য আমার মায়ের উপর বহেনজির অভিযোগের অন্ত ছিল না। সুযোগ পেলেই আমার খালি মুঠো দুটো ভরে দিতেন কিসমিস আর বাদামে। ঘুমের মাঝখানে কতদিন টের পেয়েছি বহেনজি আমার গায়ের চাদরটা ঠিক করে দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে দেখতাম বহেনজি ঘুমোননি, শুয়ে শুয়ে যেন কি ভাবছেন।

বহেনজির অন্তর্বেদনার কথা জেনেছিলাম বহেনজির 'পড়োশীন্' চম্পাজির কাছ থেকে। দুটি মাত্র সন্তান নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। তাদের মানুষ করলেন, বড় করলেন কিন্তু বিধাতা বুঝলেন না দুঃখিনী মায়ের অন্তরের কথা।

একটি মাত্র ছেলে—মিলিটারী অফিসার। গত মহাযুদ্ধে সিঙ্গাপুরে মারা গেছেন আর মেয়েটি বড় হয়ে ভুলে গেল মায়ের কথা। মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও লুকিয়ে বিয়ে করে মার সংসার ছেড়ে চলে গেছে। পরে এও শুনেছিলাম—ভারতের একজন সেরা অপরূপা চিত্রতারকার মা আমার দুর্গা বহেনজি।

আজ কেউ নেই বহেনজির সংসারে, কোন বন্ধন নেই, পিছুটান নেই, তাই একান্ত হয়ে পথে বেরিয়েছেন দুর্গা বহেনজি। কিন্তু, আজ সহযাত্রীরাও তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় একা ফেলে এগিয়ে চলে গেছে। বলে গেছে গঙ্গোত্রীতে ত দেখা হবেই আর দেখাশোনার জন্য ত কুলিটাই রইল। চিন্তা কি! জ্বর ছাড়লে যেন কুলিটার হাত ধরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়েন তিনি—আগে গিয়ে ধর্মশালায় জায়গা ঠিক করে রাখবেন তাঁরা।

ভীষণ জ্বরে অচৈতন্যা বহেনজি, কোন হুঁস নেই। আমরা তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। সারাদিন কিছু খাননি—কুলিটা জানাল। এ অবস্থায় এ অজানা জায়গায় কোথায় পাই বার্লি, কোথায় পাই সাবু কিংবা একটু দুধ!

রামলাল দুধের খোঁজে গেছে গ্রামে। আমরা গভীর চিন্তায় আকুল—কী করি। ঠিক এমনি সময়ে আমাদের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। মাথায় দীর্ঘ জটাভার, গলায় রুদ্রাক্ষ, তুলসী, প্রবাল প্রভৃতি নানা প্রস্তরের মালা। শ্বেতকায়, শ্মশ্রুমণ্ডিত, এক গুচ্ছ ভ্রূর নীচে উদাসীন দৃষ্টি, কাঁধে মাত্র একখানা কম্বল, বগলে একখানা মৃগচর্মাসন, নগ্ন দেহে সামান্য একটু কৌপীন জড়ান। হেসে মিষ্টিস্বরে বললেন—ডরো মৎ বেটা। কুছ ফিকর মত কর। থোড়ী দের মেঁ সব ঠিক হো যায়গা। অব এইসা হি রহনে দিজিয়ে···ম্যায় ইনকো আভি দাওয়া দেতা হুঁ। থোড়া গরম দুধ ইনকো পিলা দো বেটা—বলেই খানিকটা সাদা সাদা মিশ্রির দানার মত কি যেন খাইয়ে দিলেন বহেনজিকে। আমরা ত বিস্ময়ে হতবাক, বুঝতে পারছি না আমাদের করণীয় কী!

রামলাল দুধ নিয়ে এল, সন্ন্যাসী নিজের হাতেই সবটুকু খাইয়ে দিলেন রোগিণীকে।

বললেন—ম্যায় আভি গোমুখ সে আ রাহা হুঁ, মুঝে বহুৎ দূর

যানা হ্যায়। ফিকর মত করো, কাল সুবা হোতেহি সব ঠিক হো যায়গা।

আশীর্বাদ জানিয়ে অতি সহজভাবেই সন্ন্যাসী বিদায় নিলেন। আমাদের যেন হঠাৎ আবার সম্বিৎ ফিরে এল। পরমুহূর্তেই আমরা দুজন বাইরে ছুটে এলাম, কিন্তু কোথায় তিনি!

সমস্ত রাতটা আমাদের বহেনজির কাছেই কাটল। ভোরের দিকে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা। চোখ মেলে দেখি বহেনজি স্নান সেরে জপে বসেছেন, মুখে স্নিগ্ধ হাসি। একবারও মনে হল না গতকাল ইনিই এত অসুস্থ ছিলেন। এখন আগামী পথযাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

বহেনজির চোখে জল, ঠোঁট কাঁপছে কৃতজ্ঞতায়। এমনি সময় সবাইর সামনে এক এক ভাঁড় গরম চা দিয়ে গেল রামলাল। বেশ শীত পড়েছে, ঠাণ্ডায় শরীরে বেশ একটা কাঁপুনি অনুভব করছি। সামনে ধূমায়িত চায়ের পাত্র।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৫০০ ফিট উপরে উঠে এসেছি। এখানে কোন ব্যবধান নেই মানুষে মানুষে, ধনী দরিদ্রে, ব্রাহ্মণ আর অচ্ছুতে। ভৌগোলিক ব্যবধান সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নেপালী আর গাড়োয়ালী, পাঞ্জাবী আর বাঙ্গালী, গুজরাটী আর মারাঠী, আসামী আর দক্ষিণী—একই সঙ্গে চলেছে একই মন্ত্র উচ্চারণ করে—হর হর মহাদেব, পতিতপাবনি সুরধুনি গঙ্গে। নীল আকাশের নীচে এক অখণ্ড মাটির মানুষ—বিশ্বাসী যাত্রীদল। নাস্তিকের গণ্ডি ভৌগোলিক সীমারেখায়—বিশ্বাসীর রাজত্ব ভুবনজোড়া।

॥ ২২ ॥

দেওদারের বন সুরু হল ধরালীর পর থেকেই। ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা পথ আর দেওদারের ঘন বনরাজি। টিয়ারং সবুজ বর্ন, টিয়াপাখীর ঝাঁক, প্রজাপতির দল ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসেছে সবুজ ঘাসে, তাতে ছোট ছোট রংবেরং-এর বনফুলের বুটি। স্তব্ধ পৃথিবী, নির্জন বনভূমি, শুধু পাখীর ডাক আর পাতার মর্মরধ্বনি কান পেতে শুনি। আমাকে পেয়ে যেন অধীর হয়েছে অরণ্যানী, কত কথা যেন বলতে চায় তারা। সবাইকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পথ চলি। ছায়াচ্ছন্ন আঁকা বাঁকা পথ আর তাতে আলোর ঝিলিমিলি। সমস্ত পথটা জুড়েই যেন ছেয়ে আছে আলো আঁধারের বিচিত্র এক 'চিলমন'।

অরণ্যের ভাষা আছে, গান আছে, বেদনা আছে। আমি আকুল হয়ে শুনি মহীরুহের মর্মবেদনা, শুনি বনানীর আনন্দ উচ্ছ্বাস।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত পথ চলি। গঙ্গোত্রীর আর দেরী নেই।

জঙ্গলা এল। হিমালয়ের কোলে ছোট্ট একটি গোত্রহীন চটি, ছোট্ট একটি চায়ের দোকান।

দূর থেকে শুনি গভীর ক্রুদ্ধ গর্জন—উপল-ব্যাহতার সংগ্রামের এক গগনভেদী আর্তনাদ। পর্বতের কন্দরে কন্দরে জেগেছে প্রতিধ্বনি, জেগেছে উল্লাস।

জাটগঙ্গা এসে মিশেছে জাহ্নবীতে।

নেলাং পাশ ছাড়িয়ে অনেক অনেক দূরে তিব্বতের হিমবাহ থেকে নেমে এসেছে জাটগঙ্গা।

সঙ্গমের উপর একটি লোহার পুল আর পাহাড়ের চূড়ায় ভৈরবের ভগ্ন মন্দির আর দেওদারের গহন গভীর অরণ্যানী।

যাত্রী পথ ভুলে যায়, ভুলে যায় আপন কথা। অবাক সঞ্চারী দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে শূন্যে, চেয়ে থাকে অসীমের পানে।

জঙ্গলার পাশ দিয়েই চলে গেছে তিব্বত যাবার পাকদণ্ডী পথ—লামাদের দেশে। দূরে দেখা গেল একটা বিরাট ছিন্ন দড়ির পুল ঝুলছে আপন মনে। বিগত দিনের একমাত্র সম্বল আজ অবহেলিত, ছিন্ন, অনাদরে আপন মনেই দোল খেয়ে যায় স্মৃতির দোলায়। পুলটি পেরিয়ে যেতেই সামনে এসে পথ রুখে দাঁড়াল ভৈরবঘাঁটির দুর্গম চড়াই !

আবার ভৈরবঘাঁটি। যমুনোত্রীর পথেও পেয়েছিলাম ভৈরবঘাঁটি আবার গঙ্গোত্রীর পথেও পেলাম একই নামের আর একটি ভৈরবঘাঁটি।

সোজা খাড়া পাহাড় উঠে গেছে আকাশের পানে। হঠাৎ আচমকা একটা কাঁপুনি লাগে যেন। তিন মাইলের চড়াই অতিক্রম করে যখন পর্বতের চূড়ায় এসে দাঁড়ালাম তখন সঞ্চয়ের ঝাঁপি আমার পূর্ণ হয়েছে আনন্দে আর চোখের জলে।

নির্জন ভৈরবঘাঁটি, নির্জন আকাশ আর ছোট্ট টিমটিমে একটি চায়ের দোকান।

গঙ্গোত্রী আর মাত্র ছ' মাইল। একটানা সোজা পথ গিয়েছে চলে, দেওদারের দল চলেছে সঙ্গে। অপূর্ব সে অনুভূতি, অপূর্ব সে মাদকতা। যাত্রীর দল আনন্দে আত্মহারা হয়ে চীৎকার করে ওঠে—গঙ্গা মাইয়া কী জয়। আকাশে, বাতাসে, অন্তরীক্ষে, মাটির বুকেও জাগে আনন্দের স্পন্দন, জাগে রোমাঞ্চের গভীর পরশ, জাগে বাঁধভাঙ্গা নদীর কল্লোল। সবার চোখের কোল বেয়ে নেমে আসে আনন্দাশ্রু।

ধন্য আমি, আমি সার্থক—তোমার পবিত্র ধূলির পরশে, তোমার পুণ্য সলিলে অবগাহন করে।

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতম্ ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুণাতু মাম্ ॥

এলাম গঙ্গোত্রী। আমার স্বপ্ন সার্থক হল। এই সেই গঙ্গোত্রী শ্রীমৎ পর্বতে অভিশপ্ত পূর্বপুরুষদের মুক্তিকামনায় সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর কঠিন তপস্যা করেছিলেন সগর বংশের উত্তরনায়ক রাজর্ষি ভগীরথ। স্বর্গের দেবী গঙ্গা সন্তুষ্ট হলেন কঠিন তপস্যায়। বেগবতীর খরতর প্রবাহ নেমে এল আকাশ থেকে। স্বর্গের দেবতারা ভয়ে কম্পমান, সৃষ্টি বুঝি শেষ হয়ে যায় উন্মাদিনীর দিশাহারা উন্মত্ত গতিবেগে। ইন্দ্রের ঐরাবত গেল ভেসে প্রচণ্ড স্রোতের আঘাতে, সমস্ত সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়! কিন্তু কে আছেন ব্রহ্মাণ্ডে যে প্রতিরোধ করতে পারেন বেগবতীর এই প্রচণ্ড গতিবেগ! কৈলাসপতি দেবাদিদেব মহেশ্বরের ধ্যান ভাঙ্গল। উন্মাদিনীকে সংহত করলেন আপন জটাজালে। পথ হারালেন গঙ্গা ভোলামহেশ্বরের জটারাশির মধ্যে। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এলেন স্রোতস্বিনী কৈলাসপতির বুক বেয়ে। মুক্তধারায় নেমে এলেন ধরিত্রীতে মাতা ভাগীরথী—মকরবাহিনী, মুক্তিদাত্রী। সগরবংশের ষাট হাজার সন্তানের অভিশপ্ত আত্মা গঙ্গার পবিত্র স্পর্শে শাপমুক্ত হলেন।

ধন্য হলেন ভগীরথ, ধন্য হলেন তাঁর পূর্বপুরুষগণ, ধন্য হল সগরবংশ, ধন্য হলেন ভারতভূমি, ধন্য হল ভারতবাসী—গঙ্গার পবিত্র ধারাস্পর্শে।

ভারতের সভ্যতা প্রথম গড়ে উঠেছিল এই গঙ্গার পারে। ভারতের ঐতিহ্যের ধারা, জাগরণের ইতিহাস সব কিছুই গঙ্গাকে নিয়ে, তাই সে ভারতকাহিনী গঙ্গার মতই পুরাতন ও পবিত্র।

হিমালয়কে ঘিরেই রচিত হয়েছে ভারতের মর্মবাণী—ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য। রচিত হল কত কথা ও কাহিনী, সুর ও ছন্দ আর স্মৃতির অর্ঘ্যমালা। কই, গঙ্গার মত পৃথিবীর অন্য কোন নদী ত' কখনও পেলনা এমন ভক্তির অঞ্জলি, স্তবস্তুতি, মন্ত্রপাঠ কিংবা অনুরাগের অশ্রুজল!

আমি জানি আমাকে, আমি অবিশ্বাসী—পশ্চিমী-শিক্ষায় পুষ্ট এক তর্কবাগীশ, কিন্তু তবুও বারে বারে আমার চোখদুটো এমনি করে জলে ভরে আসছে। শুভ্র হিমালয়ের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে নিশ্চিতভাবে জেনেছিলাম, আমার সঙ্কীর্ণ আমিত্বটুকু আজ নিঃশেষে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হিমালয়ের ওপার থেকে শুনি, যেন ভেসে আসে ত্র্যম্বকের অভয় বিষাণধ্বনি···কান পেতে শুনি—যেন বাজে, পাঞ্চজন্য শঙ্খ।

॥ ২৩ ॥

এলাম গঙ্গোত্রী। কিন্তু কখনও কী ভেবেছিলাম যে একদিন এই মহান্ তুষারতীর্থের পথে আমার পায়ের চিহ্ন পড়বে! এই ক্ষণকালের পটেই আঁকা রইলো চিরকালের ইতিহাস। এ স্মৃতি চিরজাগরূক হয়ে রইবে আমার মনমালঞ্চে। সীমার মাঝখানেই পেলাম অসীমের স্পর্শ। আমার স্বপ্ন সফল হল আজ।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০,৩১৯ ফুট উচ্চে ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত গঙ্গোত্রীর জনপদ। এই সেই যজ্ঞভূমি, যেখানে পঞ্চপাণ্ডব দেবযজ্ঞ করেছিলেন—কুরুক্ষেত্রে নরহত্যার পাপ, আত্মীয় বন্ধু ভ্রাতৃবধের নরকযন্ত্রণার বিষবহ্নির জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে। এই সেই পুণ্যভূমি। কর্মচঞ্চল জনপদ এই গঙ্গোত্রী—বস্তুতান্ত্রিক জগতের ছোঁয়া লেগেছে শ্যামল বনানীর ছায়াঘেরা বনাঞ্চলে।

যমুনোত্রীর মত নিরাভরণতা নেই এ তীর্থে, যমুনোত্রীর মতন দুরূহ কিংবা দুর্গম নয় এ পথ—তাই বুঝি এত যাত্রীর সমাগম। পাণ্ডার ভিড়, লোকজনের চলাচল, দোকানপাট, ধর্মশালা, চটি, ছেত্র সবকিছুরই কোলাহল আছে এখানে। কস্তুরী শিলাজিতের দোকান, চায়ের দোকান, দরজার দোকান—সবকিছুই নজরে পড়ে।

কিন্তু এ দেখতে ত' আসিনি—তাই কোলাহল থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়ালাম।

গঙ্গার মন্দির—চরণ ছুঁয়ে চলেছেন সুরধুনী গঙ্গা, জেগেছে সুরধ্বনি।

অপূর্ব, অচিন্তনীয় সে অনুভূতি। বিশ্লেষণ করে বোঝান চলে না। দাঁড়িয়ে ছিলাম একা। সমস্ত দিনের পথ চলার অবসাদ আমার দূর হয়ে গেছে। মনে হল আবহমান কাল ধরে এই পথেই চলেছে আমার আসা আর যাওয়া। আমি চিরকালের পথিক,

বিশ্রাম খুঁজি জীবনের সরাইখানায়। তাই বুঝি এমনি করে অনন্তকাল ধরে চলেছে পান্থশালার দ্বারে পথিকের করহানি।

প্রকৃতির এ দুর্গম অঞ্চলে এ মন্দিরটি স্থাপনা করেছেন সেনাপতি অমরসিংহ থাপা। সেও আজ অনেক কালের কথা—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে।

কালীকম্বলির ধর্মশালার সুন্দর একটি কামরায় আশ্রয় মিলেছে। কাঠের বাড়ী, সামনে একফালি বারান্দা। অবারিত নীল উন্মুক্ত আকাশ, দেওদার পাইনের বনবীথি, উপলবহুলা ক্ষীণকায়া ভাগীরথার উন্মাদিনী স্রোতরেখা। চারিদিকে গহন বন আর দিগন্তবিস্তৃত পর্বতশ্রেণী।

পাহাড়গুলির পিছনেই রয়েছেন কেদারশৃঙ্গ। কেদারগঙ্গা নেমে এসেছেন কেদারশৃঙ্গ হতেই। সগর্জনে আত্মনিবেদন করেছেন ভাগীরথীগঙ্গার নীল তুহিন স্রোতের আবর্তে।

কেদারগঙ্গার গতিরেখা ধরে এগিয়ে গেলে কেদারনাথ এখান থেকে মাত্র তিনদিনের পথ, কিন্তু সে পথ সাধারণ মানুষের জন্য নয়। দুর্গম, চিরতুষারে আচ্ছন্ন, ভয়াল, ভয়ঙ্কর, বিপদ্‌সঙ্কুল। শুনেছি কখন কখন সাধুসন্তরা এ পথ ধরেই কেদারনাথ দর্শনে যান। তীর্থযাত্রীর কাছে এ পথ অলীক স্বপ্ন। এ অভিযান বহু সাজসরঞ্জামে সজ্জিত পর্বতারোহীদের পক্ষেই শুধু সম্ভব। আমি এক অসহায় যাত্রী, শুধু ভাবনাই সার আমার। সেই কেদারনাথেই যাব যাত্রীপথ ধরে। একশ মাইলের উপর পথ, লাগবে প্রায় পনের দিন।

খোলা জানালা দিয়ে দেখছিলাম—দূরে দেখা যায় একটি কাঠের পুল, ছোট ছোট সাধুসন্তদের কুঠিয়া, ধর্মশালা।

গঙ্গোত্রীতে এসে আবার একে একে সব আপনজনদের খুঁজে পেলাম। মনে হল যেন দীর্ঘপ্রবাসের পর গৃহে ফিরে এসেছি!

কাশীর অবিনাশবাবু—সঙ্গে সেই একাদশ রুদ্রাণী, দত্তাত্রেয়জী

ও তাঁর স্ত্রী, কাঞ্চন বিনায়ক, ডাঃ দাঁতে, আসামের সেই আপনভোলা প্রফেসর ডাঃ বড়ুয়া—যিনি দিনে দশবার করে চশমা হারান নিজের নাকের ডগায় চশমা থাকা সত্ত্বেও আর কাজের সময় কোনকালেও তিনি ফাউণ্টেনপেনটি খুঁজে পেলেন না। একটা ভোঁতা পেন্সিল দিয়েই আগাগোড়া কাজ চালিয়ে নিলেন প্রফেসর। কলমটি কিন্তু নিশ্চিন্তে স্বস্থানে বিরাজমান—গরম-কোটের বুকপকেটে।

আর ডাঃ দাঁতে! সারাটা পথ শুধু হিসাব লিখেই গেলেন। দুধ চার আনা আর চা তিন আনা। একটি পয়সার এদিক ওদিক হবার জো আছে! মন্দিরে প্রণামীর থালাটায় হিসাব করে পয়সা ছুঁড়তেন, হিসাব করে চা খেতেন, সূক্ষ্ম হিসাব করে পাওনা মেটাতেন। হিসাব, হিসাব আর হিসাব নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তিনি, কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেহিসাবী। চোখের জল দেখলে নিজেকে কিছুতেই সামলে রাখতে পারতেন না। হিসাব নিকাশ সবকিছুই গোলমাল হয়ে যেত। গোপনে নিজের ভাগের রুটি বিলিয়ে দিতেন, অযাচিত দান করতেন গরীব সাধুসন্ন্যাসী, গাড়োয়ালী ভিখিরীদের। কেউ যাতে জানতে না পারে—কেউ যেন দেখে না ফেলে—সেদিকে কিন্তু ডাঃ দাঁতের ছিল প্রখর দৃষ্টি।

আমি দেখতাম আর হাসতাম। বিচিত্র মানুষের বিচিত্র আর একটি স্পেসিমেন!

মাণিকজোড় ছিলেন দুজনে—ডাঃ বড়ুয়া আর ডাঃ দাঁতে। প্রায় ষাটের কাছাকাছি ছিল দুজনেরই বয়স। যেমন ভাব ছিল তেমনি ঝগড়াও চলত দিবারাত্রি দুজনার। সে ঝগড়ার এক মুহূর্ত বিরাম নেই, আবার কেউ কাউকে ছেড়েও থাকতে পারেন না এক মিনিট। প্রত্যেকটি কথাতে প্রতিবাদ, প্রত্যেকটি কথাতে মতান্তর। ইনি বলেন চা ভাল, উনি বলবেন নীলগিরির কফির কাছে আসামের চা! ছ্যাঃ—বলে উৎকট একটা শব্দ করে হেসে

উড়িয়ে দিতেন বড়ুয়াসাহেবের যুক্তি। বোম্বে বড় না ডিব্রুগড়! আধ্যাত্মিক জগতে কার দান বেশী—সমুদ্র না পাহাড়ের? দাঁতে সাহেব গান ভালবাসতেন, বড়ুয়া সাহেব পড়তে। রাতের অন্ধকারে যেই না মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রফেসর ডস্টয়ভ্স্কির পাতা খুলে বসলেন অমনি সুরু হল দাঁতে সাহেবের মারাঠী লাবনি গান, আবার তেমনি দাঁতে সাহেবকে একটু একলা দেখলেই প্রফেসর তাঁর চোখের সামনে মেলে বসতেন সযত্নে আনীত তাস জোড়াটি।

তাস ছিল ডাঃ দাঁতের চক্ষুর বিষ। ইনি বলবেন পেসেন্স খেলায় ধৈর্য বাড়ে, উনি যুক্তি দিয়ে বোঝাতেন তাস খেলা মানেই ধৈর্যের অপব্যয়, সময়ের অপব্যবহার।

একটি জায়গায় কিন্তু অদ্ভুত মিল ছিল দুজনার—দুজনেই চুরুট খেতে ভালবাসতেন। চুরুটই ছিল দুজনের অভিমানের সন্ধি, বিবাদের নিষ্পত্তি। দুজনেই ছিলেন সত্যবাদী, স্পষ্টভাষী আর অগাধ পণ্ডিত।

সেদিনটির স্মৃতি আজও আমার মনে পড়ে। প্রফেসর বড়ুয়া যাবেন গৌহাটি আর ডাঃ দাঁতে চলেছেন বোম্বে। দুটি বৃদ্ধের সে কী আকুল কান্না, বিচ্ছেদ বেদনায় সে কী আকুল অন্তর্বেদনা দুজনার! দুজনেই কাঁদছেন। ফল্গুধারার বালিয়াড়ির বাঁধ আজ ভেঙ্গেছে।

দাঁতে সাহেব সারা বাজার খুঁজে খুঁজে বন্ধুর জন্য সংগ্রহ করে এনেছেন চমৎকার একজোড়া আইভরি কার্ড।

প্রফেসর বলেন—আমি কী দেব তোমাকে? আমার এই পুরোনো কলমটাই তুমি রেখো। কেমন!

প্রতিবাদ করেন ডাঃ দাঁতে। বলেন—তা কী হয়! তোমার কাজের জিনিস। আর কাজের জিনিস! সময়ে ত কোনকালেই খুঁজে পেলাম না কলমটাকে। না, না, এটা তোমার কাছেই থাক। লিখবে আর আমাকে মনে পড়বে।

দুজনেই কাঁদছেন, আর কী কোনদিন দেখা হবে বাকি জীবনের স্বল্পকালের গণ্ডীতে! আমি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এই ত জীবন! এই ত ভালবাসার অনুভূতি—হোক না সেখানে ভুল বোঝাবুঝি, বিবাদ বিসম্বাদ—কিন্তু, সবার উপরে যে ভালবাসার ফল্গুধারা লুকিয়ে আছে মনের বালুচরে—তার তুলনা কোথায় এ মাটির পৃথিবীতে!

আমি অবাক হয়ে দেখি!

গঙ্গোত্রীর ধর্মশালায় আবার চেনামুখের ভিড় জমেছে। কাশীর সেই মুখরা নেত্যবালা, আর তাঁর মেয়ে উমা। উমা যেন আরও সুন্দর হয়েছে, আরও নীরব হয়ে গেছে আগের চেয়েও। উদাস দৃষ্টি মেলে মেলে কেবল তাকিয়ে থাকে—কোন কথা বলে না। নীরবে কাঁদে আর তারস্বরে চীৎকার করেন মুখরা জননী। যমুনোত্রীর পথে গাংনানী ধর্মশালায় মার যে কঠিন ব্যবহার দেখেছিলাম সগ্ভোস্বামিহারা সন্তানের প্রতি—ভেবেছিলাম কোনদিন সে স্মৃতি ভুলতে পারবো না। কিন্তু ভুলে গেছি আমি। কারণ—যদি নিজের চোখে না দেখতাম, নিজের কানে না শুনতাম ব্যথিতা জননীর সে কী কাতর প্রার্থনা গঙ্গার মন্দিরে। সেদিনকার সেই দুঃখিনী মা আর কাশীর মুখরা নেত্যবালায় কত তফাৎ, কত ব্যবধান।

নেত্যবালা কাঁদছেন—মাগো! আমার একটি কামনা তুমি পূর্ণ কর, আমার উমাকে তুমি সুখী কর, একটু শান্তি দাও আমার মেয়েটাকে। সে কী কাতর প্রার্থনা, সে কী ব্যাকুল ক্রন্দন!

অবাক হয়ে যাই আমি। এই কী সেই মুখরা মহিলা, কাশীর স্বনামখ্যাতা বাঙ্গালীটোলার নেত্যবালা! গঙ্গোত্রী এসেই যেন বদলে গেলেন উমার মা, সারাদিন কাঁদেন আর পালিয়ে বেড়ান।

একদিন একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মন্দিরে গিয়ে নিজের জন্য ত কিছুই চাইলেন না। যে মেয়েটাকে এত বকতেন তার জন্যই কী আপনার সব প্রার্থনা, এত পথশ্রম!

তাকিয়ে দেখি উমার মা অঝোরে কাঁদছেন। কাশীর দজ্জাল নেত্যবালার চোখে জল—ভাবতেও অবাক লাগে, বিশ্বাস হয়না যেন।—উমা যে আমার নিজের মেয়ে নয় বাবা! সতীনের মেয়ে কিনা তাই ত সারাদিন ওকে আমি এমনি করে বকি। আমি ত আর আসল মা নই। উমা ঠিক জানে—এ আমার মনের কথা নয়। উমা বড় দুঃখিনী মেয়ে আমার—জীবনে কোনদিন স্বামীর সোহাগ পেলনা—বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন উমার বিমাতা নেত্যবালা।

আমি শুধু দেখছি আর শুনছি। কোনদিন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দৃষ্টিপাত করিনি, যুক্তি দিয়ে কিংবা তর্ক দিয়ে কখন বোঝাতে চাইনি আমার অবিশ্বাসী সন্দেহী মনটাকে। হিমালয়ের ঐ উদার অনন্ত পরিবেশে সব কিছুই সম্ভব, সব কিছুই সত্য, শিব, সুন্দর।

সেদিন ছিলাম শুধু একটি নীরব শ্রোতা, একটি নির্বাক দর্শক। আমি জানি আমাকে তাই সেই সত্যভাষণ কবুল করতে কিছুমাত্র শঙ্কিত নই। আমি দার্শনিক নই, সাহিত্যিক নই, কবি নই, মিশনারী নই—সর্বপ্রকার দার্শনিক ভণিতা থেকে আমি মুক্ত। জন্মেছি ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর মধ্যবিত্ত সংসারে আর মরবো নিঃস্ব কেরাণী হয়ে। ত্রিকালের দুইকালের খবর ত আমিই বলতে পারি অনায়াসে আর বিনাদ্বিধায় এই ছোট্ট জীবনের গণ্ডিতে বসে বসে। জীবনের পুরানো একঘেয়ে শুকনো যুক্তির ছেঁড়াপাতাগুলি আবার নতুন দ্যোতনায় দীপ্ত হয়ে উঠল হিমালয়ের কোলে।

॥ ২৪ ॥

ভীষণ শীত। বাইরের আকাশ শীতের বাতাসে কম্পমান, পাহাড়গুলো যেন জমে নিথর হয়ে পড়ে আছে। গরম কম্বল চাপা দিয়ে, গরম চা পান করেও যেন শীত যায়না। আগুন জ্বালিয়ে চারপাশে মৌজ করে বসেছে ধনী, দরিদ্র, তীর্থযাত্রী ও কুলির দল। হাত-পাগুলো জমে যাবার উপক্রম, মাঝে মাঝে হুহু করা শীতের হাওয়া এসে জমিয়ে দিয়ে যায় হাড়গুলোকে। বেশ শুয়ে শুয়ে শীতের আমেজ উপভোগ করছিলাম—চোখদুটো খোলা রেখে।

কিন্তু কে যেন বার বার আমাকে ভেতর থেকে খোঁচা দিতে লাগল। গঙ্গোত্রী এসেও শুয়ে থাকবে···চোখ বুজে শীতের আমেজ ভোগ করবে!

তাইত! বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হল, আবার একটা একটা করে সবগুলোকে গায়ে জড়িয়ে নিলাম। গরম ট্রাউজারস্, গরম কোট, গরম চাদর, গরম উলের সোয়েটার, মোজা, দাস্তানা, গরম কালো রংএর মন্‌কি ক্যাপ্‌টা চড়িয়ে তার উপর আবার ফেল্ট্ হ্যাটটা চাপিয়ে বিচিত্র এক সঙের সাজে কামরা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। তবুও শীতের কাঁপুনি যায় না।

বারান্দার কোণটাতে সামান্য একটা ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে একা বসে আছে তুলসীমঞ্জরী। অদ্ভুত ছিল শ্রুতিশক্তি। পায়ের শব্দে অনায়াসে বুঝতে পারত কে এলো আর কে গেল।

—কে, নতুন গোঁসাই না! তা এ শীতে বাইরে কোথায় চলেছ? বৈষ্ণবীর প্রশ্ন এড়িয়ে গেলাম। বললাম—তা তুমি একলা যে, তোমার বাউল কোথায়?

—তা জানিনা গোঁসাই। বলেই তুলসী যেন কেমন উদাস হয়ে যায়।

ধর্মশালার বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

চলতে চলতে অনেকটা দূরে চলে এসেছি। দেওদারের ঘন জঙ্গল আর অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ। ঘন পাতার আস্তরণ ভেদ করে সোঁ সোঁ শব্দে ছুটে চলেছে শীতের হাওয়া। মনে হল কে যেন ডাকছে আমাকে।

ভাগীরথীর ঊর্মিমুখর উপলাহত প্রবাহের দুইদিকে দেখা যায় শুধু শুভ্র পাথরের স্তূপ। বিচিত্র নানা বর্ণের ছটা, বিচিত্র নানা গঠন-নৈপুণ্যের অপূর্ব এক সমাবেশ। ভাগীরথীর সেই নয়নাভিরাম রূপের তুলনা মেলেনা আমার দেখা পৃথিবীতে। বড় বড় পাথর আর প্রবাহে চলেছে সংঘাত। সে কী কলোচ্ছ্বাস, সে কী মুর্ছনা! সমস্ত সংসার, সমস্ত পৃথিবী যেন ঝাপসা হয়ে আসে। অবলুপ্ত হয়ে যায় সমস্ত চেতনা প্রকৃতির নিশ্চিন্ত আশ্বাসে।

মনে হল এই ত সেই সাধনমার্গ, এই ত সেই জহ্নুর তপোবন। মহাতপস্যায় বসেছেন সুহোত্রের সন্তান ঋষি জহ্নু। ভগীরথ চলেছেন গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিলমুনির আশ্রমে সগরবংশের পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্ধারকল্পে।

ভাগবত বলছেন, কপিলমুনি হলেন পঞ্চম অবতার। পিতা কর্দম প্রজাপতি ও মাতা দেবাহূতির সন্তান মহামুনি কপিল, যাঁর রোষবহ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছেন সগরবংশের ষষ্টি সহস্র পুত্র। গঙ্গার পবিত্রধারাস্পর্শে মুক্ত হবেন অভিশপ্ত আত্মারা। ভগীরথ তাই চলেছেন বিজয়শঙ্খ বাজিয়ে মুক্তিদাত্রী স্রোতস্বিনীকে পথ দেখিয়ে। পথে গঙ্গার প্রবল প্রবাহে জহ্নুমুনির যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি সব ভেসে গেল। ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন ঋষিবর। তপোবলে এক গণ্ডূষে পান করলেন গঙ্গার স্রোতোধারাকে। এখন উপায়! ভগীরথ আবার ধ্যানে বসলেন। অনন্তর ভগীরথের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে জহ্নুমুনি আপন হাতে নিজের জঙ্ঘা কেটে মুক্তি দিলেন স্রোতোধারাকে, তাই গঙ্গার অপর নাম—জহ্নুকন্যা জাহ্নবী।

দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে, পশ্চিম গগনে ছোঁয়া লাগে গোধূলির রক্তরাগের। আসন্ন প্রদোষকাল। সম্পূর্ণ বিমুগ্ধ অবস্থায় মনে হল এই ত সমস্ত হিমালয় জুড়ে দাঁড়িয়ে আছ তুমি রঙ্গনাথ। সমস্ত ভুবনজোড়া তোমার নাট্যশালা আর চন্দ্রতারকার উজ্জ্বল দীপমালা। ঐ ত অপূর্ব প্রদোষকালীন নৃত্যের অপরূপ ভঙ্গিমায় তুমি দাঁড়িয়ে আছ নটরাজ শূলপাণি। এক হাতে ডম্বরু, অন্য হাতে ত্রিশূল। জটাজুটসমাচ্ছন্ন নটেশ্বর ত্র্যম্বক দণ্ডায়মান। মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণ সিংহাসনে ত্রিভুবন-জননী সমাসীনা। দেব, অমর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, উরগ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর—ত্রিলোকের সর্বচরাচর নৃত্যশালায় উপস্থিত। সুরু হল দেবলোকে অপূর্ব ঐকতান—সপ্ত সুরের সুর-ঝঙ্কার। বীণাপাণি সরস্বতী তুলেছেন বীণার ঝঙ্কার, ইন্দ্রদেব মধুর সুর তুলেছেন বাঁশীতে, দামামা বেজেছে বিষ্ণুর করাঘাতে, প্রজাপতি ব্রহ্মার করতালের মধুর নিক্কণে সর্বচরাচর সম্মোহিত, স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মী পিনাকপাণির প্রশস্তিগীতি সুরু করেছেন মধুরকণ্ঠে। সন্ধ্যানৃত্যরত নটরাজের নৃত্যের তালে তালে সারা ত্রিভুবন সুরে উন্মাদ। মনে হল যেন একা আমি দাঁড়িয়ে আছি—এক বিরাট মহাশূন্যে।

সন্ধ্যা নেমে আসে, অন্ধকারে ছেয়ে আসে বনভূমি।—ইধার একেলা কিঁউ বৈঠে হ্যায় আন্ধেরেমে।—একজন দণ্ডী সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে, সঙ্গে আরও কয়েকজন যাত্রী। সবাই গোমুখ দর্শন করে ফিরছেন। গোমুখের কথা শুনে মনটা আনন্দে নেচে উঠল। খুঁটে খুঁটে প্রত্যেকটি জ্ঞাতব্য তথ্য জেনে নিলাম তাঁদের কাছ থেকে।

বড় ভাল লেগেছিল সন্ধ্যাটিকে আর অপরিচিত এই সন্ন্যাসীকে। হিন্দীতেই সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছিল। আমাকে অতি শান্ত কণ্ঠে বললেন—ইস সংসার মে মনুষ্য স্বতন্ত্র জন্ম লেতা হ্যায় মগর রাস্তা ত একহি হ্যায়। বলছিলেন—সেই অজানাকে জানতে হলে পরা ও অপরা দুই বিদ্যারই প্রয়োজন। চাই জ্ঞান, চাই ভক্তি।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, আপনি উপনিষদ্ পড়েছেন? উপনিষদ্ পড়ুন। যাঁকে জানলে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রশান্ত হয়, সেই জ্ঞেয় পদার্থ পরম ব্রহ্ম উপনিষদ্শাস্ত্রেই নিশ্চিত হয়েছে। তাঁরাই ধন্যপুরুষ—যাঁরা সেই পরমার্থের হিসাব রেখে সংসার হতে বিচেষ্ট হয়েছেন। আর যাঁরা সেই পরমার্থ-তত্ত্বানভিজ্ঞ তাঁরাই সারাজীবন ঘুরে মরেন সংসারের এই ভ্রান্তি-আলয়ে!

যজ্‌জ্ঞানং প্রশমণকরং যদিন্দ্রিয়াণং তজ্‌জ্ঞেয়ং যদুপনিষৎসু নিশ্চিন্তার্থম্। তে ধন্যা ভুবি পরমার্থ-বিনিশ্চিতেহাঃ শেষাস্তু ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমন্তি॥

—সেই অমৃতস্বরূপ পরমব্রহ্মকে জানুন, ভাল করে জানুন। শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশঙ্করাচার্য মহারাজও ঐ পরমতত্ত্ব-কথাই বলে গেছেন।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে একটা চায়ের দোকানে এসে বসলাম। গরম চায়ের ভাঁড় সামনে রেখে নানা কথা চলছে। হঠাৎ দণ্ডী-সন্ন্যাসী আনন্দে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—আরে আপনি বাঙ্গালী! আগে বলতে হয়।

—বাঙ্গালী তা বুঝলেন কি করে?

—বুঝলাম কী করে! বাঙ্গালী গন্ধ কি আর লুকানো থাকে দাদা? এই যে আপনার কোটের পকেটে দিব্যি উঁকি দিচ্ছে কলকাতার ডাকঘরের ছাপমারা বাঙ্গলায় লেখা পোষ্টকার্ডখানা—বলেই প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন স্বামীজি।

সদালাপী হাস্যরসিক নবীন দণ্ডীস্বামীজি অাত অল্পক্ষণেই আসরটিকে জমিয়ে নিলেন আর জয় করে নিলেন আমার সদাসঙ্গলিপ্সু মনটাকে।

—এখনও দেশের লোক দেখলে আপনার এত আনন্দ হয়?—প্রশ্ন করি, কারণ সন্ন্যাসীর এ ছেলেমানুষি দেখে সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম সেদিন। সংসার-বিরাগীর এখনও এত মায়া, এত মমতা!

—তা ভাই, সন্ন্যাসী হয়েছি বলেই কী দেশের কথাও মনে পড়বেনা! গৃহ ছেড়েছি বলেই কী ঘরের কথা ভুলতে হবে! প্রেম ভালবাসা ছেড়ে রসকষ-বিবর্জিত অবস্থায় ভগবৎ-সাধনা করব এমন ত কোন কনট্রাক্ট্ করে পৃথিবীতে আসিনি ভাই—বলেই চুপ হয়ে গেলেন দণ্ডী সন্ন্যাসী। গরম চা জুড়িয়ে গেল!

আবার অল্পক্ষণ পরেই হঠাৎ নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিলেন হো হো করা প্রাণখোলা মিষ্টি হাসি ও সরস রসিকতায়।

বললেন—আর এক ভাঁড় চা চাই যে, নইলে যে জমে যাবো ঠাণ্ডায়। আহা! এমনি দিনে নলেনগুড়ের সন্দেশ আর খেজুর-গুড়ের পায়েস! আচ্ছা ভীমনাগের সন্দেশ আর দ্বারিক ঘোষের স্পঞ্জ রসগোল্লার কোয়ালিটি আগের মতই আছে না ডেটরিয়রেট্ করেছে?

বেশ কাটল সন্ধ্যাটি। আবার দেখা হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন তিনি।

॥ ২৫ ॥

গঙ্গার পার। নিস্তব্ধ পাহাড়ী জনপদ, জোনাকির মত জ্বলছে মিট মিট করে গৃহস্থের সন্ধ্যাপ্রদীপ। গঙ্গার মন্দিরে আরতি স্থরু হয়েছে। সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়ে সমস্ত নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে ভেসে আসে ঢাকের গম্ভীর নিনাদ—গুম, গুম, গুম।

এমনি করেই কাটে গঙ্গোত্রীর দিনগুলি। একদিন···ছুইদিন··· তিনদিন। সেদিন একলা বসে ছিলাম নদীর পারে। আরতির সময় হয়ে এসেছে। যাত্রীদল চলেছেন সারে সারে মন্দিরে। আমি দূর থেকে দেখি।

সবাই চলেছেন মন্দিরে—হাতে পূজার উপচার। উমা, তার মা, দাঁতে আর বড়ুয়া, অবিনাশবাবু, কাঞ্চন বিনায়ক···সবাই চলেছেন মন্দিরে! বাউলও চলেছে তার অন্ধ প্রিয়ার হাত ধরে ধরে। কত যাত্রী, কত পাণ্ডা।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল···বাউল বৈষ্ণবীকে একা ফেলেই মন্দির থেকে চলে আসছে।

কী হোল! কোথায় চলেছে বাউল!

কালক্ষয় না করে বাউলের পথ আগলে দাঁড়ালাম। দেখি বাউলের আজ ভিন্ন রূপ। চোখ লাল, হাত পা কাঁপছে, দৃষ্টিতে ভাষা নেই—উদাস পাগলের মত চাহনি। বোকার মত আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় চলেছ?

—আমার পথ ছেড়ে দাও গোঁসাই, আমি আর সইতে পারছি না।

বাউল আকুল হয়ে কাঁদছে।—আমি আর পারছি না মিথ্যাকে বুকে নিয়ে পথ চলতে···আমি আর পারি না, আমাকে পালাতে দাও।

বাউলের এ বিসদৃশ আচরণে আমিও সেদিন খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। অঞ্জলি ভরে গঙ্গার জল এনে বাউলের চোখে মুখে ছড়িয়ে দিলাম। বাউল যেন খানিকটা আশ্বস্ত হল।

—মিথ্যা দিয়ে জগৎ ভোলান যায়, তোমাকে ভোলান যায়, কিন্তু নিজেকে ত ভোলান যায় না গোঁসাই। আর যে পারি না পাপের যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে। পাপমনের পূজা ভগবান কখন গ্রহণ করেন না, তাইতো পালিয়ে এলাম।

আমি চুপ করেই ছিলাম। আজকে আমার শুধু শোনার পালা।

—দুনিয়ায় কেউ জানে না, কেউ জানে না···তুলসীও জানে না। তোমার কাছে বলবো গোঁসাই, সব বলবো।

—সেদিন কীর্তনের বায়না নিয়ে রাণাঘাটে আমি যাইনি, সারাদিন লুকিয়ে ছিলাম—জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলাম। নিজের চোখে সব দেখলাম। সেদিন ছিল ঠাকুরের হিন্দোল যাত্রা। কলমীহাটার চরণদাস সন্ধ্যার সময় আখড়ায় এল। কী আনন্দ দুজনার! নিজের চোখে সব দেখলাম আর হিংসার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেলাম। কিছুতেই পারলাম না নিজেকে বোঝাতে, প্রতিহিংসার আগুনে ঝলসে গেলাম। সব ভুলে গেলাম আমি··· গুরুর দেওয়া নামটুকু পর্যন্ত স্মরণে এলনা সেদিন। রাত্রি গভীর হল। মাটিতে আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে আছে তুলসী আর চরণদাস। ···এইত সুযোগ! মহা সুযোগ। নিজের হাতেই আগুন লাগিয়ে দিলাম নিজের আখড়াতে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, সোনার সংসার আমার ছাই হল চোখের সামনে। কলমীহাটার চরণদাস পুড়ে মরল আর তুলসী আগুনের হল্‌কায় অন্ধ হল চিরদিনের জন্য। আর আমি আমার তুলসীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে দগ্ধ হলাম। আগুনে চরণদাস মরল কিন্তু আমার বুকের আগুন ত নিভল না গোঁসাই—আজও

যে তেমনি দাউ দাউ করে জ্বলছে আমার বুকের এই মাঝখানটায়।—বলেই আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে বাউল।

কাঁদুক আরও কাঁদুক—ভাল করে কাঁদুক, আজ চোখের জলে ধুয়ে যাক বাউলের মনের অন্ধকার। পোড়ামাটির ছাই আর উড়বে না বাতাসে—সব কিছুই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাক আত্মাহুতির নির্মল অশ্রুর প্লাবনে!

বাউল কাঁদে। কাঁদুক...আরও ভাল করে কাঁদুক।

শূন্যে মুখ তুলে নীরব ভাষায় আকুল মনের বুকফাটা কান্না জানায়—গুরু, আমার পথ বলে দাও গুরু।

মন্দিরের আরতি শেষ হয়ে গেছে। রাতের আকাশ শীতে হিহি করে কাঁপছে, যে যার আশ্রয়ে ফিরে গেছে। আমি একা দাঁড়িয়ে, বাউল পথের ধূলায়।

—ওঠো...মন্দিরে চল। তুলসীমঞ্জরী যে তোমার আশায় পথ চেয়ে বসে আছে। ওঠো—চল।

আমার মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবে বাউল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, পথের ধূলা থেকে তুলে নিল তার অতিসাধের একতারাটি।

গঙ্গোত্রীর মন্দিরে এলাম। মন্দিরের দরজায় তুলসী ঘুমিয়ে পড়েছে, চোখের কোলে তখনও জলের শুকনো দাগ।

গঙ্গার মন্দির। হিমালয়ের গহন দুর্গম প্রদেশে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুর মানসক্ষেত্র। ঢুকতেই প্রশস্ত নাটমন্দির, সামনে কয়েকটি সিঁড়ি, তারপর এক স্বর্ণময় বেদীতে সমাসীনা নানা অলঙ্কারে ভূষিতা গঙ্গামাতার মূর্তি। আশেপাশে বিভিন্ন আকারের নানা অবয়বের নানা বিচিত্র দেব-দেবী। নাম জানিনা তাঁদের। তাঁদের পরিচয়ও আমার জানা নেই, কিন্তু অবহেলায় তাঁদের এড়িয়ে যাবার স্পর্ধা কিংবা সাহস আমার ছিল না। প্রদীপের কম্পমান আলোয় প্রায়ান্ধকার মন্দিরাভ্যন্তর মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল।

গঙ্গাজির মন্দিরের বেদী ঘিরে ভক্তের ভিড়—তার চেয়েও ভিড় পাণ্ডাদের। কেউ পূজা দেওয়াচ্ছেন কেউবা যজমানের অভাবে অকারণে যাত্রীর কানের কাছে সবিনয় নিবেদন পেশ করছেন। মনে যথাযুক্ত ভক্তি না থাকলেও কিংবা আত্মচেতনা সত্ত্বেও যাত্রীদের নির্বিবাদে এঁদের এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

মন্দিরের গর্ভগৃহে দাঁড়িয়ে এক অনাস্বাদিত আত্মশ্লাঘা অনুভব করছিলাম বার বার—"মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের অনাদরে আর অবহেলায় প্রজনিত এক অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের মালিক আমি, না আছে আশা, না আছে আকাঙ্ক্ষা। শুধু খানিকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁচড়ে চলার নামই ত জীবন আমাদের। আঁতুড়ঘর থেকে এক ছুটে কেওড়াতলার বুড়ীর ঘর ছোঁয়া। ব্যাস। এখানেই তামাম শোধ—একটি আশার, একটি স্বপ্নের, একটি জীবনের।"

জীবনের সেই অন্ধকার আকাশে কোনদিন এল না নবীন সূর্যের করসম্পাত, চেতনার অন্তরীক্ষে কোনদিন রামধনু তার রঙিন পাখা মেলে বিস্তার করেনি স্বপ্নের মায়াজাল। শুধু জীবনের কর্দমাক্ত পথ ঠেলে চলা। কোথাও মুক্তি নেই, পিছনে ছুটে আসে কামনার রক্তবীজ—বুভুক্ষিত সন্তানের দল। পালিয়ে যাবার পথ অবরুদ্ধ, মুক্তির পথ সুদূরপরাহত। এই ত জীবনের ছবি দেখেছি শহরের অলিতে গলিতে, পাশের বাড়ীর সংসারে—জীবনের সর্বত্র।

কল্পনার আকাশ আজ মসীলিপ্ত, নীরন্ধ্র অন্ধকার, সেখানে উড়ে পালিয়ে যাবার একমাত্র ভরসা পাখাজোড়াও পক্ষাঘাত-গ্রস্ত। স্বপ্ন দেখাও পাপ এ সংসারে। ভাববিলাসী আমার মন বহুভাবে বার বার নিন্দিত হয়েছে এ বস্তুতান্ত্রিক জগতে। কিন্তু তবুও আমার মন বলেছে এই ভাল। বস্তুবাদী বলে প্রশংসিত হবার চাইতে ভাববিলাসী বলে নিন্দিত হওয়া অনেক ভাল—অনেক সুন্দর। গরমিল অনেক ভাল গোঁজামিলের মারপ্যাঁচের চাইতে।

এখানে পিতামাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা নেই, ভাইএর প্রতি

বোনের ভালবাসা নেই, স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস নেই, সন্তানের প্রতি মমতা নেই, শুধু আছে যুক্তিহীন এক কর্তব্যবোধ।

বন্ধু মেলেনা এ কঠিন সংসারে, মেলে সঙ্গী—সকালে দশটা পাঁচটার অফিসে, দুপুরে কফিহাউসে, সন্ধ্যায় পানশালায় আর রাত্রে মেলে সঙ্গিনী—শয্যাপার্শ্বে।

আমাদের এ নাগরিক জীবনে না আছে বিস্তার না আছে সূক্ষ্ম অনুভূতি। এখানে ভালবাসা নেই, আছে, স্নেহ নেই, প্রীতি নেই, মমতা নেই—আছে গেঁ নতুন অভিনয়। তাই পালাতে চেয়েছি বার বার। মত পথ চলেছি, বিভ্রান্ত হয়েছি বার বার। কিন্তু মন তবুও কখনও চায়নি উন্নতশিরে মেরুদণ্ডহীন সমাজের অনুশাসনের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে।

জানি এ পালানোর ভেতর যুক্তি নেই, পৌরুষ নেই, কিন্তু শান্তি আছে, মুক্তির আনন্দ এতে আছে। এ আমার একান্ত নিজস্ব অভিমত। তাই একদিন সংসারের কোন বাধা না মেনে উৎসাহহীন মন ও অবসন্ন দেহের দুর্বহ বোঝাটি টেনে নিয়ে এসেছিলাম সুদূর হিমালয়ের দুর্গম পথে পথে, শুধু একটু শান্তি পাব—এই আশায়। এসেছি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে— দুর্গমতাকে তুচ্ছ করে। কারও কাছে দাসখৎ লিখে আসিনি— এসেছি নিজের প্রেরণায় নতুন কিছু পাব বলে। ফিরে গিয়ে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কিংবা কফিহাউসের সঙ্গীমহলে বাহবা লুটবার অভিপ্রায়ে আসিনি।

মন চেয়েছে তাই এসেছি। আজ আমার বুভুক্ষু আত্মা শান্তি খুঁজে পেয়েছে, বিশ্রাম পেয়েছে হিমালয়ের এই উদার পান্থশালায়—গঙ্গোত্রীর এই গঙ্গার মন্দিরে।

প্রদীপের কম্পমান আলোয় অবাক হয়ে দেখছিলাম দেবী-মূর্তিটিকে।

স্বর্ণাভ সূর্যকিরণে উজ্জ্বল জননী তোমার সোনার কিরীট, কণ্ঠে তোমার পদ্মরাগ মহানীল ইন্দ্রনীলে বিভূষিত মৌক্তিক হার। কোটি কোটি চন্দ্রের উজ্জ্বল আভায় দীপ্ত জননী তোমার দেহের বর্ণচ্ছটা, লক্ষ লক্ষ তারার কনকোত্তম কান্তিতে জ্যোতিষ্মতী জননী তোমার মুখচ্ছবি... সন্তানের কল্যাণকামনায় মাগো তোমার স্বর্গাবতরণ। ...ভারতভূমি আজ তোমার আশীর্বাদে পূত ও পবিত্র। ...ার প্রণাম জানাই। আমাকে তুমি পবিত্র কর—পুণাতু ...ম্...পুণাতু মাম্।

...মনে পড়ে মহর্ষি বাল্মীকি রচিত গঙ্গার স্তুতিগাথা—ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তর্গতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং, ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথ বা কচ্ছপঃ। নৈবান্যত্র মদান্ধ-সিন্ধুর-ঘটা-সংঘট্ট-ঘণ্টা-রণৎকার-ত্রস্ত-সমস্ত-বৈরিবনিতা-লব্ধ-স্তুতির্ভূপতিঃ ॥

চিরকাল ধরে এমনি করেই চলেছে তোমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তীর্থযাত্রীদল জীবনের জ্বালা জুড়াতে। সামনে আকাশ-ছোঁয়া হিমালয়ের তুষারগিরিশৃঙ্গ—পিছনে রইল পড়ে দুদিনের খেলাঘর।

যাত্রীদল চলেছে হিমালয়ের পথে পথে। আমি তাদেরই একজন সহযাত্রী। এ চলার আদি নেই, যতি নেই, অন্ত নেই। চলেছে সাধু সন্ন্যাসী, আতুর খঞ্জ, ফকির ব্যবসায়ী—চিরকাল এমনি করেই চলেছে ভ্রাম্যমাণ যাযাবর মানুষের দল।

একমাত্র পুত্রকে অকালে হারিয়ে চলেছেন দুর্গাবহেনজি, ভবের হাটে ঠাঁই মেলেনি ভবঘুরে বাউলের, তাই চলেছে বৈষ্ণবীকে নিয়ে নতুন আখড়া খুঁজে নিতে, উমা এসেছে শূন্যের খাতা পূর্ণ করে নিতে তাঁরই আশীর্বাদে। পিছনে রয়েছে সংসার, রয়েছে স্মৃতি, রয়েছে মোহবন্ধন। চলেছে মহাজনতার মিছিল।

ভারতের এই প্রাচীন তীর্থ-অঙ্গনে ভিড় করেছে ভারতের প্রতিটি দেশের মানুষ। এখানে মানুষের মনের সীমানায় আঁচড় কাটেনি প্রাদেশিকতা। এখানে কেউ কারও অপরিচিত নয়।

যেন একজন আর একজনের কতকালের চেনা, নিত্যকালের বন্ধু। একই পথে চলেছে যাত্রীর আনাগোনা। উদ্দেশ্য এক, এক আহার, একই পথে পদব্রজন, একই চটিতে রাত্রিযাপন, এক সমস্যা, এক সমাধান, একই দুঃখ, একই কায়ক্লেশ, একই হাসি, তামাসা, আনন্দের সমাবেশ।

এখানে যৌবনের চঞ্চলতা নেই, প্রৌঢ়ত্বের অযাচিত উপদেশ নেই। পুরুষের দম্ভ নেই, নারীর মিথ্যা লজ্জাজড়তা নেই।

কী একতা আজ মানুষে মানুষে! এপথে বিলাস নেই ব্যসন নেই, নেই গৃহের আরাম কিংবা গৃহিণীর পরিচর্যা, পর্যাপ্ত আহার পর্যন্ত মেলেনা এ পথে। কিন্তু আছে সুখ, আছে শান্তি, আছে মধুর অবকাশ। এ পথ তীর্থযাত্রীর—ট্যুরিস্টের ছকে বাঁধা পথ এ নয়। এখানে একমাত্র সম্বল—পূর্ণবিশ্বাস আর গিরিমাটিতে ছোপানো একটি উদার মন।

॥ ২৬ ॥

গাড়োয়ালের পার্বত্যভূমির আঁকাবাঁকা অশ্মর পথে চলতে চলতে মানসপটে অনেক সময় অনেক পুরানো ইতিহাসের ছবি বার বার জেগে উঠেছে—বার বার অকারণ পুলকে মন চঞ্চল হয়েছে।

আমি ঐতিহাসিক নই, জ্ঞান আমার অতি অল্প, তাই লিখতে বসে বার বার হাত কাঁপছে শঙ্কায়—ভুল বলছি না ত কিছু। মিথ্যা কল্পনা দিয়ে ইতিহাসকে ব্যঙ্গ করার প্রয়াস আমার নেই। শৈশবকালে ইতিহাসের পাতায় কোনকালেও শুনেছি বলে ত মনে পড়েনা গাড়োয়ালের নাম কিংবা শাসক আর শাসিতের ইতিহাস, কিন্তু সযত্নে অভ্যাসমত মুখস্থ করেছি ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস। শিশুমন বার বার রোমাঞ্চিত হয়েছে অ্যালফ্রেড দি গ্রেটের বীরত্বে, চমকিত হয়েছি অলিভার ক্রমওয়েলের নতুন ব্যবস্থাপনায়, পুলকিত হয়েছি বার বার স্কটল্যাণ্ডের কুইন মেরীর প্রেমগাথায়।

গাড়োয়ালের ইতিহাস আমি শুনেছি পথ চলতে চলতে, শুনেছি লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে, শুনেছি ভুলে-যাওয়া কাহিনীর পুনরাবৃত্তিতে—উদাসী গাড়োয়ালী পথিক চারণের মন-ভোলান গানে।

শুনেছি—রাজা সোমপাল, অজয়পালের কীর্তিকাহিনী আর রাজা প্রদ্যুম্নর ব্যথার ইতিহাস। গাড়োয়ালের নামকরণ প্রাচীন নয়, মাত্র শ পাঁচেক বছর আগে কনকসাম্রাজ্যের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা অজয়পাল সমস্ত নিকটবর্তী দেশসমূহ জয় করে নিলেন আপন বাহুবলে। তারপর সমস্ত রাজ্যের গড় একত্রিত করে নতুন নাম দিলেন গড়বাল আর রাজধানী স্থাপনা করলেন দেবলগড়ে।

খ্রীষ্টের মৃত্যুর ৭৪৫ বছর পরে ব্রহ্মপুরায় প্রথম রাজ্য পত্তন হল পানোয়ার রাজবংশের। রাজা সোমপাল—রাজধানী দেবলগড়। নিজের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ দিলেন ধারানগরের যুবরাজ কনকপালের

সঙ্গে। সুরু হল ধারা বিবর্তন—পানোয়ার রাজবংশের ইতি আর কনকবংশের সূচনা।

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবল পরাক্রমে রাজ্যশাসন করে গেলেন কনক বংশীয় রাজারাই—রাজত্ব কেদারখণ্ড। তারপর এলেন রাজা অজয়পাল। এর পর গড়বালের সুসমৃদ্ধ রূপায়ণে ঈর্ষান্বিত হলেন হিমালয়ের অন্যান্য নৃপতিবৃন্দ, তিব্বতী লামারাও এগিয়ে এলেন গড়বাল কুক্ষিগত করার মানসে। ১৮০৩ সাল পর্যন্ত কনকবংশীয় চুয়ান্ন জন রাজা এ ভূখণ্ড শাসন করেন।

শেষ স্বাধীন নৃপতি প্রদ্যুম্ন শাহ তখন সিংহাসনে, প্রধান-সেনাপতি বিদ্রোহ করলেন গুর্খাদের সহায়তায়। সেনাপতির স্ত্রী ছিলেন একজন অসামান্যা তেজস্বিনী নেপালী রমণী। গুর্খারা অনায়াসেই জয় করে নিল গড়বাল।

বার বৎসর পরে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সুদর্শন শাহ ইংরেজের সাহায্য কামনা করলেন। ভীষণ যুদ্ধ হল, গুর্খারা পরাজিত হল। টেহরী গড়বাল রইলো রাজা সুদর্শনের অধীনে—রাজধানী স্থাপনা করলেন ভাগীরথী আর ভিলাঙ্গনার সঙ্গমে—টেহরীতে। বাকি সাম্রাজ্য কেড়ে নিলেন ইংরেজরা। সেই থেকে গড়বালের অপর অংশ ব্রিটিশ গাড়োয়াল নামে বিখ্যাত। মাঝখানে রইল মেহেলচৌরী দুই সীমানার মাঝখানে রাজসাক্ষী হয়ে। তারপরের একশ বছরের ইতিহাস লেখা আছে ইংরেজের লেখা কাহিনীতে—নানা ফাঁকি আর মিথ্যার মাধ্যমে।

ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের প্রাণকেন্দ্র এই উত্তরাখণ্ড, পুরাণে যার পরিচয় ভূস্বর্গ ব্রহ্মপুরা নামে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজের মেলা, উত্তুঙ্গ পর্বতমালার অন্তহীন শোভাযাত্রা। এ পথে প্রকৃতির যৌবনের জয়যাত্রা—খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, নামে বরষার অঝোর ধারা, কখন বা বসন্তের সমাগমে রঙের আগুন লাগে বনানীর শীর্ষে। পথ চলি আর দেখি। ফুল আর ফলে ছেয়ে আছে পর্বতের গাত্রদেশ, দেখি রাশি রাশি পুষ্পস্তবকে বিনম্র বৃক্ষরাজি।

কত নদী কত ঝরণা নিশিদিন বয়ে চলেছে আপন ছন্দে। অবাক হয়ে ভাবি—এই সেই পুণ্যভূমি যেখানে মহামুনি বেদব্যাস রচনা করেছিলেন শিবপুরাণ। এই সেই উত্তরাখণ্ড যার অন্তর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেন—যমুনা, জাহ্নবী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী। একদিন এই উত্তরাখণ্ডের পথে এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক হু-য়েন-সাং। ভূস্বর্গ চঞ্চল হল, পবিত্র হল পরিব্রাজকের চরণ-ধূলায়। পূর্ণ হল তাঁর ভারতদর্শন।

গঙ্গোত্রী ধর্মশালায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম নানা কথা। রাত অনেক হয়েছে। সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। দীর্ঘপথশ্রমে সবাই ক্লান্ত, উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, আজ তাই এসেছে বিশ্রামের পালা। আরও দু চারদিন এখানে বিশ্রাম করে যে যার মত দেশে ফিরে যাবে।

গোমুখের পথ অতি কঠিন, অতি ভয়ঙ্কর পথ—শুনলাম লোকমুখে। সেখানে না আছে মানুষ না আছে রাত্রিযাপনের সামান্য আশ্রয়। তাই অধিকাংশ যাত্রীই গোমুখ দর্শন না করেই ফিরে যান দেশে।

দণ্ডী সন্ন্যাসী আমাকে বলেছেন—গোমুখ দর্শন ব্যতীত গঙ্গোত্রী যাত্রা কখনও পূর্ণ হতে পারে না।

হোক সে দুস্তর পথ, হোক সে ক্লেশকর অভিযান। আমরা আশায় বুক বেঁধেছি।

॥ ২৭ ॥

এবার গোমুখ। মন্দিরের পিছন দিয়েই সুরু হয়েছে চড়াইয়ের দুর্গম সীমন্তিত পথ। অনুদার, অচিন্তনীয়, আদিম পথরেখা। তারপর রেখার চিহ্নও গেছে মুছে। পথনির্দেশকের সাহায্য ছাড়া গোমুখ যাওয়া চলে না। গাইড মিলেছে—নাম পুরুষোত্তম, ধরালীর লোক। এ দুর্গম পথে সঙ্গী মেলে না, খাদ্য মেলে না, আশ্রয় মেলে না।

পথিমধ্যে ভূজবাসায় একটি রাত কাটাতে হয়। আগে সেখানে রাত কাটাবার জন্য কোন বন্দোবস্ত ছিল না, তবে শুনলাম টিহরীর রাজপরিবারের অর্থসাহায্যে সম্প্রতি নাকি একটা কাঠের ঘর গড়ে উঠেছে। আগে রাত্রিবাসের জন্য পর্বতগুহাই ছিল একমাত্র ভরসা।

ঐ পথে যাবার আগে অনেক কিছু ভাবতে হয়। দুই তিন-দিনের মত অন্ততঃ খাদ্যের সংস্থান নিজেকেই বয়ে নিতে হবে। গঙ্গোত্রী থেকে ভূজবাসা ন'মাইল, ভূজবাসা থেকে গোমুখ চার মাইল।

পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে আমরা চলেছি লাফিয়ে লাফিয়ে। সমস্ত ভূখণ্ডই যেন দারুণ এক ভূকম্পনে ধ্বংস হয়ে গেছে—কেবল পাথর, পাথর আর পাথর। কত না রঙের বাহার—সাদা, গোলাপী, হলুদ, কালো—কত না রঙের জৌলুশ। পায়ে চলার দাগটুকু পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন। একটা পাথর থেকে আরেকটা লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করা একটা বিরাট্ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। চলার ছন্দে মাঝে মাঝেই পতন ঘটতে লাগলো। সারা উত্তরাখণ্ডের আর কোন যাত্রাপথই এমন প্রস্তর সমাকীর্ণ নয়। এ পথে তিতিক্ষার শেষবিন্দুটি শেষ

না হওয়া পর্যন্ত মেলে না তাঁর করুণাঘন আশীর্বাদ—মেলে না মুক্তির বিজয়তোরণ।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে—কখন ঝড়ে, কখন ঝঞ্ঝায়, প্রবল তুষারপাতে কিংবা প্লাবনে পাহাড়ের আকৃতির সদাই পরিবর্তন হচ্ছে। গোমুখের পথ প্রকৃতির অবদান। প্রতিবছরেই শুনলাম গোমুখের পথ-পরিবর্তন হয়।

দুই কূলে গগনস্পর্শী গিরিশ্রেণী আর কত যে ঝরণা, কত যে ঝোরা, কত যে নদী-নালা এসে গঙ্গায় মিশেছে তার হিসাব কে রাখে।

মাঝে মাঝে পূর্বগামী গোমুখযাত্রীদের রেখে যাওয়া সাজান পাথরের ছোট ছোট স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। দেখলেই বোঝা যায় মানুষের ছোঁয়া লেগেছে পাথরে। এরাই কঠিন পথের একমাত্র নিশানা—আলোর ঝলকানি, নিরাশার অন্ধকারে মুস্কিল আসান।

নয়নাভিরাম দেওদারের গহন বন, শুধু গাছ, গাছ আর গাছ। সূর্যের আলোও সোজা প্রবেশের পথ পায় না। এ পথে উদয়াস্ত আলো-ছায়ার আল্পনা আর কুয়াশার ধূম্রজাল। গগনছোঁয়া গাছের ডালপালাগুলো দৃষ্টির আড়ালে রেখেছে আকাশকে। সামনে পথ নেই, শুধু বৃক্ষের শোভাযাত্রা।

আমরা অন্ধের মত চলেছি নির্দেশকের পিছনে পিছনে। কোটি কোটি বছর আগেও এখানে যে রূপ ছিল পৃথিবীর আজও তাই আছে। সভ্যতার পায়ের চিহ্ন পড়েনি এই পথে। প্রকৃতির এ গহন অঞ্চলে শুধু শ্বাপদের আনাগোনা। মনে হল আমরাই প্রথম মানুষ চলেছি এই পথে—নতুন আবিষ্কারে।

অতি ছোট দল আমাদের—বেণু, রামলাল, আমি, আর সঙ্গে চলেছেন কাঞ্চন, বিনায়ক, ওদের কুলি সিংহবীর, একজন নাগা সন্ন্যাসী ও আমাদের নির্দেশক পুরুষোত্তম।

ভীষণ শীত। হাত-পাগুলো থর থর করে কাঁপছে, শীতে যেন ক্ষত-বিক্ষত আমরা। তবুও মনে ছিল অসীম আনন্দ, অপার উদারতা আর অনন্ত সুরের ছন্দ।

সামনেই ক্ষীণকায়া ভূজনদী—ভয়াল ভয়ঙ্কর উন্মত্ত রূপ। বরফের চেয়েও শীতল নদীর জল। কী ভীষণ স্রোত! ওপারে যাব কী করে!—বুক কাঁপছে ভয়ে, দেহ কাঁপছে শীতে। দেখি সামনে একটা দেওদারের কাণ্ড পড়ে আছে নদীর উপরে। হেঁটে অতিক্রম করার কথা ভাবাও যায় না। দারুণ শঙ্কায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি এপারে—ওপারে আশার ঝলকানি আর মাঝখানে মৃত্যুর হাতছানি। প্রথমেই পার হয়ে গেল পুরুষোত্তম তারপর মালের বোঝা কাঁধে নিয়ে রামলাল, বিনায়ক, বেণুও পার হোল জীবন-মৃত্যুর এ গলিপথ। তারপর কাঞ্চন অতি ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় হেঁচড়ে হেঁচড়ে। বিনায়ক হাত বাড়ায়—কাঞ্চন অতি বিশ্বাসে লুফে নেয়।

আমিই শুধু রইলাম পড়ে এপারে। ওপারে সবাই দাঁড়িয়ে, জয়ের হাসি জড়ান তাদের নয়নে।

—আপ ডরতে হ্যাঁয় বাবুজি।

—কই না ত!

সামনে কঠিন পরীক্ষা। তারপর মনের সমস্ত দুর্বলতা জোর করে দূরে ঠেলে দিয়ে অতি সন্তর্পণে এগুতে লাগলাম—একটু নীচেই স্রোতস্বিনীর তীব্রগতিশীল দুর্বার প্রবাহ। সমস্ত শরীর ভিজে গেল স্রোতপ্রবাহের চূর্ণিতে।

এলো ভুজবাসা (১২,৪৪০ ফুট)। এখানে দেওদারের গহনতা নেই, আছে ভূর্জগাছের অকৃপণ সমারোহ। অসংখ্য ভূর্জগাছের নিবিড় ছায়ায় ছোট্ট একটি ঘর—পথিকের রাতের বাসা। ভূর্জগাছের নিবিড়কৃষ্ণ গহনতার আড়ালে আকাশের নীলিমাও অদৃশ্যপ্রায়। মাটির ছোঁয়া ছাড়িয়েই যেন ডালপালা-

গুলো এক মায়ার জাল বুনেছে সারাটা আকাশ জুড়ে। সাদা সাদা ডাল আর সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় আকাশ। চারিদিকে তুষারাচ্ছন্ন কঠিন উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী আর গভীর শূন্যতা।

কোন ত্রুটি রাখেনি বেটা রামলাল—সব যোগাড় করে এনেছে—চা, চিনি, দুধ। কাঠকুটো নিয়ে এল জঙ্গল থেকে আর নদী থেকে জল। পাথর দিয়ে উনান বানান হল, চায়ের জল চড়ান হল। কাঞ্চন কোমরে আঁচল জড়িয়ে লেগে গেল সংসারের ব্যবস্থাপনায় আর আমরা কাঠের গুঁড়িতে আগুন জ্বেলে চারিপাশে গ্যাঁট হয়ে বসলাম। চা তৈরী হল, খাবার সঙ্গেই ছিল, আর ভাবনা কী। পরমানন্দে লাঞ্চ আর ডিনার শেষ করে নিলাম একসঙ্গে আর এক আসনে বসেই। বেলা তখন তিনটা হবে।

ভূর্জপত্র থেকেই ভুজবাসার নামকরণ। নামের সার্থকতা সত্যি খুঁজে পাওয়া যায় প্রকৃতির এ নির্জনতায়। ভূর্জপত্র! নামটা শুনেই মনটা যেন ছুটে যায় প্রাচীনকালে। অপূর্ব সে অনুভূতি! অপূর্ব সে ব্যঞ্জনা!

বাকি বেলাটুকু একা একা ঘুরে বেড়ালাম বনের ভিতর দিয়ে গঙ্গার ধার ছুঁয়ে ছুঁয়ে। প্রাগৈতিহাসিক গহন অঞ্চল এ ভূজবাসা, শুধু পাখীর গান, নদীর কলতান আর ভূর্জপত্রের মর্মরধ্বনি।

বাইরে ভীষণ শীত। সন্ধ্যা নেমে এল অনেক তাড়াতাড়ি আর ভীষণ গভীর হয়ে। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেছে অনেকক্ষণ। শীতের প্রাবল্যে সবাই আমরা জড়সড়। সবার চোখে ঘুম নেমে এল, শুধু আমারই চোখে ঘুম নেই।

ভূজবাসার সে রাত্রিটির কথা মনে পড়লে আজও আমার সর্বশরীর ধীরে ধীরে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে—কিছুটা ভয়ে, কিছুটা আনন্দে।

তিন চারটে কম্বলেও যেন শীত যায় না। শুয়ে আছি, ঘুম আসছে না; কিন্তু বাইরে বসে যে প্রকৃতিকে পরাণভরে দেখব সে আশাও দুরাশা—এমনি শীত বাইরে।

সূচীভেদ্য নিঃঝুম অন্ধকার রাত্রি। সাড়া নেই, শব্দ নেই, শুধু মাঝে মাঝে পুঞ্জীভূত শীতের হাওয়া দোলা দিয়ে যায় ভূর্জবনে। পায়ের কাছে লণ্ঠনটা মিট্ মিট্ করে জ্বলছে—কালি জমেছে চিমনীটাতে। নিস্তব্ধ যামিনীর চলেছে অতি ধীর পদক্ষেপ, গঙ্গার কলগর্জন আর মাঝে মাঝে শুকনো ভূর্জপত্রে শুনি নিশাচর শ্বাপদের পদসঞ্চালন। রাতজাগা পাখী মাঝে মাঝে চীৎকার করে ওঠে ভয়ে। আবার হঠাৎ যেন সব চুপ হয়ে যায়, ঝিঁঝিঁ পোকাও বন্ধ করে আওয়াজ, শীতের হাওয়া তার ক্রুদ্ধ গর্জন। ছাইচাপা আগুনটা মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে দমকা হাওয়ায়। আগুনের বুঁদি বুঁদি স্ফুলিঙ্গ শূন্যে উঠেই মিলিয়ে যায়।

সমস্ত বিশ্বচরাচর মহানিশার নীরন্ধ্র অন্ধকারে অবচেতন, অবলুপ্ত। ঘুমিয়ে আছে আদিম পৃথিবী আর আদিম মানুষ। আমার চোখেও নেমে আসে ঘুমের নেশা—ঘুমিয়ে পড়ি নিশ্চল, নির্বাত, নিষ্কম্প মাটির কোলে।

॥ ২৮ ॥

ভোর হয়ে এল। সাদা কুয়াশায় আচ্ছন্ন দিগন্ত, তুষারের আস্তরণে নির্বাক পৃথিবী। সারারাত তুষারবর্ষণ হয়েছে, টের পাইনি। সমস্ত বনভূমি, গাছের ডালপালা, গঙ্গার ধার, চটির ছাদ সব কিছুই তুষারে আচ্ছন্ন···আর বাইরে শীতের কনকনে হাওয়া।

আমি ছাড়া সবাই প্রস্তুত। শ্রীমতী কাঞ্চন বেন এক গ্লাস গরম চা হাতে কাছে এসে দাঁড়ালেন, বিনায়ক মধুর হেসে প্রভাতী সম্ভাষণ জানালেন ঃ রামলাল আর সিংহবীর বিছানা বাঁধছে। বিছানাপত্র সবকিছুই এখানে রেখে যাবে, রামলাল জানালো।

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। বোকাটা বলে কী? কাণ্ডজ্ঞান কি কোনকালেও হবে না নির্বোধ নেপালীটার! পরে আশ্বস্ত হোলাম পুরুষোত্তমের কথায়—বাবুজি! গরীবের দেশ উত্তরাখণ্ড, কিন্তু একটি চোর পাবে না এ তল্লাটে। তোমার জিনিস কোনকালেও খোয়া যাবে না। সোনাদানা পড়ে থাকলেও কেউ ছুঁতে আসবে না। চেয়ে নেবে—ভিক্ষা করবে, কিন্তু কখনও চুরি করবে না। —কথাটা শুনে লজ্জিত হলাম মনে মনে। তাইত! বড়বাজারী টেক্‌নিকে কোমরে সযত্নে জড়ানো কাপড়ের লম্বা থলিটা যেন অসহ্য মনে হল সেই মুহূর্তে। শুরু হল বৃশ্চিকের দংশন। এখানে এসেও গেল না আমার নাগরিক জীবনের অবিশ্বাস।

ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দেখি বন্ধুবর সযত্নে পায়ে ফেট্টি বাঁধছেন আর মনের আনন্দে গুনগুন করে গান ধরেছেন।

অপূর্ব সুন্দর—মনোরম এক উদ্যানভূমি এ ভূজবাসা। এলাম যেন এক নতুন দেশে। নতুন আলোর অঞ্জন মেখে চোখ তুলে শুধু দেখি আর দেখি। সাধ মেটে না।

সমস্ত পাহাড়গুলিই বরফে ঢেকে আছে। বরফ গলছে আর

নতুন নতুন ঝরণাধারার জন্ম হচ্ছে, তর্ তর্ করে বয়ে চলেছে নিম্নাভিমুখে। আশেপাশের জল তখনও জমে আছে—তার ওপর কাঁচের মত পাতলা বরফের সর জমেছে, সাদা মসলিনে যেন সারা অঙ্গ ঢেকে আছেন প্রকৃতি। সামান্য স্পর্শেই কাঁচের মত ভেঙ্গে পড়ে—নীচে টলটল পরিষ্কার জলের আভাস। বরফ জমে বটের ঝুরি নেমেছে যেন পাথরের গা বেয়ে বেয়ে। টপ্ টপ্ ঝরে পড়ছে মুক্তাবিন্দুর মত। অপূর্ব রঙের ছটা, অপরূপ সে বর্ণ-বিন্যাস।

বিনায়ক বললেন—জানেন, পুরাণে কথিত আছে ভূজবাসাই নাকি নারায়ণ-ঘরণী দেবী মহালক্ষ্মীর আবাস-নিকেতন।

মহালক্ষ্মীর উপযুক্ত স্থানই বটে ভূজবাসা।

ভূজবাসা ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম আর সঙ্গে সঙ্গে মুছে আসতে লাগল সবুজের আলপনা। নিঃশেষ হ'য়ে এল ভূর্জগাছের সমারোহ। গাছ নেই, শুধু নিরাভরণ পাথরের বিক্ষিপ্ততা।

প্রায় তের হাজার ফিটের উপর দিয়ে আমরা চলেছি জাহ্নবীর উৎস সন্ধানে। বুকে যেন দোলা লাগছে দারুণ উত্তেজনায়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, বুকে একটা চাপ অনুভূত হতে লাগল।

পুরুষোত্তম পথ দেখিয়ে চলেছে এক নতুন রহস্যলোকের। গঙ্গা চলেছেন পাশে পাশে। পাথরের বুক আলো ক'রে আছে কত নাম-না-জানা রঙের কত অজানা বনফুল। পাষাণেও ফুল ফোটে। কত রঙ, কত বাহার!

দূরে দেখা যায় চিরতুষারে মণ্ডিত ধবল উত্তুঙ্গ এক পর্বতশৃঙ্গ। চলতে চলতে কুড়িয়ে নিলাম জীবনের এক অক্ষয় অবিনশ্বর অভিজ্ঞতা।

গঙ্গার প্রবাহ যেন বৃত্তাকারে ঘুরে গেল পর্বতের অভিমুখে। আমরাও চলেছি বৃত্তাকারে প্রবাহকে পাশে পাশে রেখে। হাতের লাঠিটাকে প্রবল উত্তেজনায় চেপে ধরেছি, বুক কাঁপছে। দূর থেকে শুনি ভাগীরথার ভীম গর্জন।

সম্মুখেই গোমুখের গুহামুখ। তখনও চোখে দেখিনি, শুধু

পেশীতে পেশীতে রক্তের অণুতে পরমাণুতে সমস্ত চেতনা দিয়ে যেন অনুভব করেছিলাম এক বিরাট উপলব্ধির পিনাক আহ্বান।

পথ ঘুরে গেল। সম্মুখে উপত্যকার গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত তুষারকিরীট—শতপন্থের শিখরচূড়া। তুষারে ঢেকে আছে সমস্ত উপত্যকাভূমি। আমরা জলের কিনারা ধরে ধরে এগিয়ে চলেছি। সম্মুখে বরফের বিরাট গুহা—গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। প্রকাণ্ড সে গুহা। সেই গুহার জঠর থেকেই নিঃস্রাবিত হয়েছে ভাগীরথীর জলধারা—গতিশীলা মর্ত্যগামিনীর প্রথম অভিযান। নিকষ কালো অন্ধকার গুহামুখ। 'দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।'

মুক্তির উচ্ছ্বাস যেন জেগেছে বাতাসে, সারাভুবন জুড়ে বেজেছে বিজয় ডম্বরু, মুক্তির মাদল বাজে তার সঙ্গে—তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ।

সমস্ত আকাশ সমস্ত পৃথিবী যেন ঝাপসা হয়ে এল ধীরে ধীরে এক গভীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে। সমস্ত দেহমন বিবশ হয়ে এল। সমস্ত চিন্তার স্রোত হঠাৎ যেন এক নিমেষে থেমে গেল। আমার সমস্ত সত্তা বিচূর্ণিত হল অনাস্বাদিত নতুন এক অনুভূতিতে।

এই সেই জাহ্নবীর উন্মাদিনী মুক্তধারা দেবাদিদেব মহেশ্বরের জটাজালে যা দিশাহারা। অতি সহজেই ভুলে গেলাম অতি দুস্তর দুরতিক্রম্য পথের কথা। ভুলে গেলাম যে এ পথে আশ্রয় মেলে না, খাদ্য মেলে না, দারুণ কঠিন শীতে কখন কখন বা আগুনও মেলে না, কিন্তু যা মিলেছে সে সঞ্চয়ে আমার ঝুলি পূর্ণ। সারাজীবনের গর্ব হয়ে রইলো শুধু এই ক্ষণটুকু।

উদার আকাশের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে ধ্যানগম্ভীর চিরমৌনী তুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গ, নীচে দিগন্তব্যাপী তুষারক্ষেত্র। দেখা যায় ভৃগুপন্থ, মেরুপর্বত, বাসুকি, নীলাম্বর, শিবলিঙ্গ, কীর্তিবাসক, ভাগীরথী পর্বত, শতপন্থ, কালিন্দী, চতুরঙ্গী, রক্তবরণ, সুদর্শন প্রভৃতির অপূর্ব তুষারশৃঙ্গগুলি।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩,৭৭০ ফুট উপরে আমরা এসেছি। চারিদিকে নিঃঝুম নির্জনতা। শুধু চিরন্তনকালব্যাপী চলেছে বেগবতী জাহ্নবীর দুরন্ত অভিযান। গুহার মুখে বিরাট বিরাট বরফের চাঁই ভেঙে ভেঙে পড়ছে আর স্রোতের জলে ভেসে ভেসে চলেছে বিরাট বিরাট চাঙড়-গুলি। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, যতি নেই, সমাপ্তি নেই,—প্রভাতে মধ্যাহ্নে রাত্রে শুধু গভীর গর্জন আর অনন্ত অবিরাম অভিযান। সমস্ত পৃথিবী তন্দ্রাচ্ছন্ন, বিহ্বল।

স্পর্শ করি গঙ্গার পবিত্র বারি, স্পর্শ করি শীতল পাথর। কী যেন নিগূঢ় আশ্চর্য চেনা চেনা গন্ধ পাথরে পাথরে, নদীর শীতল জলে। অপূর্ব এক মধুর ছন্দ জেগেছে বাতাসে আর অন্তরীক্ষে, জোয়ারে আর কল্লোলে এক চিরন্তন অধ্যাত্ম শান্তি জড়ান উদাসীন দিগন্তে। তুষারকান্তি জ্যোতির্ময় হিমালয় যোগমগ্ন, নিস্তব্ধ, নিশ্চল।

গোমুখেই ভাগীরথা প্রথম দৃশ্যমানা হলেন, কিন্তু আজও কেউ জানে না জাহ্নবীর আসল উৎস কোথায়! নানা মতান্তর চলেছে নানাজনে, ভূতত্ত্ববিদ্ আর দার্শনিকে, সহজ বিশ্বাসী মন আর বৈজ্ঞানিকে।

যে যাই বলে বলুক। আমার চোখ আঁতিপাঁতি করে খোঁজে কোথায় সেই শ্বেতবরুণ, সোনার খনি সুমেরু। বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি গোমুখের বিচিত্র দৃশ্যের পানে।

তুষারস্তর প্রথম তারল্যে পরিণত হল এই গোমুখে। কখনও বিশ্লেষণ করে মনকে বোঝাতে চাইনি গোমুখের নামকরণ কেন হল।

—এই সেই পরমতীর্থ যেখানে এলে মানুষ সব ভুলে যায়, ভুলে যায় তার নিজের কথা, সংসারের কথা।

—গোমুখ গঙ্গার পুণ্যজল দেশে নিয়ে যাবেন না?

—আর দেশ! কোথায় নিয়ে রাখব এ পুণ্যবারি! নিজের চাল নেই, চুলো নেই, থাকি ভাড়াটে বাড়ীতে, নিজের দেশেই আজ আমরা উদ্বাস্তু পরবাসী।

কাঞ্চন ও বিনায়ক দুজনেই বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে

চেয়ে থাকেন। টিনের পাত্রে তাঁরা সঞ্চয় করেছেন গোমুখ গঙ্গার পুণ্যবারি।

আমি আকণ্ঠ পান করে নিলাম। তৃষিত তাপিত বুকটা আমার জুড়িয়ে গেল, শীতল হল।

এই সেই গোমুখ—যেখান থেকে শুরু হয়েছে ভাগীরথীর যাত্রা আর মিশেছে সেই সাগরসঙ্গমে। হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত গাঙ্গেয় ভূমি, হিন্দুর পবিত্র বিশ্বাসে আপ্লুত, শ্রদ্ধায় অধ্যুষিত। গঙ্গার তট ঘিরে রচিত হয়েছে কত সুখ-দুঃখের কাহিনী, কত স্মৃতির ভেলা আপনি ভেসে চলে। কত মন্দির, কত ঘাট, কত শ্মশানের চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে দিবানিশি এই একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। সারাজীবনে যখনই ক্লান্ত হয়েছি, দেউলিয়া হয়ে পড়েছি সংসারের দেনায়, অলস দেহটাকে টেনে এনেছি গঙ্গার শীতল ঘাটে, ঘুমিয়ে পড়েছি অবসাদে, জেগেছি আনন্দে, অবগাহন করেছি প্রাণের উল্লাসে। গঙ্গার অমৃতধারায় ভরে নিয়েছি শূন্যকুম্ভ, পূর্ণ হয়েছি আমি।

গঙ্গাই ভারতের প্রাণস্বরূপা—নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, আশা, ভরসা, ধ্যান, ধারণা, জপ-তপ, তপস্যা—আসন্ন মৃত্যুপথযাত্রীর ওষ্ঠে শেষ বিন্দু জল। ইহকালের তীর্থ, পরকালের বৈকুণ্ঠ।

ভীষণ শীত! সন্ধ্যার আগেই ভূজবাসা পৌঁছতে হবে। অগত্যা তিনটা নাগাদ আবার যাত্রা করলাম প্রত্যাবর্তনের পথে। বারে বারে পিছন ফিরে দেখি···শেষবারের মত দেখি গোমুখকে।

বৃত্তপথ ঘুরে গেল। অদৃশ্য হল গোমুখ, কিন্তু শ্রুতিপথে তখনও অবিরাম বেজে চলেছে জাহ্নবীর মূর্ছনা, অপূর্ব সুরের ছন্দ।

দেখা দিল পদপ্রান্তে সেই উচ্ছ্বাসময়ী নীলনয়না ভাগীরথী।

সন্ধ্যা নেমে আসে ধীরে ধীরে পশ্চিম দিগন্তে।

॥ ২৯ ॥

আবার ভূজবাসায় এলাম। শরীর ও মন দুই অবসন্ন। আশার শেষ, চলার শেষ। এক নিমেষেই শূন্যে মিলিয়ে গেল নতুন উৎসাহের বুদ্বুদ। মহাতীর্থের মহোৎসবের অঙ্গনে আসার ডাক এসেছিল—তাই সেদিন মুক্তির ছাড়পত্র নিয়ে এসেছিলাম স্বপ্নলোকের দেশে—বিলুপ্তির উদ্দেশ্যে। শক্তির ভাণ্ডার আজ নিঃশেষিত, মন আজ প্রত্যাবর্তনের বেদনায় স্তব্ধ।

আবার একটি রাত কেটে গেল ভূজবাসায়। একটি তন্দ্রাচ্ছন্ন বিনিদ্র রজনী। তন্দ্রালু চোখের পাতায় ভেসে চলেছে ছায়াবাজির খেলা। সেই ভাগীরথী আর ভীলাঙ্গনার সঙ্গমে টেহরী, সেই গাংনানি ধর্মশালা, সেই পর্বতশীর্ষে আলোকস্নাত ভৈরোঁনাথের মন্দির, যমুনাচটি, ঋষিকুণ্ড, ভৈরবঘাঁটি, উঞ্জলি, হনুমানচটি, নাকুড়ী, উত্তরকাশী, জাহ্নবীর সঙ্গম, জাটগঙ্গা। কত অজস্র চটি, কত অজস্র নদী, কত ঝরণা, কত চড়াই, কত উৎরাই—যোজনের পর যোজন শুধু একটানা পথ। কখন দগ্ধ পথ সূর্যের খরতাপে, কখন প্রবল হিমশুভ্র তুষারপাতে।

গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে চলেছে প্রাণের নদী দুর্বার গতিতে। চলেছে শত শত মানুষের মিছিল, সঙ্গে চলেছে স্নেহ, দয়া, মায়া প্রীতি ভালবাসা। অগ্নিস্রাবী দহন রৌদ্রতাপে কিংবা তুষার-ঝঞ্ঝায় ক্ষত-বিক্ষত দেহ কিন্তু মনে অটুট বিশ্বাস—চলেছে তীর্থযাত্রী, চলেছে উদ্‌ভ্রান্ত উদাসী পথিকদল।

ভূজবাসা। মনে হল রাত্রির অন্ধকার মুছে গেছে, থেমে গেছে শীতের হাওয়ার ক্রুদ্ধ আর্তনাদ। যেন এক বিশ্বগ্রাসী প্লাবন ছুটে আসছে, ভাসিয়ে নিয়ে গেল পৃথিবীর সমস্ত পাপ, দুঃখ, জ্বালা। সমস্ত চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অকস্মাৎ যেন কোথায় মিলিয়ে গেল।

চতুর্দিক প্লাবিত, শুধু জল, জল আর জল। প্রাণের চিহ্ন নেই। শুরু হল ভয়াবহ বিবর্তন, বিপর্যয়ে স্থানচ্যুত হল মেদিনী, বিদীর্ণ হল জলধারা, কম্পন শুরু হল জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। বিদীর্ণ জলরেখার অন্তস্তলে উঁকি দিল নতুন মাটি, নতুন পৃথিবী। হিমালয়ের গিরিশীর্ষ দেখা দিল প্রলয়-পয়োধি-জলে। আকাশে উড়ল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, নতুন করৌজ্জ্বল্যে স্নাতা হলেন ধরিত্রী। মধুর ঘণ্টার ধ্বনি বাজলো বাতাসে, ভেসে এল বেদের মঙ্গল স্তবগান।

নেমে আসছি। ভূজবাসাকে পেছনে ফেলে, গঙ্গাকে আবার পেরিয়ে তর তর করে নেমে আসছি। গঙ্গা পাশে পাশে চলেছেন সবেগে, সকল্লোলে। আজ মনে উচ্ছ্বাস নেই, উৎসাহ নেই নতুনকে দেখার। মাঝে মাঝে গৃহের কথা মনে পড়ছে, কিন্তু ফিরে যাবার আকুল ইচ্ছাও মনে কখনও জাগছে না। চলেছি—চলতে হবে তাই। ত্বপুরের আগেই এলাম গঙ্গোত্রী।

সেই পুরোনো গঙ্গোত্রী। বাউল ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল··· বৈষ্ণবীও আসছে পিছে পিছে।

—গোঁসাই, তোমার চরণ-ধূলো দাও। গোমুখ তীর্থের ধূলি তোমার পায়ে। গোমুখ তীর্থের সুফল আমাদের দাও গোঁসাই।

আগামী প্রভাতেই আবার আমাদের পুনরবতরণ। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেছে, ধর্মশালার বারান্দাটায় চুপ করে বসে ছিলাম। বাইরে প্রচণ্ড শীত। ঘনায়মান তমিস্রায় হিমালয় যেন আকাশের ঘন ধূসর পশ্চাৎপটের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসছে। পাহাড়ের গায়ে গৃহস্থের কুটিরে একটি একটি করে দীপ জ্বলে, আকাশের গায়েও একটি তুটি করে তারার প্রদীপ জ্বলে।

বাউল চুপ করে বসে আছে, বিড়ি ধরিয়েছে কিন্তু টানতে যেন তেমন মন নেই। এই জীবনে বুঝি বা আমাদের শেষ মিলন সন্ধ্যা। আমরা আগামী প্রত্যূষেই চলে যাব, কিন্তু বাউলরা আরও

কিছুদিন এখানে থাকবে। ওদের ত আর ঘরের টান নেই, দেশে যাবার বালাই নেই।

চেনা লোকের ভিড় অনেক হাল্কা হয়েছে। ধর্মশালায় আবার নতুন যাত্রী এসেছে ও আসছে।

—গোঁসাই, কালই চলে যাবে?—কতবার যে এই একটি প্রশ্নই আমাকে করেছে বাউল তা সে নিজেও জানে না।

—যদি কোনদিন দেশে ফিরি তবে নিশ্চয় আবার দেখা হবে—তাই না?—নিজেকে বোঝায় বাউল।

সেই রাত্রিতে ঠিক সুনিদ্রা হল না। মাঝে মাঝে ক্লান্ত চোখের সীমানায় তন্দ্রা নেমে আসছে, আবার ভেঙে যাচ্ছে। সুনির্দিষ্ট কিছু ভাবছিলাম বলেও ঠিক মনে পড়ছে না। মনে হল মনকে জিজ্ঞাসা করি—পেয়েছ, যা চেয়েছিলে! কিন্তু পর মুহূর্তেই প্রশ্নটাকে বড় অবান্তর বলে মনে হল। তন্দ্রা কেটে গেল।

পাশেই বেণু ঘুমিয়ে আছে। একমাথা উস্কোখুস্কো অবিন্যস্ত চুল, গালের উপর খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কপালে নীল শিরাগুলি আরও নীল হয়ে ফুলে আছে। মনে হল গৃহহীন ভবঘুরে এক লক্ষ্মীছাড়া। ঘর নেই, বন্ধু নেই, বান্ধব নেই, আত্মীয় স্বজন কেউ নেই দুনিয়ায়। ধূলায় মলিন ছিন্ন বেশবাস। কিন্তু বোজা চোখদুটোর পলকে জড়ান আছে স্বপ্নলোকের মায়া-কাজল, পরম তীর্থ দর্শনের পরম ঐশী এক অনুভূতি।

এই সেই হিমতীর্থ—শীর্ষে যার তুষার কিরীট, পদপ্রান্তে উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথী, মধ্যে হিন্দুর মানসলোক—কল্পনার তুলি দিয়ে আঁকা গঙ্গোত্রী।

উত্তরাখণ্ডের চারিধামের দুই ধাম পরিভ্রমণ সমাপ্ত হল। বাকি রইল কেদারনাথ ও বদরীনাথ। শুয়ে শুয়ে অনির্দেশ্য সব চিন্তা মনে এসে ভিড় বাড়াতে লাগল। আনন্দের বন্যায় হৃদয়ের দুটি কূলই আমার প্লাবিত।

অতি প্রত্যূষে ধর্মশালার ঘুম ভাঙ্গল। কোলাহলে ধর্মশালা মুখরিত হয়ে উঠল। সবাই নিজ নিজ বিছানাপত্র বেঁধে নিচ্ছেন।

কেউ কেউ হয়ত যাবেন গোমুখ দর্শনে আবার কেউ কেউ বা চলেছেন ঘরের পানে—তীর্থ পরিক্রমণ সমাধা করে। পূর্বদিগন্তে আলোর রেখা জাগল, বিদায়ের ক্ষণটি এক মধুর বিষাদের শান্ত স্নিগ্ধ সুরে মুহ্যমান হয়ে রইল চিরকালের খাতায়।

বাউল নিরঞ্জন আর তুলসীমঞ্জরী চলেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে।

—এবার তোমরা ফিরে যাও।

বাউল দম্পতী দুজনেই কাঁদছে। তারা আরও এগিয়ে যেতে চায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু তাদের বাধা দিতে হল। তারা দাঁড়িয়ে থাকে পথের বাঁকে, আমরা নেমে এলাম উৎরাই-এর পথে। মনকে বারে বারে পিছু টানে। তাকিয়ে দেখি তখনও তারা সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে—বাউল তার সুদূর-সঞ্চারী দৃষ্টি মেলে আর বৈষ্ণবী তার সজল দৃষ্টিহীন আঁখি দুটি তুলে। তারপর তারাও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল কুয়াশার প্রচ্ছদপটে।

জানি সবকিছুই আবার একদিন ঝাপসা হয়ে আসবে, কিন্তু এই যে অপর হৃদয়ের একটু অন্তরঙ্গতা, এই যে আপন হৃদয়ের একটু বিস্তার—জানি জীবনের মানচিত্রে এর কোন মূল্য নেই। কিন্তু হোক তা মূল্য-হীন। তবু এই নিরঞ্জন আর তুলসীমঞ্জরীই আমার এই দীর্ঘ যাত্রাপথের অক্ষয় পুণ্য হয়ে থাকবে।

ওদের কথাই ভাবতে ভাবতে নেমে আসছিলাম। নামতে নামতে আবার ওদের কথাও ভুলে গেলাম। পথের কথাই কী মনে রইল। একের পর এক—জঙ্গলা, ধরালী, হারশিলা, হারশিলার পর এল ঝালা—চটির পর চটি ত্রস্তপদে পেরিয়ে আসছি। যাবার পথে প্রতিটি চটি ছিল 'মেন' এক একটি 'ল্যাণ্ডমার্ক'। আর চারদিন, তিনদিন, দুইদিন, একদিন, একবেলা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করে নিজের মধ্যে কত খোঁজাখুঁজি। কত আশা, প্রত্যাশা, সংশয়, আশঙ্কা, পথে প্রতিটি নুড়ি নেড়েচেড়ে গবেষক বিজ্ঞানীর কী নিবিষ্ট আত্মজিজ্ঞাসা। যে প্রশ্নের তাড়নায় নিজের অনিচ্ছাসত্বেও এ পথে না

এসে উপায় ছিল না, সে কী ঐ তুষারসীমায়, ঐ প্রকৃতির ঐশ্বর্যে, সূর্যের অস্তরাগে রঞ্জিত ঐ ভাসমান মেঘের লক্ষ্যে। তখন কেবল ভেবেছি, আর পথ চলার ছিল—তাই এগিয়েছি।

আজ আর সে সকলের কিছুই অবশিষ্ট নেই। আজ কেবল নেমে আসা। সেই সূর্য সেই দিগন্তে আজও অস্ত যায়, সেই মেঘ সেই আকাশে আজও অজানায় পাড়ি জমায়, প্রতিদিন প্রভাতবেলায় প্রকৃতি নয়ন মেলে চায়. প্রতি সন্ধ্যায় চোখ বোজে। সবকিছুই চোখে পড়ে, আগের চাইতে আরও বেশী করে চোখে পড়ে। কিন্তু, আমার সঙ্গে আর কারও কোন যোগাযোগ নেই।

আমিও কেবল নেমে আসছি। ঝালা পেরিয়ে এলাম সুখী ধর্মশালায়, তারপর এল লোহারিবাগ, গাংনানি। ভাটোয়ারী পেরিয়ে আমার নিয়তি কেবল নেমে আসা।

মাল্লা চটিতে পৌঁছে যাত্রীদের কেউ কেউ কেদারনাথের পথ ধরলেন। এখান থেকে বৃদ্ধকেদার, সাকরী, পাওয়ালী হয়ে ত্রিযুগী-নারায়ণের তীর্থ সেরে কেদারনাথের পথ চলে গেছে।

আমারও ইচ্ছা ছিল এ পথ ধরেই কেদারনাথ যাবো, কিন্তু আমার ঐহিক জ্ঞান আমার ঐশী ঈপ্সায় বাদ সাধল। বাংলা করে বলি, আমার ইন্টেলেক্ট ইনটুইশনের উপর টেক্কা মারল। মাল্লা পৌঁছে যখন ত্রিযুগী-নারায়ণের পথের বিশদ বিবরণ শুনলাম, অতৃপ্তি তখন তাতেই কতকটা তৃপ্ত হল। তারপর সেই মুহূর্তে শুনলাম যে মাত্র ষোল মাইল পথ হেঁটে একবার উত্তরকাশী পৌঁছলেই জিপে করে ধরাসু পৌঁছে সেই সন্ধ্যায় বাসে করে হৃষীকেশে পৌঁছনো যায়, তখন মনে পড়ল যে দেবপ্রয়াগ বদরীনাথের অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা। প্রথমটি অতিক্রম না করে দ্বিতীয়টিতে পৌঁছনয় পুণ্য থাকতে পারে কিন্তু সার্থকতা সামান্য। তখন আর মনঃস্থির করতে বিলম্ব হল না। পরসন্ধ্যায় ঠিক হৃষীকেশ পৌঁছে গেলাম।

॥ ৩০ ॥

দূর থেকেই হৃষীকেশের আলো নজরে পড়েছিল। যেন দীপালিকার অন্তিম প্রহর। দূরে দূরে দুটো একটা বাতি জ্বলছে কিন্তু সান্ধ্য সমারোহের রেশ পরিব্যাপ্ত করে আছে সমগ্র পরিবেশ।

হৃষীকেশ পৌঁছলাম। কিন্তু সেই আমি ঠিক যেন এই আমি নই। সত্তার বিরাট একটা অংশ যেন ভ্রূকুঞ্চিত করে রইল। মনে হল এই ত আর মাত্র কয়েক মাইল এগুলেই দেরাদুন—নাগরিক বিলাসিতার প্রতিটি উপকরণ যেখানে হস্ত প্রসারণের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। তবুও তেমন উৎসাহিত বোধ করলাম না।

রাত হয়েছিল—তাড়াতাড়ি হোটেলে খাওয়া সেরে নিশীথের চোরের মত গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলাম। আকাশে সপ্তমীর চাঁদ পর্বতের আড়ালে আত্মগোপন করেছে। দূর আকাশে দুটো একটা তারা নিজেদের মাঝখানে মিতালি পাতাবার ব্যর্থ-প্রয়াসে চিকমিক করছে। গঙ্গার কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে একমনে বয়ে চলেছে। কলকাতার বৃষ্টিস্নাত ধাতব রাস্তার মত ঝিকঝিক করছিল তার প্রবাহপথ। ওপারে দেওদার গাছগুলো নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি নিঃসঙ্গ বসে রইলাম। কিন্তু চেতনায় ভিড়ের অন্ত ছিল না। এই ত সেই হৃষীকেশ। সেই কতকাল আগে এখান থেকেই ত কত আশা নিয়ে একদিন যাত্রা করেছিলাম। আজ এই সন্ধ্যায় সেই যাত্রার ফলাফল নগণ্য হয়ে গেছে। কিন্তু যাত্রাপথটুকু এখনও ভাস্বর। সে পথের প্রতিটি সহযাত্রীর প্রতিটি কথা আজও কান পেতে স্পষ্ট শুনতে পাই। তারা চুপি চুপি আমার কানে কানে কথা কয়, নতুন করে আলাপ জমায়।

নরেনদা যেন আজও কাতর বিনতি জানায়—শোন্, আমার কথা শোন্। বয়সে বড় আমি, আমার কথা শুনলে অপমান নেই —বুঝলি? খোলা ছাতে অত রাত্তির অবধি অমন করে শুয়ে থাকিসনি। অসুখ করলে এ বিদেশে কে দেখবে তোকে?—আবার হয়ত এই নরেনদাই একটু পরে ভীষণ রেগে গিয়ে বলছেন —যত সব আপদ এসে জোটে এই আমার কপালেই।

আমি হাসি। চোখে ভাসে সেই বিদায়ক্ষণটুকুর কথা। ভৈরবী বলছেন—দুঃখ করিসনা ভাই, দুঃখ কী। মানুষ আসবে, আলাপ জমাবে আবার চলে যাবে—এইত চিরকালের রীতি।

তিলক হয়ত ছুটতে ছুটতে আসছে লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে। বাস ছেড়ে দিয়েছে, তিলকও সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে—বাবুজী, আর দেখা হবে না?

রামলালকে আজও দেখি—বাস টারমিনাস ছাড়িয়ে আমাকে এড়িয়ে সে পালিয়ে যাচ্ছে—চাইনা, চাইনা বাবুজী, কিচ্ছু চাই না আমার। আমার দেওয়া প্রীতি-উপহার বর্ষাতিটা অনাদরে সিটের উপরেই পড়ে আছে। মনের আকাশে মেঘের দল ভেসে বেড়ায়, আবার মিলিয়ে যায় দৃষ্টির আড়ালে। আজও আমার তেমনি করে মনে পড়ে কীর্তিদৎকে। আজও কান পাতলেই যেন শুনতে পাই বাঁশীর সুরে আকাশ বাতাস সবকিছু চঞ্চল। কীর্তিই হেসে হাত বাড়ায় —ডর ক্যা হ্যায় ভাইয়াজি?

মনে পড়ে সেই অন্ধকার গভীর রাত্রি। কীর্তিদৎ চিরকালের জন্য চলে গেল আমাকে উপেক্ষা করে, আমার ভালবাসার কথা একবারও ভাবল না সে। যাক, সবাই চলে যাক আমাকে একলা ফেলে। ভবঘুরে বাউল আজও যেন তেমনি করেই তার একতারাতে গান ধরেছে—

অনেক দেখে অনেক ঠেকে
আমিও ভাই এই বুঝেছি

ভুলে যাওয়াই ভাবের গতিক
আমি ত ভাই এই জেনেছি।
চিরকালটা মনে রেখে কে বাড়াবে বুকের বোঝা
কালের গতিক দেখে শুনে আমি ত ভাই বুঝি সোজা।
ওরে ভাই মানুষ চেনা সহজ কথা নয়॥

চোখ বুজলেই যেন দেখতে পাই তুলসীমঞ্জরী তেমনি করেই দৃষ্টিহীন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। পিছনে রইল চিরকালের বাউল দম্পতী।

আবার নিজের উৎসে ফিরে আসতে হবে। গঙ্গার গতি ব্যাহত হবার নয়। কত বাঁক, কত বাধা, কিন্তু গঙ্গার গতি অপ্রতিহত, অপ্রতিরোধ্য। নরেনদা, তিলক, বাউল, তুলসী, কীর্তিদৎ—কত নিবিড় ভাবে মনে পড়ে সবাইকে। সবাই সত্তার অংশ জুড়ে ছিল, সত্তার এক একটি অংশ নিয়ে সবাই যে যার পথে চলে গেছে। কিন্তু এদের সবাইকে অতিক্রম করে আরও কত কথা, আরও কতজনের কথা মনে পড়ছে আজ।

আর একপাও হাঁটবার প্রয়োজন নেই। বাসে চেপে হরিদ্বার পৌঁছুলেই তিলক রিক্সার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে হাসিমুখে হাজির হবে। হয়ত হবে না। স্মৃতির সিংহদ্বারে পৌঁছেই থমকে দাঁড়ালাম। দুয়ার খোলাই ছিল কিন্তু পদক্ষেপ করতে ভয় হল। কত নরেনদার কত সমবেদনা সেখানে সঙ্কুচিত হয়ে আছে, কত তিলকের কত হাসি সেখানে প্রস্তরীভূত—জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা থেকে সবকিছুই ত আমার জানা কথা, কী হবে আবার সেই পুরোনো হতাশায় হতাশ হয়ে, সেই পুরোনো যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে। মন আবার সেই গাংনানির পথে পথ হারাল, আবার সেই ভৈরব-ঘাঁটির চড়াইয়ে শ্বাসরোধ করল, আবার গোমুখের তুষারসীমায় ডুব দিল। মনে হল, কী প্রয়োজন অমন সাত তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার। মাল্লাতে যে পাপ করেছি হৃষীকেশ থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত

শুরু হোক না। কেন সেদিন ভয়ে পিছিয়ে এলাম? কেন সেদিন অন্যান্য তীর্থযাত্রীর মত মাল্লা থেকে ত্রিযুগীনারায়ণের পথে পা বাড়ালাম না? কেন—কেন?

আবার নতুন করে মনস্থির করে ফেললাম। আবার নতুন টুকিটাকি জিনিসে পূর্ণ করে নিলাম শূন্য ঝোলাটা। এবার এল বিচ্ছেদের পালা।

ছুটি শেষ হয়ে গেছে, গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী দর্শন সমাপ্ত হয়েছে, বেণু এবার একাই ফিরে চলল নিজের কোটরে। ছিলাম তিন, হলাম দুই। রামলাল আর আমি।

॥ ৩১ ॥

এবার শুরু হল কেদারবদরীর চিরঈপ্সিত পথ—মানসলোকের পথ, স্বর্গারোহণের পথ।

আবার নতুন করে শুরু হল পথ চলা। সবুজ ঝাণ্ডা উড়িয়ে বাস চলেছে—পাশেই মৃত্যুর অতল গহ্বর। কাঁচের জানালা দিয়ে উদ্‌গ্রীব নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখি বাইরের নীল আকাশ, কালো পাহাড় আর নদীর সর্পিল গতিরেখা। ভিতরে দেখি নানা দেশের নানা মানুষের মেলা। কান্না আর হাসিতে, দুঃখে আর আনন্দে, আলোকে আর অন্ধকারে চলেছে সেখানে জীবন-মৃত্যুর আনাগোনা।

বাস চলছে। শিবপুরী গুল্লারের পুল পেরিয়ে থামল এসে ব্যাসীতে, তারপর কাউডিয়ালা, সাঁকনিদ্বার, বীচ্চেলিখাল, পন্থগাঁও ছাড়িয়ে প্রায় বেলা এগারটা নাগাদ বাস এসে থামল দেবপ্রয়াগে।

দেবপ্রয়াগ। দেবতারও প্রিয় দেবপ্রয়াগ। চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে পর্বতের বিশাল পটভূমিকায়। ছোট ছোট গেরুয়া রঙে ছোপান দুতলা, তিনতলা কতগুলো পাথরের বাড়ি, মন্দিরের চূড়া। যোগীয়া রঙের ঝাণ্ডা উড়ছে বাতাসে। সবকিছুই আনন্দময়, সবকিছুই সুন্দর, সবকিছুই সূর্যের উজ্জ্বল প্রভায় প্রোজ্জ্বল, আপন ভাস্বরতায় প্রোন্নত।

বাস থেকে নেমেই মাটির ছোঁয়ায় যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম। সমস্ত চেতনা, সমস্ত সম্বিৎ যেন কোথায় হারিয়ে গেল। মনের দিগন্ত এক অপূর্ব মাদকতায় স্বপ্নালু হয়ে উঠল ধীরে ধীরে।

প্রয়াগের বিচিত্র দ্যোতনায় চেতনা যেন কেমন উন্মনা হয়ে গেল। সঙ্গমে মিলিত হয়েছেন দেবলোকের দুটি প্রবাহিণী—ভাগীরথী আর অলকানন্দা। অলৌকিক আনন্দে আত্মহারা, উৎসবের সঙ্গীতে

আনমনা। এখানে এসেই দুজনে একজনার মাঝে হারিয়ে গেল, ভাগীরথী আর অলকানন্দা এক হয়ে গেল একটি ধারায়। এই সম্মিলিত পুণ্যতোয়া গঙ্গাই হিন্দুজীবনের অদ্বৈত বিশ্বাস। দেবপ্রয়াগের বাতাসে মাদকতা, আকাশে উদারতা, অন্তরীক্ষে অসীম ব্যাপ্তি আর নদীর গর্জনে আছে বিলুপ্তির আহ্বান। দেবতার প্রিয় যজ্ঞভূমি—এ দেবপ্রয়াগ।

বাস থেকে নেমে সঙ্কীর্ণ লোহার ঝুলা পেরিয়ে এপারে এলাম। সঙ্কীর্ণ পথ, তাতে যাত্রীর আনাগোনা—নীচে প্রবহমাণা খরস্রোতার সফেন উচ্ছল প্রগল্ভতা। দুপাশে ছোট ছোট দোকান। একটু এগিয়েই পথটা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। একটি উঠে গেল সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে উপরে রঘুনাথজীর মন্দিরে, অপরটি নেমে গেল সঙ্গম ক্ষেত্রে। হিমালয়ের কোলে অপূর্ব পরিবেশে মিতালি পাতিয়েছে ছোট্ট জনপদটি—যন্ত্রের উচ্ছৃঙ্খল আর্তনাদ নেই, উদ্ধত সভ্যতার ভ্রূকুটি নেই—নেই প্রকৃতি আর মানুষে অর্থহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

কিছুটা এগিয়েই আবার একটি ঝুলন্ত লোহার সাঁকো। নীচে নীলনয়না অলকানন্দার উদ্বেল কল্লোল। অলকার আঁখিও বুঝি পলক হারায়—অপূর্ব সে নয়নভোলান দৃশ্যে। ঝুলা পেরিয়ে ওপারে গেলাম। এপার পাওরীগাড়োয়াল—ওপার টেহরিগাড়োয়াল, আর দেবপ্রয়াগ দুই পারের।

উঁচু পথ বেয়ে চললাম কাঠের বাড়ীগুলো পেরিয়ে। ছোট্ট পাহাড়ী বাজার। লোক আছে ভিড় নেই, ভিড় আছে চঞ্চলতা নেই। চঞ্চলতা যদিও বা কখন সখন চোখে পড়ে, প্রগল্ভতার লেশ মাত্র নেই। সবাই যে যার কাজ করে চলেছে। মন্থর গতিতে চলেছে দৈনন্দিন জীবনের ধারা। দরজির দোকান, বৈদ্যজির আয়ুর্বেদভবন, চায়ের দোকান, পকৌড়ী, মিঠাইর দোকান, কাপড়ের দোকান—সবই আছে দেবপ্রয়াগে, নেই কেবল বিকিকিনির কুৎসিত কোলাহল।

আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেই কালীকম্বলির ধর্মশালা। সুন্দর পরিবেশে দুইমহলা ধর্মশালাটি। নীচেই গম্ভীর গর্জনে ছুটে চলেছেন অলকানন্দা। নদীতে নেমে যাবার পথটি বন্ধুর ও দুর্গম। ধর্মশালার সামনে প্রশস্ত একটি উঠান আর বিরাট অশ্বত্থগাছটি ডালপালা বিস্তার করে আছে প্রায় সারাটা উঠান জুড়ে। কত মানুষের ভিড় ধর্মশালায়—কত জাতের মানুষ, কত দেশের মানুষ। কত বিচিত্র মানুষের মেলা।

বাসে আসতে আসতে অনেকবারই বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছি—গঙ্গার অপর পারের ধার ধরে ধরে আগাগোড়া চলে গেছে এক সর্পিল, বক্র, গৈরিক পথরেখা—পায়ে হাঁটা পথ। চলে গেছে সেই রজততীর্থ বদরীবিশালের মন্দির অবধি। এখানকার ধর্মশালার ঠিক ছাতের পাশ দিয়েই গেছে সেই পথ। যেদিন দেবপ্রয়াগ ছিল শুধু দেবতারই, যেদিন বাতাসে ছিল না পেট্রোলের গন্ধ, পথের ধূলায় পড়ত না টায়ারের দাগ। সেদিনকার একমাত্র সম্বল ছিল এই আঁকাবাঁকা অশ্মর বক্র রেখাপথ। সেদিনকার পথ ছিল মহাপ্রস্থানের পথ, তীর্থের পথ।

ভূগোলের মাপে এখান থেকে বদরীনাথের দূরত্ব একশ চব্বিশ মাইল। কত যাত্রী আজও এই হাঁটাপথ ধরে চলেছেন তীর্থের পথে। কেন জানিনা, ওঁরা যখন হাসিমুখে ধর্মশালায় এসে পৌঁছুতেন আমার সারাটা মন হিংসায় জ্বলে উঠত। হিসাবের খাতায় ওঁদের ক্লেশ জমা পড়ছে, ভক্তি জমা পড়ছে—আর আমার! আত্মশ্লাঘায় নিত্যদিন শুধু আমার নিঃস্ব হবার নিয়তি।

ওঁরা সমাহিত আমি প্রগল্ভ, ওঁরা উচ্ছ্বাসহীন আমি চঞ্চল, ওঁরা বিশ্বাসী আমি সন্দেহী। ওঁরা যাত্রী আমি ট্যুরিস্ট মাত্র। ঐহিক জীবনের এই ক্ষুদ্র গণ্ডীতে মনটাকে ত চিরকাল লোহার পিঞ্জিরায় বেঁধেই রেখেছি। জন্মাবধি পিঞ্জিরার পাখী কেবল খোলা আকাশের স্বপ্নই দেখল। মুক্তির আনন্দগান সে বধির বিহঙ্গ

কোনদিন শোনেনি। আজ খাঁচার দ্বার অর্গলমুক্ত, খোলা নীল মেঘমুক্ত আকাশ ঐ সামনে। কিন্তু কই, তবুও ত পাখী পারে না উড়ে যেতে পাখা মেলে। ডানা আজ তার শক্তিহীন, আঁখিদুটি দৃষ্টিহীন—উড়ে যাবার আশা বৃথা। আমি সেই পিঞ্জিরার পাখী। স্থূল আত্মপ্রত্যয় আর কানপুরের জুতা সম্বল করে ত শুধু পথ চলা যায় না। চাই আত্মসমর্পণের সাধনা—সে আমাদের কই! সে সংযত বলিষ্ঠতা আজ আমাদের নাগালের বাইরে। সুদীর্ঘ জীবনের কতগুলো বছর একাদিক্রমে ফাঁকি দিয়ে এলাম। সব জেনেও চুপ করে ছিলাম। নিজের কাছাকাছি থেকেও অতি সন্তর্পণে গোপন রেখেছিলাম এই মর্মান্তিক আত্মপ্রবঞ্চনার হীন ষড়যন্ত্র।

পিপলগাছের নীচে একটা খাটিয়া পেতে শুয়ে ছিলাম। সন্ধ্যা হবার তখনও কিছু বাকি ছিল। দেখছিলাম ঐ ঝুলন্ত সাঁকোটিকে, দেখছিলাম ঐ পাহাড় আর দেখছিলাম এই ঝরাপাতার খেলা। শুকনো পাতায় ছেয়ে আছে গাছের বেদী। নিরাভরণ অশ্বত্থ-গাছটি। পুরানো শাখায় আবার দেখা দিয়েছে সবুজের অঙ্কুর। নতুন করে আবার শুরু হবে যাত্রা। আমি তাই দেখছিলাম অবাক হয়ে।

দেখছিলাম ঐ নীল আকাশ। চারিদিক পর্বতবেষ্টিত, শুধু মাঝখানে এতটুকু আকাশ। দূরের কোণটাতে এক টুকরো কালো মেঘ জমেছে, দুটো একটা শঙ্খচিল উড়ছে অনেক উঁচুতে, চলেছে দূরে অনেক দূরে, বুঝিবা নিজের সীমানা হারিয়ে ফেলেছে অনন্ত আকাশে। পশ্চিম আকাশে পাহাড়ের পশ্চাতে অনেক আগেই সূর্য ঢলে পড়েছেন। ছায়া ঘনিয়ে এসেছে পাহাড়ে, নদীতে, আকাশে আর পাহাড়তলীতে।

সন্ধ্যা নেমে এল দেবপ্রয়াগে। পাহাড়ের গায়ে একটি দুটি করে জোনাকির আলোর মত জ্বলছে গৃহস্থের সন্ধ্যা প্রদীপ। দূরের মন্দির থেকে ভেসে আসে সন্ধ্যারতির মঙ্গলঘণ্টাধ্বনি। প্রতিধ্বনি

জাগে এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে, ও পাহাড় থেকে দূরের পাহাড়ে— তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় শ্রুতির অন্তরালে।

ধর্মশালায় ভিড়ের অন্ত নেই। উপরতলার ছোট্ট একটি কামরা মিলেছে ভাগ্যক্রমে। নীচতলার ঢাকা বারান্দায় আসরটি জমেছে মনের মতন করে। সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালিয়ে বসেছেন, ছেলেরা কেউ কেউ গাঁজা টিপে ছিলিম সাজিয়ে দিচ্ছেন, কেউ বা বসেছে ভাঙ্গ বেটে সরবৎ বানাতে। আবার কেউ বা একথালা আটা মেখে রুটি সেঁকতে বসেছেন। আবার কেউ বা সন্ন্যাসী-বাবার শরীরটাকে দলাই-মলাই করার নামে কসরৎ জুড়ে দিয়েছেন।

একটি দল এসেছে বনগাঁ থেকে। চাটগাঁয়ের লোক। ছোট বড় বুড়োবুড়ি সব মিলিয়ে প্রায় চোদ্দপনের জনের দলটি পায়ে হেঁটে সোজা গয়া থেকে আসছেন। পূর্বপুরুষকে জল দিয়েছেন ফল্গুতীর্থে। অধিকাংশেরই মাথা মুণ্ডিত, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে। খাওয়াদাওয়ার পাট সন্ধ্যার আগেই শেষ করে নিয়েছেন তাঁরা, এখন হাতে সময় অফুরন্ত। কেউ কেউ কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন, কেউ কেউ হাতে পায়ে মৌজ করে তৈল মর্দন করছেন। বুড়োরা নতুন করে কল্কেতে আগুন দিয়ে সুখ-দুঃখের গল্প করছেন, পুরানো দিনের কথা, যেদিন দেশ ভাগ হয়নি সেদিনকার কথা। বুড়িরা পান সাজতে বসেছেন চুন সুপারি দিয়ে। কেউ বা আবার আপন দেশী চট্টল ভাষায় শুরু করেছেন রামপ্রসাদী।

কয়েকজন গেরুয়াধারী উদাসী সম্প্রদায়ের বাবাজীকে দেখলাম। তাঁরা রাত্রিযাপনার উদ্যোগ করছেন ছেঁড়া কাঁথা আর কম্বল বিছিয়ে। বিড়ির আলোয় পরস্পর পরস্পরের মুখ চিনে আপনভাষায় আগামী পথযাত্রার আলোচনা করছেন।

বালিয়া জিলার অযোধ্যাপ্রসাদ নিষ্কাম ব্রত নিয়ে পড়ে আছেন। মাসের পর মাস ধরে চলেছে এ ব্রত। সাড়া নেই, শব্দ নেই,

চাওয়া নেই, কামনা নেই, কিছু নেই অযোধ্যাপ্রসাদজীর। শুধু নিষ্পলক চেয়ে আছেন।

একজন বালকসাধুকে নিয়ে খুব মাতামাতি চলছে। কিশোর বালকটি নাকি মৌজা বৃন্দাবনের বালক শ্রীকৃষ্ণর নবতম সংস্করণ—একাদশ অবতার। ভূত, ভবিষ্যৎ নিশ্চিত বলতে পারেন। এক মুঠো বালুকে এক তুড়িতে সক্কর বানাতে কিংবা লাল ফুলকে সাদা করতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। দুনিয়ার সবকিছুই এ বালকসাধুর করায়ত্ত, বশীকরণ থেকে শুরু করে ভক্তকে কৃষ্ণদর্শন করান পর্যন্ত। বালকটির ঐহিক ও আধ্যাত্মিক অভিভাবকটিকেও দেখলাম। সর্বদিকে সজাগ দৃষ্টি তাঁর, একাই সবদিক তদারক করছেন। বালকসাধুটিকে ঘিরে ভক্তের ভিড়—সবাই হাতজোড় করে বসে আছেন। আমার রামলালও গিয়ে জুটেছে সেইখানে। রামলালের কাছ থেকেই শুনলাম বালকসাধুর অলৌকিক শক্তির কিছু কিছু নমুনার আভাস মাত্র।

খাওয়ার ডাক এল হোটেলওয়ালার কাছ থেকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হল। দেবপ্রয়াগে এসে খাওয়া তৈরী করার ঝঞ্ঝাট আর রাখিনি। তাই আমাদের দুজনেরই সময় জুটেছে অফুরন্ত। খাওয়ার পাট চুকিয়ে এসে যে যার মত শুয়ে পড়লাম। নীচে চলেছে তখনও নানাজনের নানা ঘরোয়া আলোচনা। শুয়ে শুয়ে অলকানন্দার উচ্ছ্বসিত কলসঙ্গীত শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

অতি প্রত্যূষে ঘুম ভেঙে গেল। ধর্মশালার কামরা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আকাশ তখনও অন্ধকারমুক্ত হয়নি। রাত্রি আর প্রভাতের সন্ধিক্ষণ। সমস্ত দেবপ্রয়াগ তখনও ঘুমিয়ে, গাছপালা কাঠের বাড়ীগুলো সব যেন ঝিমুচ্ছে, শুধু নদীর গতি বিরামবিহীন।

বাজার পেরিয়ে ঝুলন্ত সাঁকো বেয়ে ওপারে গেলাম। ঘুমন্ত বস্তী বাজার দিয়ে একা একা পথ চলতে লাগলাম। আলো আর

অন্ধকারে অপূর্ব এক মায়ার খেলা চলেছে। দূরে সঙ্গমের গগনভেদী গর্জন। এক পা এক পা করে ধীর পদক্ষেপে সঙ্গমভূমির দিকে এগুতে লাগলাম।

সমস্ত জ্ঞান, অনুভূতি, চেতনা সবকিছুই যেন শূন্যে মিলিয়ে গেছে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম করে নীচে এসেছিলাম, ভাগীরথীর পার্শ্বে উঁচু বাঁধান বেদীর উপর আসন করে বসেছিলাম—এইটুকু শুধু মনে আছে। তারপর যেন আর কিছুই জানিনা।

কত বছর, কত যুগ যেন কেটে গেছে, শুধু বসে বসে দেখেই চলেছি অনন্তের জয়যাত্রা। অনুভূতির কথা ত প্রকাশ করা চলে না—তাই মনের কথা মনেতেই গুমরে কেঁদে গেল সারাজীবন। বোবা হয়েই রইলাম।

॥ ৩২ ॥

ভোর হয়ে গেছে। আকাশে উঁচু লম্বা বাঁশের মাথায় উড়ছে নানা রঙের ঝাণ্ডা। ঘুম ভেঙেছে পাখীদের—তারা চলেছে দূরের পথে শূন্যে পাখা মেলে। ঘুম ভেঙেছে মানুষের, তারা এসেছে পুণ্যভূমি সঙ্গমক্ষেত্রে পবিত্র অবগাহনে। কেউ কেউ বা তর্পণ শ্রাদ্ধাদি করছেন পিতৃপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে। পথিপার্শ্বের এই উপরি পুণ্যটুকু ছাড়তে কেউ রাজি নন। তাই বছরের এই সময়টাতে পাণ্ডাদেরও উপরি কিছু জুটে যায়। যাজক ও যজমানে সঙ্গমক্ষেত্র মুখরিত।

নবোদিত সূর্যের করসম্পাতে হিমালয়ের ঘুম ভেঙেছে—ধ্যান ভাঙছে। অন্ধকারের জাল ছিঁড়ে দেখা দিল একের পর এক পর্বতের উন্নত শিখরচূড়া, অনাবিল আলোয় আলোকিত, উদার সৌন্দর্যে অটল—গাম্ভীর্যে সম্মিত। বিস্ময়ে বিহ্বল—আনন্দে আত্মহারা, অনবদ্য নিস্তব্ধতায় নিশ্চল হয়ে গেলাম। বিমুগ্ধ দৃষ্টি পর্বতের শিখরদেশ থেকে ক্রমে ক্রমে গভীর বনানী অতিক্রম করে নীচে নেমে এল। নীচে বহুনীচে সেখানে চলেছে ত্বরিত গতিতে উচ্ছল, উদ্দাম, সফেন ভাগীরথা আর চকিতা, চঞ্চলা, কলস্বনা নীলনয়না অলকানন্দা। এই সঙ্গম ক্ষেত্রেই মিলন হয়েছে দুজনার। পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ। কী গভীর গর্জন! কী যেন এক ঐশী অনুভূতি লুকান আছে এই সঙ্গমের গভীরতায়। মনের সব পুণ্যগৃধ্নুতা যত সব হিসাব নিকাশ সব যেন গুলিয়ে গেল এই প্রভাতবেলাতেই।

কতদেশের মানুষ এসেছে, হিমালয়ের এই ছোট্ট জনপদে। পবিত্র অবগাহন শেষে রঘুনাথজীর মন্দিরে পূজা দিয়ে আবার যে যার পথে চলে যাবেন। তাঁরা দেবঋণ পরিশোধ করতে যেচে এসেছেন নতুন মন নিয়ে, আমার মত খুঁটিয়ে দেখতে আসে নি দেবপ্রয়াগে—খুঁটিনাটি সবকিছু জানতে। জনসংখ্যা কত, পরিধি

কত বর্গমাইল কিংবা জাতীয় কংগ্রেসী সরকারের কৃপাদৃষ্টিতে কতটা উন্নতি হল এ জনপদের ইত্যাদি ইত্যাদি। ভ্রমণকাহিনী লিখতে তাঁরা আসেন নি, তাঁরা এসেছেন ধূলার অন্ধকারে নতুন সূর্যোদয় দেখার অভিলাষে।

প্রস্তর বাঁধান সঙ্গমের স্নানের ঘাট আর তাতে মোটা মোটা লোহার শিকল বাঁধা। শিকল ধরে ধরে স্নান করতে হয়, ডুবও দিতে হয়—হস্তচ্যুত হলে একেবারে সরাসরি স্বর্গলাভ, আর নশ্বর দেহটি অচিরেই হৃষীকেশ কিংবা হরিদ্বারের ঘাটে পৌঁছে যাবে বিনাখরচায়। ঘাটের দুপাশে দুটি বিরাট বিরাট গুহা—সূর্যগুহা ও চন্দ্রগুহা। সেখানে বিগ্রহ ও পূজারী দুই আছেন। ধুনি জ্বালিয়ে বসেছেন সন্ন্যাসী—গাঁজার ছিলিম সাজিয়ে দেবার ভক্তের অভাব নেই।

আস্তে আস্তে স্নানের ঘাটে ভিড় বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্রের তেজও। আবার সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম করে রাস্তায় এলাম। রাস্তার পাশেই চায়ের দোকান। একপাশে চুপটি করে বসে দেখতে লাগলাম মানুষের আনাগোনা। গরম চায়ের পাত্রটি প্রভাত-বেলায় মনটাকে এক অপূর্ব মাদকতায় ভরিয়ে দিল। তখন মনে হল কলকাতায় এমন চা কস্মিন্‌কালেও পাওয়া যায় না, আবার এখন ক'লকাতায় এসে মনে হচ্ছে—ওগুলোকে চা না বলে চা-পাতার পাঁচন বললেই মানায় ভাল।

গেলাসের চা শেষ হবার আগেই আবার কখন উন্মনা হয়ে গেলাম। হিমালয়ের পথে পদক্ষেপের সেই প্রথম মুহূর্ত থেকেই দেখছি যে নিজের মনের উপর আর যেন কোন কর্তৃত্ব নেই আমার। কখন যে কোন্ অতলে ডুব দেয়, কোথায় হারিয়ে যায়, তার হদিস মেলে না। একটু আগেই মনপ্রাণ দিয়ে চায়ের উষ্ণতাটুকু উপভোগ করছিলাম, তন্মধ্যেই কখন থেকে যেন আবার ভাবছিলাম যে সংজ্ঞানুযায়ী এই চা ত এতখানি উপভোগ করবার

মত নয়। স্বাদে গন্ধে যে চা আজ এত রমণীয় মনে হচ্ছে, কলকাতায় পরিবেশিত হলে এমন পানীয় হয়ত মুখেই তুলতাম না। এই সামান্য সূত্র ধরেই বিদ্‌ঘুটে চিন্তা অকস্মাৎ বিস্তৃততর প্রদেশে প্রবাহিত হয়ে গেল। কলকাতায় যা-তে বিতৃষ্ণা দেবপ্রয়াগে তাতে-ই তৃপ্তি! কলকাতা আর দেবপ্রয়াগ যেন এক ভূগোলের আর এক মানচিত্রের নয়! এখানে যা অমূল্য ওখানে তা মূল্যহীন, এখানে যা তুচ্ছ কলকাতায় তা-ই বরণীয়! কলকাতা থেকে দেবপ্রয়াগ এলে চেতনার চেহারাটাই যেন পাল্টে যায়,—বস্তু জগতেরও রূপ বদলায়। কলকাতার সব আমন্ত্রণকেই আক্রমণের ভূমিকা বলে জানতাম আর দেবপ্রয়াগে সকল আক্রমণেই আমন্ত্রণের অন্তরঙ্গতা। এক সোনার কাঠির স্পর্শে যেন আজ সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি সজীব হয়ে উঠেছে, আত্মীয়তার যোগসূত্র বিস্তৃত হয়েছে পথের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে, গাছের প্রতিটি পাতার সঙ্গে, আলোর প্রতিটি অণুর সঙ্গে, পর্বতের প্রতিটি প্রস্তরের সঙ্গে।

সিঁড়ি বেয়ে রঘুনাথজীর মন্দিরে এলাম। অতি প্রাচীন মন্দির। একফালি উঠান পেরিয়ে রঘুনাথজীর সুউচ্চ মন্দির। স্থাপত্যে হিমালয়ের ছাপ। অঙ্গনে গরুড়দেবের মূর্তি স্থাপিত। মন্দিরে প্রবেশ করে রঘুনাথজীর মূর্তির সামনে এসে দাঁড়ালাম।

কষ্টিপাথরে গড়া রঘুনাথজীর প্রস্তরমূর্তি। অপূর্ব দীর্ঘ দেহ, নানা অলংকারে রাজসাজে সজ্জিত। হাতে ধনুক বাণ। বামে সীতাদেবী, দক্ষিণে ভাই লক্ষ্মণ। অন্ধকার গর্ভগৃহে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। সেই আলোতে দেখে নিলাম অপূর্ব সুন্দর বিগ্রহ। অনেকগুলো ঘণ্টা ঝুলছে মাথার উপরে। তীর্থযাত্রীদল উঁচু হয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় ঘণ্টাগুলোকে। আকাশে বাতাসে সুমধুর সুরের ঝংকার জাগে।

মন্দিরের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম দেবপ্রয়াগকে। ঐ দেখা যায় নীচে বয়ে চলেছেন ভাগীরথী আর অলকানন্দা, ঐ দেখা যায় দূরে কালীকম্বলির ধর্মশালা, ডাকঘর, লোহার ঝুলন্ত

সাঁকো, রঘুনাথকীর্তি মহাবিদ্যালয়। আকারে ছোট্ট হলেও সবকিছুই আছে দেবপ্রয়াগে—সুন্দর একটি সরকারী হাসপাতাল, পুলিস চৌকী, তহশিলের সদর দপ্তর।

দেবপ্রয়াগের অধিকাংশ অধিবাসীই বদরীনাথের পাণ্ডা। প্রায় সাড়ে তিনশ ঘর পাণ্ডাদেরই। তারাই দেবপ্রয়াগের সব, ক্রেতা বিক্রেতা, আসামী ফরিয়াদী, বৈদ্য ও ব্যাধিত। মন্দিরের পূজারী, মোহন্ত রাওল সবাই বদরীনাথের সেবায়েৎ।

এখানে এসে একজোড়া নতুন পাণ্ডা জুটে গেছে। সারাক্ষণই তারা সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। দেবপ্রয়াগের যতকিছু দ্রষ্টব্য তা এই নতুন আনকোরা পাণ্ডা দুজনই আমাকে দেখিয়েছে।

বয়সে দুজনই বালক। স্থানীয় বিদ্যালয়ে বড়টি সপ্তম ও ছোটটি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে। দুজনেই দেখতে সুন্দর। নাম দীনেশচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র দীনেশের কাকার ছেলে। কাকা দেবপ্রয়াগের একজন নামী পাণ্ডা, অনেক জমিজমার মালিক। সুভাষের পরনে পরিষ্কার জামা কাপড় জুতা, আর দীনেশের খালি পা মলিন বসনভূষণ। খুব ভাব ছিল দুজনার, কিন্তু ভাগ্য ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

ছোট ছেলেটি গোপনে একদিন আমাকে বলেছিল—জান, মাতাজী ভাইয়াজীকে একটুও ভালবাসে না, ভাল করে সাঁঝসবেরা খেতেও দেয় না আর সারাদিন কেবল কাজ করায়।

আমিও সুযোগ বুঝে দীনেশকে গোপনে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তাই নাকি রে!

আমার এ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিল দীনেশ। অপ্রতিভ বালক আমাকে অনেক অনুরোধ করেছিল এসব কথা যেন কাউকে কক্ষনো না বলি। শুনলে চাচীজী দীনেশচন্দ্রকে মেরেই ফেলবে নাকি। দুদিন হয়ত খেতেই দেবে না।

সারাদিন তাকে বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, ধর্মশালার কামরায় কামরায় ঘুরে দেখতে হয় নতুন যজমান, নতুন যাত্রী এল কিনা।

—আচ্ছা, তুমিই বলত কখন আমি পড়াশুনা করব? গ্যয়া সাল পাশ করতে পারিনি বলে—সে কী তখলিফ্ গেছে আমার। খেতে দেয়নি, কেবল মেরেছে। বই পড়ব কখন? সময় পেলেই ত আমাকে কেবল শ্লোক মুখস্থ করতে হয়। শুনবে, শুনবে—বলেই সব দুঃখ ভুলে গিয়ে গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেল বদরীমাহাত্ম্য

ধন্যঃ স বৈ হি লোকেষু যো গচ্ছেৎ বদরীং নরঃ
ন তস্য পুণ্যমহিমা বর্ণনায় চ শক্যতে ॥

সবকিছু মুখস্থ হয়ে গেলেই আমিও চাচাজীর মত পাণ্ডা হতে পারব।

মুখে আত্মগর্বের হাসি। আমার ধৈর্যের প্রতি কিছুমাত্র দয়া প্রদর্শন না করেই গড় গড় করে আপনমনে মুখস্থ বলে চলেছে দীনেশচন্দ্র।

চরণানাঞ্চ সাফল্যং কুর্যাৎ বদরিকাগমাৎ।
নেত্রয়োশ্চৈব সাফল্যং কুর্যাৎ বিষ্ণোশ্চ দর্শনাৎ।

কৌতুক করে প্রশ্ন করেছিলাম—এসব শ্লোকের মানে জান?

—মানে? তুমি জান না?

—না।

—ভালই হল। তুমিও জান না, আমিও জানি না—হেসে নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল বদরীনাথের হবু-পাণ্ডা দীনেশচন্দ্র।

দেবপ্রয়াগের দিনগুলি বেশ কাটছিল হেসে আর গল্প করে। তিন বন্ধু সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই আর তাদের শহরের গল্প শোনাই বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে। ট্রামগাড়ী আর রেলগাড়ীর আকার বর্ণনা করি হাত নেড়ে, কিন্তু ওয়াট সাহেবের আবিষ্কৃত জলযান বস্তুটি যে কী—সে আর কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না তারা। নৌকাই দেখেনি কস্মিন্‌কালে।

তারা স্বপ্ন দেখে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। কবে বলিষ্ঠ হয়ে বড় হয়ে উঠবে, সেই দিনটির অপেক্ষায় দিন গোনে। তারাও একদিন লাঠি হাতে ঝড়ে ঝঞ্ঝায়, বর্ষায় কিংবা অগ্নিস্রাবী প্রখরতায় যাত্রীদের

পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বদরীবিশালের পুণ্য দর্শনে। তারাই হবে আগামী দিনের পাণ্ডা, যাত্রীদলের ছড়িদার, বিপদের মুস্কিল আসান।

এখন আমাকে দিয়েই তালিম নিচ্ছেন, হাত পাকিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন দেবপ্রয়াগের হবু-পাণ্ডা দীনেশচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র।

একদিন তাদের সঙ্গে গেলাম শক্তিমাতার মন্দিরে। দেবপ্রয়াগের পাদদেশে সবচেয়ে নীচুতে সঙ্গমভূমি আর সবচেয়ে উঁচুতে পাহাড়ের শীর্ষদেশে শক্তিমাতার মন্দির। উঁচুনীচু পাথর ডিঙিয়ে কাঁটাগাছ এড়িয়ে সোজা খাড়া চড়াই ভেঙে যখন মন্দিরে এলাম তখন সূর্যদেব পাটে চলেছেন।

ছোট্ট নিরাভরণ মন্দিরটি। অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জ্বলছে, কেউ কোথাও নেই। যজ্ঞকুণ্ড নির্বাপিত। পাষাণ প্রতিমা একখণ্ড লালবস্ত্রে আচ্ছাদিতা, ভয়াল ভয়ঙ্করা। এক অজ্ঞাত পুলকশিহরণে যেন কাঁপতে লাগলাম

"বালরবিদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্।

স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজে ভুবনেশীম্॥

যিনি নবোদিত রবিতুল্য প্রভাময়ী, চন্দ্র যাঁর মুকুটমণি, ত্রিলোচনা, হাস্যময়ী ও উন্নতস্তনযুগলশোভিতা, চারিহস্তে যাঁর অঙ্কুশ ও পাশ, বর ও অভয়মুদ্রা—আমি সেই ভুবনেশ্বরীর গভীর ধ্যানে মগ্ন হই।

ওদের অনুসরণে আমিও মন্দির পরিক্রমা করে শান্ত হয়ে বসলাম। বাইরে বিরাট্ একটি পিতলের ঘণ্টা। ঘণ্টার সেই জলদগম্ভীর নিনাদ আজও যেন কান পাতলেই শুনতে পাই—প্রতিধ্বনি ভেসে চলেছে পাহাড়ে পাহাড়ে।

—এ ঘণ্টার ওজন কত জান? আ-ট মণ।

—তাই নাকি!

ওদের কাছেই শুনলাম এ মন্দিরের পূজারী একজন বাঙ্গালী। তাঁকে দেখিনি, কিন্তু যখন শুনলাম তন্ত্রসাধক বহুক্লেশে বহু দুঃখ

স্বীকার করে এই দূরদেশে পর্বতশিখরে শক্তিমাতার মন্দিরটি স্থাপনা করেছেন তখন মনটা বুঝি সত্যই তাঁকে দেখতে ব্যাকুল হয়েছিল। মনে হল আমার নরেনদা সবসময়ই বলতেন—জানিস, যেখানেই বাঙ্গালী সেখানেই দুর্গা, কালী।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে ধীরে ধীরে। অবারিত আকাশ, অবারিত শূন্যতা। চেয়ে থাকি অবাক হয়ে। মন ছুটে চলে ভেসে-যাওয়া মেঘের ভেলার সঙ্গে উধাও হাল্‌কা দাঁড় বেয়ে বেয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হবার আগেই হোঁচট খেতে খেতে আবার পিচঢালা মোটর-রাস্তায় নেমে এলাম! রঘুনাথজীর মন্দিরে তখন সন্ধ্যারতি শুরু হয়ে গেছে।

অনেক কাল আগে এখানে দেবশর্মা নামে এক মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। গভীর তপস্যায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, দর্শন লাভ করেছিলেন ইষ্টদেবতার। তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যেই এ নগরীর নামকরণ। পুরাণে কথিত আছে দেবতারা এই পুণ্যভূমিতেই দেবযজ্ঞ করেছিলেন।

প্রয়াগ কথার বৈয়াকরণিক ব্যাখ্যা হল 'প্র'—মানে 'শ্রেষ্ঠ', 'যাগ'—মানে যজ্ঞ। আমি সেই পরমতীর্থে এসেছি, স্পর্শ করেছি সঙ্গমের পরমপবিত্র তীর্থনীর। এই সেই দেবপ্রয়াগ।

ধর্মশালায় ফিরে দেখি সবাই নিদ্রামগ্ন, একমাত্র রামলাল ছাড়া। সে আমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে। দুজনের খাবার ঢাকা, লণ্ঠনটা মিট মিট করে জ্বলছে। ঝিঁঝিঁ পোকার অবিরাম একটানা ডাক আর নানা জনের নানা সুরের নাসিকা গর্জনে চলেছে প্রতিযোগিতা। মাঝে মাঝে উদাস দমকা হাওয়া অশ্বত্থগাছের ডালপালাগুলোকে সজাগ করে দিয়ে যায়। অলকানন্দার আকুল আহ্বানে মনের দিগন্ত নতুন দ্যোতনায় উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

খাওয়ার পাট চুকে যেতেই দুজনেই যে যার মত নিজের জায়গায় শুয়ে পড়লাম।

রামলাল অতি ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল—বাবুজী! ও বাবুজী! আর কদ্দিন এখানে থাকবে? এবার চল।

—কেন, এত তাড়া কিসের? বে—শ ত আছি।

আবার সমস্ত আবহাওয়া নীরব হয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সমস্ত অস্তিত্ব। সোঁ সোঁ করে রাতের হাওয়া কাঠের দরজায় নাড়া দিয়ে যায়, দোলা দিয়ে যায় অশ্বত্থের শুকনো ডাল, উড়িয়ে নিয়ে যায় ঝরাপাতার রাশি।

নীচতলার তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর ঘুম ভেঙেছে। খড়মের খট্ খট্ গুরুগম্ভীর আওয়াজে বুঝলাম, তিনি বাইরে বেরিয়েছেন। হঠাৎ একটা মর্মভেদী বিরাট হুঙ্কারে রাতের স্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল—ব্যোম্ কালী! ব্যোম্ কালী! তারা ব্রহ্মময়ী।

পরদিন স্নানে এসেছি অলকানন্দায়। ধর্মশালারই নীচে অনেক নীচুতে একটা উপলখণ্ডে বসে বসে দেখছিলাম নদীর অবিরাম প্রবাহ। বেলাভূমিতে শুধু পাথরের মেলা। পাথরের বুকে ব্যাহত হয়ে বার বার শুধু নিষ্ফল আক্রোশ জানায় অলকানন্দা। কী গভীর গর্জন!

নদীতে নেমে স্নান করার আশা বৃথা, প্রচেষ্টা অসম্ভব। ভীষণ স্রোত, তাই পাথরে বসে ঘটির জলে দেহ সিঞ্চিত করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। তাতেই তৃপ্ত হতে হয় স্নানার্থীর।

ঝাঁকে ঝাঁকে মহাশোল মাছ নদীর উজানে মুখ তুলে খেলে বেড়ায়। ছোট বড় নানা আকারের। অবাক হয়ে দেখি মাছের ছুটোপুটি, গাঙ্চিলের আর মাছরাঙার কাতর দৃষ্টি। ঝুর ঝুর করে মাঝে মাঝে পাহাড়ের চাঁই ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ক্ষণিকের জন্য জল ঘোলা হয়ে ওঠে, আবার পরমুহূর্তেই আপনার রূপ পরিগ্রহ করে। অলকানন্দার অচ্ছোদ জলধারা আপন মনে বয়ে চলে—সে জানতেও পারে না তার ভাগ্যলিপি, ভাগীরথীর জলধারায় নিজেকে বিসর্জন দেবার অমোঘ নিয়তি। স্বর্গের অলকানন্দা মর্তের ছোঁয়া আর পেল না······ সঙ্গমেই হল তার বিলুপ্তি।

পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কত নাম-না-জানা গাছের ঝোপ, গুল্ম লতা, ফণিমনসা, কাঠটগর আর মেহেঁদি গাছের ঝোপ, সন্ধ্যা-মালতীর ঝাড়। কত বাহার! কত বর্ণের সমারোহ। পায়ের কাছে নদীর গভীরতা অতি অল্প, কিন্তু স্রোত কম নেই। এ-পাথরটাকে জড়িয়ে ও-পাথরটাকে সামনে রেখে নানা কসরৎ করে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলাম। বুকের উপর দিয়েই নদীর অচ্ছোদ স্রোতধারা বয়ে চলেছে। সোনালী রোদ্দুরে চিকচিক করছে নদীর জল, মাছের ঝাঁক একেবারে কাছে চলে আসে, বুঝতেও পারে না মানুষের অস্তিত্ব। ছোঁয়া লাগে, চমকে ওঠে মাছের ঝাঁক। পাখনার ঝাপটায় নদীর জলে আলোড়ন তুলে দূরে চলে যায়—অনেক দূরে।

নদীর শীতল জলে গা এলিয়ে শুয়ে আছি। রামলাল এক মনে আমাদের দুজনের ময়লা জামা কাপড় কেচেই চলেছে, কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার। হঠাৎ দেখি দূরে একটা পাথরের উপর গালে হাত দিয়ে বসে আছেন বন্ধু দীনেশচন্দ্র।

স্নান সেরে কাছে গেলাম। দেখি অভিমানে চোখদুটো তার ছল্ ছল্ করছে, মুখখানা বিষণ্ণ।

—কী হল রে?

—চাচী নে হামকো আজ বহুৎ পিটায়া। কুছ্ খানে ভি নেহি দিয়া। মগর ম্যায়নে কুছ্ কসুর নেহি কিয়া থা।

মনটা ব্যথিত হল বালকের মনোবেদনায়।

—চাচা আজ হরদোয়ার সে ওয়াপস আয়ে হ্যাঁয়। কত জিনিস এনেছেন সুভাষের জন্য। জুতা আছে তবুও নতুন আর একজোড়া জুতা এসেছে সুভাষের জন্য, আমার একজোড়াও নেই। চেয়েছিলাম কিনা তাই চাচীজী আমাকে বহুৎ মেরেছে!—চোখের জল মুছে হঠাৎ আবার প্রশ্ন করল—আচ্ছা! কলকাতায় আমার পায়ের মাপের জুতা পাওয়া যায়?

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটা শুনে প্রথমে হাসিই এল আমার।

মুখ তুলে চাইলাম। দীনেশ বলছে—জান, আমার পা-টা মস্ত বড় কিনা, সুভাষের চাইতে অনেক বড়, আর দেখতেও খুব বিশ্রী, তাই না। কাকা বলেছেন আমার পায়ের মাপের জুতা কোথায়ও পাওয়া যায় না···দেবপ্রয়াগ, হৃষীকেশ, হরদোয়ার—কোথায়ও না। আচ্ছা—তোমাদের কলকাতায় আমার পায়ের জুতা পাওয়া যাবে?

সেদিন কী জবাব দিয়েছিলাম আমার আজ কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে একটু পরেই দীনেশ সব ভুলে গিয়েছিল। যতকিছু অভিমান, যত-কিছু অভিযোগ, কথার ফাঁকেই সব গুলিয়ে গিয়েছিল। আর আমাকে বলেছিল—কাল তোমাকে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাব, এখান থেকে অনেক—অ-নে-ক দূরে।

* * * *

তারপর—একদিন আবার এলো পথের ডাক। এলো নতুনের ইশারা। দূরত্বের সকল ব্যবধান গেল ঘুচে। কালের চাকা এগিয়ে চলে সামনে। আকাশের গায়ে দেখা দিল ভোরের আলো। দেখা দিল অজানা এক নতুন পথ। আঁকা বাঁকা। চিরঈপ্সিত কেদার-বদরীর পথ ঐ সামনে।